পথে পথে

পরিমল গোস্বামী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা - ১২



প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

বাঁধাই—

বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মূল্য—তিন টাকা

ভ্রমণ সঙ্গীদের উদ্দেশে—

—লেখকের অন্যান্য বই—

ট্রামের সেই লোকটি

ব্ল্যাক মার্কেট

ডিটেকটিভ শিবনাথ

দুষ্মন্তের বিচার

বুবু

মারকে লেঙ্গে

'পরিমল গোস্বামীর

শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প'

আষাঢ়ে দেশে

আধুনিক আলোকচিত্রণ

ভূমিকা

ভ্রমণ কাহিনীগুলির প্রথম দুটি প্রভাতী ও অবশিষ্টগুলি
বেরিয়েছিল।

আমার ভ্রমণ সঙ্গীদের অন্যতম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই। এই বইয়ের প্রথম কাহিনীটি প্রায় তাঁকে নিয়েই লেখা। ত এর নাম দিয়েছিলাম পথের পাঁচালী। এই নামেই আগে প্রকাশিত হ লেখাটি বিভূতিভূষণের খুব ভাল লেগেছিল। তিনি জীবিত থাকলে নামটিই বজায় রাখতাম।

'হাজারিবাগের পথে' নামক কাহিনীর রচনাকাল ১৯৪৬। কি শেষে সেটি পাঁচ শ বছর পিছিয়ে গিয়ে ১৪৯৬ ছাপা হয়েছে। ওটি ইচ্ছ বলা বাহুল্য। বহু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির মধ্যে ওটি অন্যতম। শুধু অঙ্কে বলেই কথাটা স্বীকার করলাম।

ফোটোগ্রাফ তোলা আমার একটি পুরনো অভ্যাস। এই কাজে আ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এই যে যা-কিছু অতি-সাধারণ, তা অনেক সময়ে বিষয়বস্তু হয়ে দর্শনীয় হয়ে ওঠে। আমার এই আড়ম্বরহীন তুচ্ছ-ব সম্বলিত ভ্রমণগুলিকেও আমি কথার আলোছায়া বিন্যাসের সাহায্যে পরিমাণে ফোটোগ্রাফধর্মী করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। মাঝে মাঝে স্ব যা আছে তা নিতান্তই ডার্ক রুমের 'ডজিং'।

কলিকাতা, এপ্রিল, ১৯৫৫ পরিমল গো

সম্বলপুরের অরণ্যপথে

লক্ষ্য সম্বলপুরের একটি গ্রাম।

আমাদের দলপতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই ভ্রমণ কাহিনীরও নায়কও তিনিই।

১৯৩৩ সন। ৩রা মার্চ।

এই ভ্রমণ ছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু বিভূতিবাবুর সঙ্গে আমরা আরও তিনজন যে ভাবে একত্র জুটে গেলাম সেটা নিতান্তই আকস্মিক। তা বলতে হলে এর গোড়ার দিকের অনেকখানি কথা বলা দরকার।

তখনকার বঙ্গশ্রী কাগজকে কেন্দ্র ক'রে একটা বড় আড্ডা জমে উঠেছিল। সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস। আমি তার কিছুদিন আগে (১৯৩২) শনিবারের চিঠির সম্পাদনার ভার পেয়েছি।

বঙ্গশ্রী অফিস ছিল ধর্মতলা স্ট্রীটে। বেলা একটার পর থেকেই সেখানে আড্ডা জমতে শুরু করত। ওখানে এলে কারো সময়ের হিসাব থাকত না। যাঁর যখন খুশি আসতেন এবং যতক্ষণ খুশি আড্ডা জমাতেন। যে-কোনো বিষয়ে আলোচনা তর্ক বা ঝগড়া এমন কি হাতাহাতিতেও কারো কোনো ক্লান্তি ছিল না। কখনো একসঙ্গে পনেরো-কুড়ি জনকে আড্ডা জমাতে দেখা গেছে।

অভ্যাগতদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথ বিশী, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, সুকুমার সেন, নীরদ চৌধুরী, গোপাল ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র অধিকারী, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, নলিনীকান্ত সরকার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বাসবেন্দ্র ঠাকুর, মণি গুপ্ত, অরবিন্দ দত্ত,

দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলচন্দ্র দাস প্রভৃতি সাহিত্য শিল্প বা বিজ্ঞানের সঙ্গে মুখ্য বা গৌণ ভাবে সম্পর্কিত সমসাময়িক প্রায় সবাই সেখানে আসতেন—সেই ধর্মতলা স্ট্রীটের বঙ্গশ্রী অফিসে। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রথম থেকেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর একদিন দেশে যাওয়া (১৯৩৩) এবং গিয়ে হঠাৎ মারা যাওয়া বঙ্গশ্রী বাসরের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

আড্ডায় কোনো সামাজিকতা ছিল না। কিরণকুমার রায় ছিল সংকারী সম্পাদক। সমস্ত গণ্ডগোলের মধ্যে তাকে কাজ করতে হত। সম্পাদকের ছিল বাইরের অফিস সংলগ্ন একটি শোবার ঘর। তিনি দরকার হলেই চারিদিক বন্ধ ক'রে সেখানে আত্মগোপন করতে পারতেন। কিন্তু কিরণের কোথাও যাবার উপায় ছিল না, তাই সে প্রাকৃতিক রীতি অনুযায়ী পরিবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল।

শেষে এমন হয়েছিল যে, হট্টগোল না হলে তার কাজে বাধা পড়তা, প্রুফ দেখায় ভুল হত।

সুনীতিবাবু আসতেন প্রায় সন্ধ্যার দিকে। গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর চমৎকার। যতক্ষণ থাকতেন, না থেমে কোনো না কোনো বিষয়ে গল্প ক'রে যেতেন। বিদেশী গল্পই বেশি। নিজে ভাষাতাত্ত্বিক, সুতরাং ভাষা বিষয়ের গল্পই শোনাতেন বেশি, কিন্তু সে সবই কৌতুক গল্প। একদিন কথায় কথায় লণ্ডনের এক সভার কথা বললেন। সেই সভার বক্তা ছিলেন এক ভারতীয়। মাদ্রাজে তাঁর বাড়ি। সতেরো বছর বিলেতে আছেন। সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বক্তৃতা ক'রে যাচ্ছেন। মিনিট পনেরো শোনবার পর পার্শ্বে উপবিষ্ট সুনীতি বাবুর এক ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কোন্ ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

না বোঝাই স্বাভাবিক। মাদ্রাজীদের ইংরেজী উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তা বোঝা যায় না। সতেরো বছর অবশ্যই তিনি ইংরেজী উচ্চারণ সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিলেতে থাকেন নি। কলকাতাতেও তো আমরা তাঁদের "আপুন্সি্-লেন্-আ" জানি।

আরও এক জন মাদ্রাজী গ্র্যাজুয়েট সগু গেছেন বিলেতে। গিয়ে এক ল্যাণ্ডলেডির আশ্রয়ে উঠেছেন। সুনীতিবাবুও সেখানে ছিলেন।

ল্যাণ্ডলেডি সগুাগতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিলেতে এসেছ কেন?"

মাদ্রাজী ছাত্রটি বললেন, "আই ওয়াণ্ট টুবি এ লাইয়ার।" ল্যাণ্ডলেডি চমকালেন। মাদ্রাজী ছাত্র আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, "লা অ্যাণ্ডা ম্যাথা-মেটিক্স-অ আর মাই ফেভাটিট্-অ সাবজেক্টাস।" সুনীতিবাবু বুঝিয়ে দিলেন He wants to become a lawyer.

গল্প করতে করতে সুনীতিবাবুর প্রিয় খাগু চলে আসত টেবিলে। পর্বত-প্রমাণ মুড়ি বেগুনি পেঁয়াজি প্রভৃতি। পর্বত সমতল হতে বেশি দেরি হত না।

নিখিল দাস স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচরের লোক, বই বিক্রি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সবার ছিল বন্ধুত্ব। কিন্তু সেটাই সব নয়, নিখিল দাস স্বয়ং একটি স্মরণীয় চরিত্র। হিউমারের প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে এমন দ্রুত এবং ফিজিক্যাল যে তা একমাত্র গাইগার কাউণ্টারের সঙ্গেই তুলনীয়। কোনো রসিকতা বা কৌতুক কথা বা কৌতুক রচনা হিউমার হয়েছে কি না, তা নিখিলবাবুর মার না খেলে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। হাসির ব্যাপার ঘটলেই নিখিলবাবু হাসতে হাসতে চারদিকের সবাইকে মারতে শুরু করেন, কাউকে না পেলে নিজেকে মারেন। সব হিউমারই তাঁর মধ্যে সাঙ্ঘাতিক মারমূর্তি ধারণ করে।

চরিত্র হিসাবে স্মরণীয়।

ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী অমায়িক বন্ধু, মাঝে মাঝে হাঁড়ি ভর্তি পানতুয়া আনতেন সেখানে। বিভূতি বাবু নিয়মিত লিখছিলেন বিচিত্র জগৎ। দেশ বিদেশের ভৌগোলিক কাহিনীর সঙ্কলন। তার তথ্য নিয়ে নীরদ বাবুর সঙ্গে প্রায়ই ঘোর তর্ক বেধে উঠত। শৈলজানন্দ তাঁর উপন্যাসের মাসিক কিস্তি অতি বিলম্বে এনে অপরাধীর মতো এসে ঢুকতেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল বয়সে সবচেয়ে তরুণ। চেহারা উন্মাদের মতো। সংসার বিষয়ে ঘোর উদাসীন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আসত মুখে যুগান্তের দুঃখের ছাপ নিয়ে। দুঃখকে সে আর্ট হিসেবে বহুকাল থেকেই চর্চা

করে আসছে। এত করেও জীবনে যেন কিছুই হল না, যেন সব ব্যর্থ হয়ে গেল এই রকম ভাবটা। সে সব সময়েই অত্যন্ত সীরিয়স্। প্রমথ বিশী ঝগড়া বাধাবার চেষ্টায় থাকতেন, শিল্পী অরবিন্দ দত্তের সঙ্গে তাঁর জমত ভাল। অরবিন্দ মুখে মুখে গল্প রচনায় ওস্তাদ। গল্প মুখে করেই এসে ঢুকত। প্রমথ বিশী উপস্থিত থাকলে সে গল্প কিছুতেই জমত না।

একদিকে অফিসের কর্মচারী সুরেশ বিশ্বাস। তিনি ছিলেন হস্তরেখা বিশারদ। সবারই হাত দেখতেন তিনি। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকজনের বেলায় অন্তত খুব ভালই মিলেছিল। ডঃ সুশীল দে তাঁকে হাত দেখিয়েছিলেন, তিনি যেসব অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়েছিলেন, তা ঘটেছিল। সুনীতি বাবুরও মিলেছিল। অনেক পরে আমার বিষয়েও একটা কথা ফলেছিল।

আর আসতেন সেখানে নাট্যকার-অভিনেতা-চিত্রকর সত্যেন গুপ্ত। চেহারা তাঁর ছিল ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো। চুলদাড়ি চশমা—অদ্ভুত মিল ছিল। ছবি তুললে কারও ধরার উপায় ছিল না। তিনি এসে বক্র হাসির সঙ্গে কথা বলতেন।

বহু জাতীয় লোক, বহু রকম পরিকল্পনা। একবার পূজোর আগে ঠিক হল গল্পলেখকদের কাছ থেকে একপৃষ্ঠার ছোট গল্প নিয়ে পূজো সংখ্যায় ছাপতে হবে। আমরা সবাই লিখেছিলাম। কিন্তু অনেকে পুরো একপৃষ্ঠার সীমায় থাকতে পারেন নি। নাম অনুসারে গল্পগুলো বর্ণানুক্রমিক সাজানো হবে শুনে অশোক চট্টোপধ্যায় তাঁর গল্পের নাম রাখলেন "অ"। তাঁর গল্পই প্রথম স্থান পেয়েছিল।

আড্ডায় কত মত এবং মতান্তর, কিন্তু তাতে শুধু বৈচিত্র্যই বাড়ত, কেননা মূল আকর্ষণ ছিলেন সজনীকান্ত, তিনি সবার সঙ্গে সমানভাবে মানিয়ে চলতে পারতেন। আজকের দিনে সে দিনের স্মৃতি বড়ই সুখের। আজ সবারই জীবনে পরিবর্তন এসেছে—আড্ডাও আর নেই—প্রত্যেকেই পৃথকভাবে এখন স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করেছেন, সুতরাং সে দিনের সব কথা এখন স্মৃতিমাত্রেই পর্যবসিত।

সেই সময়েরই একটি দিনে আমার এই ভ্রমণ-কাহিনীর সূত্রপাত।

আমি বেলা একটায় বঙ্গশ্রী অফিসে এসেছি। কিছুক্ষণ পরেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যস্তভাবে আমার কাছে এসে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একবেলার মধ্যে ফোটোগ্রাফি শিখিয়ে দিতে পারেন ?"

আমি বললাম, "তার আগে জানা দরকার কি ক্যামেরা। বক্স ক্যামেরা যদি হয় তা হ'লে পারি।"

বিভূতি বাবু বললেন, "ক্যামেরা তো দেখিনি, জানিও না, তবে সন্ধ্যাবেলা পাব।"

প্রশ্ন করলাম, "আগে কখনও কোনো ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন ?"

"জীবনে কোনো ক্যামেরা ছুঁইনি।"

আমি বললাম, "এ রকম অবস্থায় এক বছরেও শেখানো যায় কি না সন্দেহ, এক বেলায় কি ক'রে হবে ?"

বিভূতি বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

"সিগারেট আছে ?"

তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য সিগারেট দেওয়া হ'ল। তিনি ঘরের পাখাটি বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে সিগারেট ধরালেন। পাখার হাওয়ায় তিনি সিগারেট খেতে পারেন না, মুখে ধোঁয়া বেশি ঢোকে, সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। তাঁকে সিগারেট খাওয়ার এই নিজস্ব আরামটি দিতেই হবে, ফ্যান বন্ধ ক'রে অন্যের অসুবিধা হ'লেও তিনি ছাড়েন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে সব খুলে বলুন, ফোটোগ্রাফি শিখতে চান কেন বলুন।"

"তা বুঝি জানেন না ? আমরা বিক্রমখোল যাচ্ছি, সেখানে এক নতুন ধরনের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, সে না কি এমন লিপি কেউ পড়তে পারছে না। আমরা যাচ্ছি সেই সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে, বঙ্গশ্রীর খরচে। তার বিনিময়ে বঙ্গশ্রীকে একটি লেখা দিতে হবে।

"কে কে যাচ্ছেন ?"

"আমি আর আমার বন্ধু প্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি অবশ্য তাঁর খরচেই যাবেন। তাঁরই ক্যামেরা, কিন্তু আমিও সেটা ব্যবহার করতে চাই।"

ইতিমধ্যে এ সব ব্যাপার কখন ঠিক হয়েছে আমি জানতাম না। বিভূতি বাবুকে বললাম, "তা হ'লে তো দেখছি আমাকেই যেতে হয় আপনাদের সঙ্গে। ছবিই যদি না নিলেন তা হ'লে এ ভ্রমণের অর্ধেক আনন্দ নষ্ট, তা ছাড়া আপনার ভ্রমণের সঙ্গে ছবি না থাকলে ভ্রমণ কাহিনীরই বা মূল্য কি? আমাকে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তাই ঠিক হ'ল। শুধু আমি নই, কিরণকুমারও শেষ পর্যন্ত এই লোভ ছাড়তে পারল না। আমাদের তিন জনেরই খরচ বঙ্গশ্রী থেকে দেওয়া হ'ল। চতুর্থ ভ্রমণসঙ্গী বিভূতি বাবুর বন্ধুকে তখনও আমরা দেখিনি, শুনলাম হাওড়া স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আমার নিজের কোনো ক্যামেরা সে সময় ছিল না। অল্প দিন পূর্বে পর পর দুটি ক্যামেরা আমার চুরি হয়ে গেছে, সে অবস্থায় কিছুকাল নিক্যামেরা অবস্থায় কাটাচ্ছিলাম, আর ঠিক এমনি সময়েই কি না নতুন জায়গায় ভ্রমণ! তবু অন্য ব্যক্তির ক্যামেরাটাও যে পাওয়া যাবে এ লোভটিও কম নয়।

আমাদের প্রথম আনন্দজনিত উত্তেজনাটা কিছু কম পড়লে মনের মধ্যে কতকগুলো বৈষয়িক প্রশ্ন জাগল। বিভূতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পথে এবং গন্তব্য স্থানে থাকা এবং খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে তা ভেবেছেন কিছু?"

বিভূতি বাবু বললেন, "আমার উপর ভরসা রাখুন, কিছুই ভাবতে হবে না। এ রকম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট আছে।"

"পথে খাব কি?"

"কিছু না।"

"সেখানে গিয়ে থাকব কোথায়?"

"পথে।"

দেখলাম বিভূতি বাবু আমাদের চেয়েও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন অনেক বেশি। এ রকম বেপরোয়া ভাব আমাদের মনেও দারুণ উৎসাহ জাগিয়ে তুলল।

পথে যে কষ্ট হবে এবং তা সহ্য করেই যেতে হবে এটা এক রকম ধ'রেই নিলাম। এবং অত্যন্ত গোপনে কিরণ এবং আমি পাউণ্ড ওজনের দুখানা রুটি এবং আধ পাউণ্ড মাখন ব্যাগের মধ্যে পুরে নিলাম। তখনও জানি না বিভূতি বাবুর বন্ধু কি ক্যামেরা নিচ্ছেন, অথবা তার সঙ্গে কি পরিমাণ প্লেট বা ফিল্ম নিচ্ছেন। সেটা আরও কিছু পরে জানা গেল।

সংখ্যার যোগাযোগটা বেশ হয়েছিল। ১৯৩৩ সাল। ৩ মার্চ। গন্তব্য স্থান ৩৩৩ মাইল দূরে। ৩য় শ্রেণীর টিকিট। কেবল আমরা সংখ্যায় চার জন।

রাত্রি ৯টার সময় হাওড়া থেকে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে চারজন বাঙালী যুবক বেলপাহাড় যাত্রা করলাম। ট্রেন ছাড়ার অনেক আগেই স্টেশনে গিয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে ভিড় সর্বদাই খুব বেশি, সেজন্য খুব ভয় হচ্ছিল বোধ হয় সমস্ত রাত্রি বসে কাটাতে হবে। তার প্রতিষেধ হিসাবে সবাই ট্রেনে উঠে বিছানাপত্র বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম, এবং ঘুমের কোনো তাগিদ না থাকা সত্ত্বেও চোখ বুজে পড়ে রইলাম। তাতে কাজ হয়েছিল। তখন অবশ্য আজকের দিনের মতো ভিড় সাধারণত হ'ত না, গাড়িতে যে সব প্যাসেনজার উঠল, তারা সামান্য কষ্ট ভোগ করল, আমাদের শুয়ে থাকার আরামে হস্তক্ষেপ করল না। আমাদের সাজ সরঞ্জামের মধ্যেও তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ যাত্রীর মনে সম্ভ্রম জাগানোর মতো উপকরণ ছিল। প্রমোদ বাবুর পরনে ছিল হাফপ্যাণ্ট। আর আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল একটি ক'রে সোলার টুপি। সুতরাং গভর্মেণ্টের বড় অফিসার না হ'লেও আমরা যে অন্তত জরিপ বিভাগেরও কোনো মাননীয় ব্যক্তি হ'তে পারি, এ রকম ধারণা তাদের মনে জেগে থাকবে।

আমরা গোপনে মাঝে মাঝে চোখ খুলে তাদের দেখছিলাম, এবং দেখে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে স্বার্থত্যাগের দিক দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে বড়ই হবে। স্বার্থের শিক্ষা আমরা যতটা পেয়েছি ওরা তা থেকে বঞ্চিত আছে। ওদের মধ্যে কোনো শিক্ষিত লোক থাকলে শুয়ে থাকার আরাম থেকে আমাদের অবশ্যই বঞ্চিত থাকতে হ'ত।

(২)

গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে থাকার ভান ক'রে আর কতক্ষণ থাকা যায়? চোখ বোজা অবস্থায় যদি ঘুম না আসে তা হলে চোখ খুলে রাখলেই আরাম, নইলে বিনানিদ্রায় চোখ বোজা আর দৃষ্টিকে জোর ক'রে কয়েদখানায় পোরা একই কথা। তবে ঐ অবস্থায় একটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলাম এই যে চোখ বোজা মানেই সম্পূর্ণ অন্ধ হওয়া নয়, কারণ আমি অন্তত চোখ বুজেও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম বিভূতিবাবু নাক ডাকাচ্ছেন, প্রমোদবাবু চোখ বুজেই তাঁর সম্পত্তি আগলাচ্ছেন এবং কিরণ রুটি মাখন পূর্ণ ব্যাগটি পাশ বালিশের মতো বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে।

বিভূতিবাবু যাত্রার আগে বলেছিলেন গাড়িতে তিনি দিনেই হোক রাত্রেই হোক, কখনও ঘুমোতে পারেন না, তাঁর আশৈশব অভ্যাস হচ্ছে ট্রেনে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া। গাড়িতে বসে বসে রাত্রির অন্ধকারের টানেলটি পার হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল, কিন্তু বিভূতি বাবুর মতো সেটা আশৈশব অভ্যাসে পরিণত হয়নি।

কারো কারো জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন অবিরাম দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে ইচ্ছা হয়। গাড়িতে বসে দূর দেশে যাচ্ছি এই আনন্দ সে সময় এমনই প্রবলভাবে মনকে অধিকার ক'রে বসে যে সে অবস্থায় ঘুমনোর কথা ভাবাই যায় না। আমার জীবনেও সে রকম অভিজ্ঞতা দু একবার লাভ হয়েছে। তাই বিভূতি বাবুর না ঘুমিয়ে রাত্রি কাটিয়ে দেওয়ার অভ্যাসের কথা শুনে তাঁর উপর ঈর্ষা জন্মেছিল। ভাবছিলাম, উঃ এই ভদ্রলোকটি চির-তরুণই রয়ে গেছেন, এখনও ইনি বালককালের অভ্যাস ছাড়তে পারেননি, এখনও এঁর মন তাজাই আছে! কিন্তু গাড়ির মধ্যে যখন তাঁর নাকডাকার শব্দ কানে এলো তখন রীতিমতো একটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। তবে কি ঘুমনোটা তাঁর ছলনা নয়?

পরে একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, "গাড়িতে আমি কখনও ঘুমোই না।"

না ঘুমিয়ে চোখ বুজে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল, আমি উঠে বসলাম। কিরণকুমার আমার উঠে বসার শব্দ শুনেই বোধ হয় পাশ ফিরে ব্যাগটি বুকের সঙ্গে আরও চেপে ধরল। প্রমোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদূর এলাম ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিল খড়গপুর ষ্টেশন।

সেখানে অনেক গাড়ি, অনেক লোক, অনেক গোলমাল।

এখানে আর শুয়ে থাকা চলল না। বিভূতি বাবুও উঠে বসলেন। বহু যাত্রী উঠে পড়ল আমাদের কামরায়। তাদের সংখ্যা অগণিত, বহু বৃদ্ধ, বহু যুবক, বহু বালক, বহু স্ত্রীলোক এবং বহু শিশু। যাত্রীদের প্রবল চাপে প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে উঠল। এ রকম অসম্ভব ভিড় কেন বোঝা গেল না। ভাবলাম, হয় তো এখানকার এইটেই রীতি। জংশন, এখানে যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত স্বভাবতই হ'তে পারে না।

কিন্তু কথাটা আংশিক সত্য। আসল ব্যাপার হচ্ছে অধিকাংশ যাত্রীই অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত সাদাসিদে সরল প্রকৃতির। কোন্ পথের যাত্রীকে কোন্ গাড়িতে উঠতে হবে তা এরা নিজেরা বুঝতে পারে না। বুঝিয়ে দেবার লোকেরও অভাব, তাই এরা নিজের মন থেকে যে গাড়িকে তাদের গন্তব্যগামী ব'লে মনে করে, সেই গাড়িতেই হুড়মুড় ক'রে এসে উঠে পড়ে। ওঠবার সময় এদের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়, এরা সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে পড়ে।

তাই আমাদের গাড়িতে যখন এত যাত্রী এসে উঠল তখন আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এদের মধ্যেকার অনেকেই ভুল গাড়িতে উঠেছে। অর্থাৎ মেদিনীপুর বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার বহু যাত্রী তাদের মধ্যে ছিল। তাদের ভুল ভাঙল যখন তারা মালপত্র নিয়ে পাকাপাকিভাবে ব'সে পড়েছে, তখন। ভুল গাড়িতে উঠেছে বুঝতে পারা মাত্র আবার হুটোপুটি ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং সোরগোল। অর্ধেক যাত্রী নেমে গেল এইভাবে।

কিন্তু ভাগ্য তাদের ছিল সেদিন নিতান্তই মন্দ। হঠাৎ খবর এলো খড়গপুর এবং সিনি স্টেশনের মধ্যবর্তী কোনো জায়গায় একখানা মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে, সেজন্য আমাদের গাড়ি পুরুলিয়া ঘুরেই যাবে। হিসেব ক'রে দেখলাম আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আট-ন' ঘণ্টা পরে বেলপাহাড় (আমাদের গন্তব্য) পৌঁছব। যেখানে পৌঁছবার কথা আমাদের পর দিন বেলা দুটোর মধ্যে, সেখানে পৌঁছব রাত দশ এগারোটায়। শুনে হতাশ হয়ে পড়লাম? আদৌ না। শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। গাড়ি লাইন থেকে পড়ে গেছে এই উপলক্ষে অতিরিক্ত এতটা পথ আমাদের আরও বেশি পাওনা হ'ল বিনা পয়সায়, এ তো নিতান্তই সৌভাগ্যের কথা।

কিরণকুমার বলল, "ভগবান আছেন।"

প্রমোদবাবু বললেন, "বা! একই ভাড়ায় দশঘণ্টা বেশি!"

বিভূতিবাবু বললেন, "আমি যখন ক্যাপটেন, তখন এ রকম সুযোগ আপনারা আরও অনেক পাবেন।"

গাড়ি খড়গপুরে ভয়ানক দেরি করতে লাগল। যে সব যাত্রী অবশিষ্ট ছিল তাদের বুঝিয়ে বলা হ'ল এ গাড়ি টাটানগরের পথে যাবে না; অনেকে সে কথা শুনে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই যাত্রীরা আবার উঠে এলো আমাদের গাড়িতে। এমন সময় হঠাৎ খবর এলো লাইন ঠিক হয়ে গেছে, গাড়ি সোজা পথেই যাবে।

কিরণ বুঝতে পারল ভগবান আছেন। প্রমোদবাবু বললেন, "বাফ্! দশ ঘণ্টার হাত থেকে বাঁচা গেল।"

বিভূতিবাবু বললেন, "আমি যখন ক্যাপটেন তখন পথের সমস্ত বাধা আপনা থেকেই কেটে যাবে।"

লাইন ঠিক হয়ে গেছে খবর পেয়ে আমরা নতুন যাত্রীদের আবার বলতে লাগলাম এ গাড়ি মেদিনীপুরের পথে যাবে না। যারা আমাদের পূর্ব উপদেশ শুনেছিল তারা আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে চাইতে লাগল, এবং দু দিকের যাত্রীই শক্ত হয়ে বসে রইল।

অবশেষে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন রেলকর্মচারী এসে সত্য ঘোষণা ক'রে গেলেন।

এইবার যথার্থ শোবার জায়গা পাওয়া গেল। ত্রিযামা যামিনীর দ্বিযাম শেষ হয়ে গেছে, আমরা তৃতীয় যামে উপস্থিত, এখন একটু না ঘুমোলে চলবে না।

বিভূতিবাবু বললেন, "আমি আপনাদের সঙ্গে সিম্প্যাথেটিক শোয়া শুচ্ছি বটে, কিন্তু ঘুমনো আমার পক্ষে অসম্ভব।"

অগত্যা আমরা বিভূতিবাবুকে বাদ দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ বাদে গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখি সিনিতে এসে পৌঁছেছি।

তখন পাঁচটা বাজে, ঘুম তখনও চোখে লেগে আছে, কিন্তু তবু নতুন জায়গার দৃশ্যগুলো ঘুমের পথে চালান ক'রে দেওয়ায় 'মন মোর নহে রাজি।'

কিরণকুমার এবং প্রমোদবাবুও উঠে পড়লেন, উঠলেন না বিভূতিবাবু। কৃত্রিম ঘুমের এইটুকুই হচ্ছে অসুবিধা। অগত্যা দুজনে মিলে তাঁকে টেনেই তুললাম।

তিনি চোখ রগড়ে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় এসেছি আমরা? নামতে হবে নাকি?"

"না, এখনও সময় হয়নি, হ'লে ডেকে দেব, আপনি ইচ্ছে করলে শুয়ে থাকতে পারেন।"—প্রমোদবাবু গম্ভীরভাবে বললেন।

বিভূতিবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "শোব কি রকম? এটা কোন্ জেলা?"

কিরণকুমার বলল, "স্টেশন দেখে বুঝতে পারছি না। সিংহভূমও হতে পারে, মেদিনীপুর হওয়াও বিচিত্র নয়।"

বিভূতিবাবু বললেন, "জেলা চুলোয় যাক, এখানকার হাওয়া অতি সাংঘাতিক।"

"কেন?"

"বলছি। প্রমোদবাবু খাবার বের করুন।"

প্রমোদবাবু ব্যাগ খুললেন। তাঁর ব্যাগে ছিল পাঁউরুটি আর এক টিন মারম্যালেড। গোটাকত টম্যাটোও ছিল।

বিভূতিবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "আর কিছু নেই? এই চা ওয়ালা— এ দিকে।"

এখানকার হাওয়া কেন সাংঘাতিক তা এতক্ষণে বুঝলাম।

কিরণকুমার সাহস পেয়ে ব্যাগ থেকে মাখনের টিন বের করল। তা দেখে বিভূতিবাবুর চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিভূতিবাবুর কণ্ঠস্বর এতক্ষণ খুবই ক্ষীণ ছিল, কিন্তু দু এক টুকরো রুটি পাকস্থলীতে পৌঁছতেই তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কথা নয়, রীতিমতো বক্তৃতা।

তিনি আধপাউণ্ড পরিমাণ রুটি খাবার পর বলতে লাগলেন, "আমরা তো কেবল পাথর দেখতেই যাচ্ছি না, আমরা ভ্রমণ করছি শিক্ষার জন্য। শহরের বাইরে এলে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিলি, আর সেই সঙ্গে আমাদের মনের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যায়। এখানে এলে আমরা আমাদের জীবনের স্থূল বিভাগটা মুহূর্তে ভুলে যাই, মন এক অপূর্ব রসে ডুবতে থাকে, এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে তখন হয় আমাদের আত্মীয়তা।"

বিভূতিবাবুর ভাষা ক্রমশ আবেগপূর্ণ হয়ে উঠল, তিনি বলতে লাগলেন, "এই আত্মীয়তার অনুভূতি আমাদের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। পরিপূর্ণ রূপে জীবনটাকে উপভোগ করতে হ'লে ছুটে আসতে হবে আমাদের ঘর ছেড়ে বিশ্বপ্রকৃতির এই উন্মুক্ত প্রান্তরে, মুহূর্তের জন্য খাওয়া ভুলতে হবে, শোয়া ভুলতে হবে, নিদ্রা ভুলতে হবে, এমন কি নিজেকেও সম্পূর্ণ ভুলতে হবে—প্রমোদবাবু, আর রুটি আছে?"

বিভূতিবাবুর বক্তৃতায় আমাদের আহারের গতি প্রায় থেমে গিয়েছিল, আমরা যেন এক স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই তো মুক্তির স্বাদ আমরা পেয়েছি; মনকে শহরের সঙ্কীর্ণতা থেকে, নিজের গড়া স্বার্থলোভ-মোহমায়ার শ্বাসরোধকারী কারাপ্রাচীর থেকে উদ্ধার ক'রে এনে বসিয়ে দিলাম

অনন্ত আনন্দের বাধাবন্ধহীন প্রান্তরে। মনে হচ্ছিল যেন আমরা সত্যই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিলেছি, আমরা যেন আদিম পৃথিবীর অরণ্য পর্বতের আদিম প্রাণী। আমাদের মনন শক্তি নেই, আছে শুধু মূক অনুভূতি। সেই জন্য বিভূতিবাবুর শেষ প্রশ্নটিতে ঝোঁকের মাথায় আমাদের রুটিমাখনের বারো আনা অংশ তাঁর হাতে তুলে দিলাম, এবং তুলে দিয়ে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করলাম।

বলা বাহুল্য এ জন্য পরে অনুতাপ হয়েছিল, ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরে এসে। প্রতিশোধ বাসনাও তখন থেকেই মনে জাগরূক ছিল। এর চার বছর পরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম পাটনা থেকে কলকাতা ফেরবার সময়। অবান্তর হ'লেও সে কথাটা এখানেই ব'লে রাখি।

'প্রভাতী'র উদ্যোগে পাটনায় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে বিভূতিবাবুও ছিলেন আমাদের সঙ্গী। ফেরবার সময় বিভূতিবাবু পাটনা থেকে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে ওঠেন নি, তিনি মাঝখানে তাঁর এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়েছিলেন। পাটনা ছাড়বার কয়েক স্টেশন পরে তিনি এক স্টেশনে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। সঙ্গে আনলেন এক ঝুড়ি মিষ্টান্ন। আমরা বিভূতিবাবুর অলক্ষ্যে সেই খাবার চুরি ক'রে প্রায় শেষ ক'রে দিয়েছিলাম। আমার বঞ্চিত আত্মা সেদিন তৃপ্তি লাভ করেছিল।

গাড়ি ছুটে চলল নতুন দেশের ভিতর দিয়ে। আমি আগে কখনও এ পথে আসিনি, তাই আমার চোখে এ দৃশ্য অত্যন্ত জীবন্ত মনে হ'ল। এতক্ষণ বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যাওয়ার কথা বলছিলাম, তাতে পাঠকের এমন ধারণা হ'তে পারে যে আমি বোধ হয় অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী। সেই ভুলটা এখনই ভেঙে দেওয়া দরকার। এই ভ্রমণের আগে পর্যন্ত আমার দেশ ভ্রমণ সীমা হচ্ছে এই: উত্তরে দার্জিলিং, দক্ষিণে পুরী, পূর্বে ঢাকা এবং পশ্চিমে জামালপুর। পশ্চিমে সম্বলপুর জেলার দিকে এই প্রথম আসছি, এবং এর চার বছর পরে পাটনা পর্যন্ত গিয়েছি। এই সীমা আজ পর্যন্ত আর কোনো দিকেই বিস্তৃত হয়নি। তাতে সীমানার দিক দিয়ে হারিয়েছি কিন্তু উপভোগের গভীরতার দিকে কিছু হারিয়েছি ব'লে মনে হয় না।

আমার স্বভাবগত ত্রুটির জন্য বিস্তারের চেয়েও তীক্ষ্ণতার দিকে আমার টান বেশি। তাতে অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারি না। অল্প পরিসরের মধ্যে আমি এমন ডুবে যেতে পারি যে বিস্তৃতির দিকে কোনো আকর্ষণই থাকে না। যা ভাল লেগেছে তার শেষ পাই না। ছোট খাটো আনন্দ এক এক সময় জীবনে অত্যন্ত বড় উয়ে উঠেছে। সেই সব আনন্দের মুহূর্তগুলি ক্ষণস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। দার্জিলিঙের কথা যখনই ভাবি তখনই বুঝি তথ্য সংগ্রহে আমার আগ্রহ নেই ব'লে দার্জিলিঙের ইতিহাস আমার কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর। সেখানে একই জায়গায় বসে এক এক সময় এমন এক একটি আনন্দময় মুহূর্ত উপলব্ধি করেছি যার কোন সংজ্ঞা নেই, পরিচয় নেই, ভাষায় যা ধরা যায় না। এগুলোকে মনে হয় জীবন পথের এক একটি পরম আলোকিত মুহূর্ত। আমার অনুভূতির কণ্ঠ যদি দৃশ্য হ'ত তা হ'লে দেখতাম সেখানে সেই পরম আলোকিত মুহূর্তগুলো মালার মতো ঝুলছে।

তাই ব'লে যে দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়ানোর লোভ নেই তা নয়। নেই শুধু নিশ্চিন্ত অবসর এবং টাকা। যাঁরা দুঃসাহসিক তাঁদের অবশ্য এ সবের দরকার হয় না। আমার ততখানি সাহস বা উৎসাহ নেই। নতুনের সঙ্গে পরিচয়ের লোভ থাকলেও তাতে ভয়ও আছে। ভাল লেগে গেলে আর নিস্তার নেই। দার্জিলিঙে তিনবার গিয়েছি, পুরীতে গিয়েছি দুবার। প্রথমে সমুদ্রের দিকে টান ছিল, এখন আর নেই, এখন মাঝে মাঝে কেবল দার্জিলিং যেতে ইচ্ছা হয়। পাহাড়ের আকর্ষণ আমার কাছে অত্যন্ত বেশি। তাই ছোটনাগপুরের পথে আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম, যদিও এ পাহাড় নিতান্তই ছোট পাহাড়।

দার্জিলিঙের পথে প্রথম হিমালয় দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম, তার কারণ হিমালয় আকস্মিকভাবে সমস্ত পরিচিত সীমা ছাড়িয়ে স্পর্শাতীত উচ্চতায় মাথা তুলেছে। তার কাছে নিজেকে হঠাৎ এত ছোট মনে হয় যে ভাবতে গেলে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। উচ্চতার কথা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে ওঠে। হিমালয়কে সমস্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করতে বহু জন্ম কেটে যাবার কথা। তাই ওর আকর্ষণ

সব সময়েই মনটাকে টানছে। কোথায়ও যাবার কথা মনে হলেই দেখি মনের কাঁটাটি সর্বদা উত্তর দিকের ঐ চুম্বক কেন্দ্রের দিকে ফিরে আছে। এ আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এর সঙ্গে ছোটনাগপুর পথের পাহাড়ের তুলনা করতে চাই না।

আসলে জীবন্ত রূপই আমার কাছে বড়। এমন কি আমি জীবনকেই রূপ বলতে রাজি আছি। বাংলাদেশের সমতল ভূমির স্নিগ্ধ রূপ দেখে দেখে মন হাঁপিয়ে ওঠে, সেই অবস্থায় হঠাৎ এলোমেলো প্রকৃতিদৃশ্য মনকে বিচলিত করতে বাধ্য। এ পথের শোভা তাই অপরূপ মনে হ'ল। এখানকার প্রকৃতি যেন কোথায়ও স্থিরভাবে বসে নেই, সমস্ত পথঘাট অরণ্যপর্বত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে; যে দিকে তাকাই সেই দিকেই একটা অশান্ত উদারতার মধ্যে মন ডুবে যাচ্ছে। পথের দিকে চাইতেই মনে হ'ল যেন পথ ছুটে চলল, ছুটতে ছুটতে একটা পাহাড়ের উপর উঠে গেল, সেখান থেকে আবার নেমে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোন্ গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়ি ছুটে চলেছে ব'লে এই পাহাড়িয়া ভূমির রূপ এমন স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করতে পারছি। এখানকার একটি স্তূপের দিকে চাইলেও সে আমাদের দৃষ্টিকে প্রতিহত করে না, সে যেন মন্ত্রবলে একটা দৈত্যে পরিণত হয়ে তার বলিষ্ঠ বেণীবহুল বিরাট দেহটাকে নিয়ে উন্মাদের মতো নিজেকে চার দিকে বিস্তার ক'রে দিচ্ছে, আমরা সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না।

(৩)

সিনি থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল তখন আমাদের কামরায় আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই। আজকের দিনে এ রকম অবস্থা কল্পনা করাই শক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় মাত্র চার জন লোক, আর, একজোড়া ধুতি দু টাকা, এ দুটো সংবাদই আজকের লোকের মনে চমক লাগায়। এ যেন বৃদ্ধদের আসরে তাঁদের "good old days"-এর স্মৃতি কথা।

এ পথের লাল মাটি আর ঘন সবুজ প্রকৃতি—এই দুই বিপরীত বর্ণ দৃষ্টিকে উন্মাদ করে তুলল। শালবন-পাহাড়-নদীর এ এক নতুন শোভা। কলকাতা থেকে কয়েক ঘণ্টা দূরের পথে এমন সব চমকপ্রদ সৌন্দর্য পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে, যা আমি আজও দেখিনি—ভেবে পুলকিত হলাম। মনে হল যেন বহু দূরের কোনো অপরিচিত দেশে এসে পড়েছি। এ রকম দৃশ্যে চোখ অভ্যস্ত থাকলে হয় তো এতখানি চমক লাগত না। এইভাবে এক এক সময় হঠাৎ কোনো সম্পূর্ণ অপরিচিত আবহাওয়ায় এসে পড়লে নিজেকেই যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করা যায়। ঘরে বসে যখন সিদ্ধান্ত করেছি ভাল লাগার একটা সীমা আছে, যখন ভেবেছি পাহাড় পর্বত দেখেছি, সমুদ্র দেখেছি, নদী দেখেছি, বীরভূমের লালমাটিও দেখেছি, তখন এ সবের নতুন কোনো বিন্যাসে এমন কি আর অভিনবত্ব সৃষ্টি করবে? পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্র, অরণ্যের সঙ্গে পাহাড়, অরণ্যের সঙ্গে নদী ইত্যাদি ওলোটপালট করে মনে মনে সাজিয়ে দেখেছি, অভূতপূর্ব কিছু গড়ে ওঠে না, তখনই বেরিয়ে এসে দেখি কল্পনারই সীমা আছে, অভিনবত্বের নেই। প্রতিদিন নব নব মাধুর্যের স্বাদ এমনি করেই পাওয়া যায়—এর যে কোথাও শেষ নেই, এই কথাটাই সেদিন রবীন্দ্রনাথের একটি গানে প্রতিধ্বনিত হতে শুনলাম—"মধুর তোমার শেষ যে না পাই"—অভিজ্ঞতা কত সত্য হলে এত সহজ কথায় তা প্রকাশ করা যায়!

কিন্তু আজকের দিনে যাকে এত সুন্দর ভাবছি, আর একদিন হয় তো তার

মধ্যে মন ভোলাবার মতো কিছু দেখব না। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য ভেদ ক'রে চলেছে। মানুষের মনের মধ্যেও সে মাইক্রোস্কোপ বসিয়েছে। মন থেকে মোহ কেটে যাচ্ছে। আদিম যুগে বিশ্বপ্রকৃতিকে আরও রহস্যময় মনে হত। প্রত্যেকটি বিস্ময়ের পিছনে তখন একজন ক'রে দেবতা বাস করতেন, কত পুজোই যে তাঁরা পেয়েছেন। আজও আমাদের দেশের যারা সেই আদিম যুগকে বহন ক'রে চলেছে, তারা একই ভাবে পুজো দিয়ে চলেছে সেই সব দেবতাকে। স্বয়ং ভগবান তখন প্রায় স্পর্শযোগ্য ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী মানুষ এসে যান্ত্রিক চোখ লাগিয়ে দেখলেন কোথায়ও কিছু নেই, দেবতা মিথ্যা। শেওড়াগাছের অপদেবতারাও ভয় পেয়ে পালাল, স্বয়ং ভগবান মহা শূন্যে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু সেখানেও দেখা গেল, তাঁর থাকবার কোনো জায়গা নেই। পাগলা মেহের আলীর কথাই বাস্তব জীবনে ফলে গেল, সে বলল "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়"—ব্যস স্বয়ং ভগবানের জমিদারি গেল, তাঁর নায়েব গোমস্তা পাইক বরকন্দাজ পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে সরে পড়লেন। সুতরাং ভবিষ্যতে কি যে হয় বলা যায় না। এখনও এইটুকু মাত্র ভরসা যে বিজ্ঞান বস্তু-বিশ্লেষণ করতে করতে অণু পরমাণু ইলেকট্রন প্রোটন পর্যন্ত গিয়ে এক মহা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে বটে, কিন্তু সেই অদৃশ্য বিদ্যুতিন গুচ্ছ প্রথমে পরমাণু রূপে, তারপর অণু রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বস্তুপিণ্ড কি ভাবে গঠন করল তা আজও রহস্য। দৃশ্য সৌর-জগতের মতো এক একটা অদৃশ্য সৌরজগৎ-কল্প পরমাণু মহা শক্তিগর্ভ হয়েও নেগেটিভ পজিটিভে কাটাকাটি হয়ে স্থাণু হল কেন, তারা "অবাস্তব" হয়েও কেমন করে এই বস্তুপিণ্ড গড়ে তুলল, তা আজও রহস্য। সুতরাং "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" এ গান আরও কিছুকাল চলবে। আমি এ বিষয়ে ঘোর আশাবাদী। ভুল হয় তো করছি, কিন্তু তবু সান্ত্বনা এই যে "The optimist makes the same mistakes as the pessimist, but he enjoys them."

খাওয়ার পর থেকেই আমাদের মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, সে অবস্থাটা চোখের ভোজনেরও সম্পূর্ণ অনুকূল। যে দৃশ্য দেখলাম তা বর্ণনা করবার ভাষা নেই। একদিকে বিভূতি বাবু চিৎকার করছেন, আর এক দিকে

আমরা চিৎকার করছি। বিভূতি বাবু কামরার যে পাশে বসেছিলেন, আমরা তার বিপরীত পাশে। আমরা মনে করছি বিভূতি বাবু ঠকছেন, যা-কিছু দেখবার মতো দৃশ্য সব আমাদের দিকে। আবার বিভূতি বাবু ভাবছেন, আমরাই ঠকে যাচ্ছি; বিপরীত দিকে বসে দেখবার মতো দৃশ্য একা তিনিই দেখছেন। কারোই মুহূর্তকাল সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাবার উপায় নেই। বিভূতি বাবু চিৎকার ক'রে বলছেন, আপনারা ওদিকে কি দেখছেন, এদিকে দেখুন। আমরা যখন সেদিকে গেলাম, তখন বিভূতি বাবু বিপরীত দিক থেকে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, ওদিকে কি দেখছেন এদিকে দেখুন। আমরাও ঠিক তাঁর মতোই চেঁচাচ্ছি। কারোই একই সঙ্গে দুদিকে দেখবার চোখ নেই!

কিছুক্ষণ পরে বিভূতি বাবু উন্মাদের মতো উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, ক্ষেপে যান। কিন্তু ক্ষেপে যাওয়ার কিছু বাকী ছিল না, ওঁরা সবাই মিলে চিৎকার ক'রে গান গাইতে শুরু করলেন। সে গানে অবশ্য কারোই কোনো দায়িত্ব ছিল না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রিয় গান নিজ নিজ সুরে এক যোগে গাইতে লাগলেন, তবু তাকে সমবেত সঙ্গীত কেউ বলবেন না, কারণ সমবেত দূরের কথা সেটা গান কি না বলতে গেলে গানের ডেফিনিশন আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার।

গাড়ির বাইরে পলাশ ফুলের আগুন। যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের পর পাহাড়। আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল, তারই ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো শালবনের উপর এসে পড়েছে। খানিকটা আলো, খানিকটা ছায়া, দূরে নিকটে অরণ্যে পাহাড়ে সর্বত্র। আগুন শুধু বাইরেই নয়, পেটেও জ্বলে উঠল এত চেঁচামেচি করার ফলে। বিভূতি বাবু খাব খাব করে চেঁচাতে লাগলেন। কিরণকুমারকে বললেন, "আপনারা expedition-এর স্পিরিটটি ঠিক ধরতে পারেন নি, এতে কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না, কোনো হিসেব থাকবে না, দৃষ্টি থাকবে কেবলই বর্তমানের উপর, অতএব ব্যাগ খুলুন।"

ব্যাগে যা কিছু ছিল সবই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। তখন আবার মন চাঙ্গা

হয়ে উঠল, এবং বিভূতি বাবু একাই কীর্তন গাইতে লাগলেন। গাড়ির মধ্যে বয়স আমাদের সকলেরই ক'মে পনেরোর কাছাকাছি এসেছিল, কিন্তু কিরণকুমারের বয়স একেবারে দশে গিয়ে ঠেকল। সে জানালা দিয়ে মাথা বের ক'রে পথের লোকদের চিৎকার ক'রে ডেকে কুশলাদি প্রশ্ন করতে লাগল, ছুটন্ত গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যাকে দেখে তাকেই গলা ফাটিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছ ভাই সব, আশা করি আমাদের মতোই ফুর্তিতে আছ, না?" কিংবা, কোথায় চলেছ বোঝা মাথায় নিয়ে? ফেলে চলে এসো আমাদের সঙ্গে বিক্রমখোলে—সেখানে ভীষণ ব্যাপার—শিলালিপি পাওয়া গেছে—কিন্তু পড়া যায় না।"

পথের লোকেরা কৌতুক বোধ করে সে কথা শুনে।

ততক্ষণে প্রমোদ বাবু ও আমি বিভূতি বাবুর সঙ্গে গলা মেলাবার চেষ্টা করছি। এক দিকে কিরণকুমারের চিৎকার, আর এক দিকে আমাদের চিৎকার। এই মিলিত চিৎকারে শহুরে ভব্যতার ভূত আমাদের ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ নেমে গেল, আমরা চারজন চারটি বর্বর প্রাণীতে পরিণত হলাম। সুর ছাড়া আমাদের কণ্ঠে আর কোনো ভাষা রইল না।

বাইরের বায়ুমণ্ডল আমাদের দেহের প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গার উপর পনেরো পাউণ্ড পরিমাণ চাপ রক্ষা করছে, কিন্তু সেই চাপ হঠাৎ সরিয়ে নিলে আমাদের আর রক্ষা থাকে না। ব্যাপারটা সোডা ওয়াটারের বোতল খোলার মতো হয়। নতুন আবেষ্টনে আমাদেরও সেই দশা হ'ল। শহরের কৃত্রিম বায়ুর চাপ আমাদের মনের উপর থেকে হঠাৎ সরে গেল।

সিনি জংশনের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রচুর মোটর গাড়ির সমাবেশ দেখে আমরা একটু চমকে গিয়েছিলাম। একটা অখ্যাত স্টেশনে এত গাড়ি কোত্থেকে এলো? ওখানকার লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল সেরাইকেল্লার রাজপুত্রের বিবাহ। এখান থেকে সেরাইকেল্লা প্রায় বিশ মাইল, গাড়িগুলোতে বরযাত্রীরা সব এসেছে স্টেশনে। ঘটনাটার মধ্যে একটু কৌতুক আছে। এত লোকজন এবং গাড়ি দেখে আমরা এই স্টেশনকেই টাটানগর

কিংবা ঐ জাতীয় কোনো বড় স্টেশন মনে করেছিলাম। টাটানগরও ইতিপূর্বে দেখিনি। তাছাড়া একদিকে রাজপুত্রের বিবাহ উৎসব—অন্যদিকে তারই পাশে তৃতীয় শ্রেণীর চারজন যাত্রী মানসিক আনন্দে রাজপুত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে চলেছি ব্যাগের ভিতর কয়েকখানা পাঁউরুটি নিয়ে। ভেবে পুলকিত হলাম।

বিভূতি বাবু তাঁর অভিযাত্রিক বইতে এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখছেন, "বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা স্টেশন থেকে মনোহরপুর পর্যন্ত দুধারের অরণ্য পর্বতের দৃশ্য অতুলনীয়। গৈলকেরা স্টেশনে এসে পাহাড় জঙ্গলের দৃশ্য দেখে প্রমোদ বাবু তো একেবারে নির্বাক! পরিমল বাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সামনের পাহাড়ের একটা ফোটো তুলে নিলেন! ···বসন্তকাল, বনে বনে রক্তপলাশের সমারোহ, সারেঙ্গা টানেলের মুখে ধাতুপ ফুলের বন, শালবনে কচি সবুজ পত্রের সম্ভার, প্রচুর সূর্য্যালোক, বনের মাথার উপর নীল আকাশ, মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য নদী শীর্ণধারায় সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে,··· প্রমোদ বাবু আর কিরণের খুশি দেখে কে!···"

বিভূতি বাবুর এই ভ্রমণ কথা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, এবং এর মধ্যেকার অনেক ঘটনাই তাঁর স্মৃতিপটে ওলোটপালট হয়ে গেছে। তবে সেগুলো ভবিষ্যতের কোনো ইতিহাসের উপাদান যোগাবে না এই যা সান্ত্বনা। খুঁটিনাটি তথ্য গাছপালা সম্বন্ধেই তিনি বেশি সংগ্রহ করেন, এবং মনে হয় যেন মানুষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ তত তীব্র নয়। প্রকৃতি তাঁর কাছে সব সময়েই পুরোভাগে; আমার কাছে প্রকৃতি অধিকাংশ সময়েই পটভূমিকা রচনা করে—মানুষকে দেখি আমি সেই পটভূমিকায়। প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে বিস্ময়, সেই বিস্ময়ে প্রকৃতি অনেক সময় আমার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়ে। এর একটা কারণ হয় তো এই যে বিভূতি বাবু স্পিরিচুয়্যাল এবং স্পিরিচুয়্যালিস্ট দুইই, আর আমি স্থূলবাদী। তবে ও দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা কোথায় তা জানি না। বিভূতি বাবু সে জন্য যে দৃষ্টিতে দেখেন, আমার সঙ্গে তার ষোল আনা মিল না হওয়াই সম্ভব। তাঁর লেখার সঙ্গে এই লেখাটি মিলিয়ে পড়লেই আমি কি বলতে চাই তা বোঝা যাবে। আমার চোখে, সুতরাং

আমার এই লেখায়, আমার ভ্রমণসঙ্গীরাই প্রধান। আমার এ কাহিনীর নায়ক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়; নতুন আবহাওয়ায় এঁরাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল। সার্কাস দেখছে এক পরিবার। ছোট ছেলেটি সার্কাসের খেলাগুলো না দেখে সর্বদা পিছন ফিরে দর্শকদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মা বললেন "তুই এদিকে কি দেখছিস, খেলাগুলো দেখ।" ছেলে বলল, "খেলা দেখে তোমাদের মুখে যে ভাব ফুটে উঠছে, সার্কাসের খেলার চেয়ে তা আমার কাছে আরও বেশি ভাল লাগছে।"

আমরা এসে পৌছলাম চক্রধরপুর স্টেশনে। এখানে আগুন কিছুটা নিবল। চা বিক্রেতারা অত্যন্ত নোংরা, কিন্তু তাদের মুখের ধ্বনি মধুর। কেউ বলছে "হিন্দু চা," কেউ বলছে "ইসলাম চা"। এই দুই ধ্বনিকে চাপা দেবার জন্যই বোধ হয় পরে "ভারতীয় চা"-এর ধ্বনি তুলতে হয়।

চক্রধরপুর স্টেশনেই বিভূতি বাবুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। বাইরের দৃশ্যে তাঁর মানসিক সোডার বোতল থেকে আর বুদ্বুদ উঠছে না, তিনি কেমন যেন দমে গেছেন। তাঁর যে চোখ ছিল এতক্ষণ বাইরের ফুলের দিকে, সেই চোখ ফিরল ফেরিওয়ালাদের ফলের দিকে! লজিক ঠিক আছে; ফুল থেকেই ফল! বিভূতি বাবু নৈসর্গিক অভিব্যক্তিধারা অনুসরণ ক'রে বললেন, "পেঁপে খাব।"

৪

যত বেলা বাড়ছে ক্ষিধেও তত বেড়ে যাচ্ছে। শেষে এমন হ'ল যে যে-স্টেশনে যা পাওয়া যাচ্ছে তারই দিকে পড়ছে আমাদের শ্যেন দৃষ্টি। সে এক জঘন্য পরিস্থিতি। কোনো জায়গাতেই সুবিধাগতো কিছু পাওয়া যায় না—যা পাওয়া যায় তা এমনই নোংরা, বাসি, পচা, ধূলিমলিন এবং মাছিপরিবেষ্টিত যে উগ্র দেশপ্রেম থাকলেও তা দেশের 'অবদান' বলে গ্রহণ করা যায় না। যারা এই খাদ্য বিক্রি করে তারা অশিক্ষিত, দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী। এরা দেশের শত্রু, অথচ এদেরই ভেণ্ডরের লাইসেন্স দিয়ে রেলস্টেশনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই অবস্থায় বিভূতি বাবুর দৃষ্টি যে ফলমূলের দিকে ফিরেছে সেজন্য তাঁকে প্রশংসাই করতে হয়। আমাদের খাদ্য তালিকায় অতঃপর পেঁপে, শাঁখআলু, মুড়ি, ছানা, যেখানে যা মিলল তাই স্থান পেতে লাগল। বিভূতি বাবুর "কিছুই খাবনা" আদর্শটাও এতে অনেকখানি বেঁচে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে মারমালেড নিয়ে যে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল তা বলা হয় নি। ঐ টিনটা যখন প্রথম খোলা হয় তখন বিভূতি বাবু তার স্বাদ গ্রহণ ক'রে ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। মারমালেড একটু তিক্ত স্বাদেরই হয়। তারই তিক্ততায় বিভূতি বাবুর রসনা সাময়িকভাবে তিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন খাবার ব্যাপারে এই চালিয়াতি তিনি দুচোক্ষে দেখতে পারেন না। সব বিষয়ে par venu হব কেন? ইত্যাদি। শুধু এই খাদ্যটি নয়, ওটি যিনি এনেছিলেন তিনিও বিভূতি বাবুর চক্ষুশূল হয়ে রইলেন, এবং টিনটি আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে পুরলেন—মারমালেড তিনি কাউকে খেতে দেবেন না।

কিন্তু মারমালেড এনেছিলেন কে, তার মীমাংসা হওয়া দরকার। বিভূতি বাবু তাঁর অভিযাত্রিক বইতে লিখেছেন "...এ নাকি সেভিলের তেতো কমলালেবুর খোসায় তৈরী মারমালেড, টিনের গায়ে লেখা আছে। পরিমল এটা কিনে এনেছিল—তার উপরে সবাই খাপ্পা। কেন বাপু কিনতে গেলে সেভিলের তেতো কমলালেবুর মারমালেড? বাজারে জ্যাম জেলি ছিল না?"

এই ভ্রমণ শেষ ক'রে এসেই আমি সে সময় ছোট্ট একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখি—একখানা মাসিক পত্রে তা ছাপা হয়েছিল। তা পড়ে দেখছি তাতে লেখা আছে—"প্রমোদবাবুর সঙ্গে মারমালেড ছিল।...মারমালেডের উপর বিভূতি বাবু অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন কেননা উহা খাইতে একটু তিতো।"

কিছুদিন পূর্বে আমাদের অন্যতম ভ্রমণসঙ্গী কিরণকুমারের সঙ্গে দেখা। তাকে একথা বলাতে সে বলল "মারমালেড বোধহয় আমিই কিনেছিলাম।"

প্রমোদ বাবুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ওটি প্রমোদ বাবুই কিনেছিলেন।

এ বিষয়ে সায়নাচার্য এবং বোপদেব কি বলেন তা এখনও দেখা হয়নি। যাই হোক, বিভূতি বাবু টিনটি পকেটেই রাখলেন, কাউকে খেতে দিলেন না।

আমরা যখন বেলপাহাড় স্টেশনে পৌছলাম তখন বেলা দুটো। সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনারের কাছে আগেই খবর দেওয়া ছিল। তিনি বেলপাহাড়ের গাঁউটিয়া বা মোড়লকে আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথা সময়ে আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রমোদ বাবুর দাদা শ্রীযুক্ত নীরদ দাসগুপ্তের সঙ্গে উক্ত ডেপুটি কমিশনার মিস্টার সেনাপতির আলাপ ছিল। তাঁরই অনুরোধ মতো আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন তিনি করেছিলেন। কিন্তু এ রকম অভ্যর্থনা আমরা আশা করিনি। সে এক বিষম কাণ্ড। অনেকগুলো লোক সারবন্দীভাবে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট স্টেশন এতে আমাদের দাম অনেক বেড়ে গেল।

স্টেশন থেকে মিনিট দশকের পথে ডাক বাংলো। তাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু দেখা গেল আহারের কোনো বন্দোবস্তই নেই। বিভূতি বাবু ইতিপূর্বে বলেছিলেন ভ্রমণে কিছু খাওয়ার দরকার হয় না। শুনলাম তাঁরই নির্দেশে ডেপুটি কমিশনারকে খবর দেবার সময় বিশেষভাবে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আহারের কোনো বন্দোবস্ত যেন না থাকে। বিভূতি বাবু বাংলোর বারান্দায় বিষণ্ণভাবে বসে রইলেন—মনে হ'ল যেন সেই মুহূর্তে তিনি সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মনে মনে বুঝলাম প্রেরণাটা অন্তর থেকে নয়—পাকস্থলী থেকে।

দূরে একটা বড় পুকুরের মতো ছিল। সেখানে স্নান করা যাবে কল্পনায় বড় ভাল লাগল। মাঠের মধ্য দিয়ে সরু পথ। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। পশু-জীবনের প্রতি ঈর্ষা জাগল। মাঠে খাদ্যের অভাব ছিল না। যাই হোক, বিভূতি বাবুকে ফেলে আমরা তিনজন একটু দূরে গিয়ে আহারের বিষয়ে আলোচনা করছি—এমন সময় বিভূতি বাবু উঠে এসে বললেন, ভাবছেন কি আপনারা—সব ঠিক হয়ে গেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে রান্নার জোগাড় হয়ে যাবে।

অতগুলো পরিচারক আমাদের সেবায় নিযুক্ত অথচ কিছুই তাদের করবার

নেই, এ অবস্থা তাদের পক্ষেও অস্বাভাবিক লাগছিল। তারা একটু ইঙ্গিত পাবামাত্র ছুটে বেরিয়ে গিয়ে রান্নার আয়োজন ক'রে ফেলল। বিভূতি বাবু একাই স্নান সেরে এলেন, আমরা গেলাম একটু পরে। আমরা ফিরে এসে দেখি বিভূতি বাবু সেই এক টিন মারমালেড শেষ ক'রে টিনের ভিতরে জিভ ঢুকিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছেন।

আমাদের দেখে হেসে বললেন, "সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তেতো লাগছে।"

অল্প সময়ের মধ্যেই রান্না শেষ হ'ল। খেতে বসলাম বিনা বাক্যব্যয়ে। আলোচালের ভাত এবং ডাল। ভাত খেলাম শালপাতায়—ডাল, শালপাতার বাটিতে। আমরা যেখানে স্নান করলাম তারই পাশে গ্রাম্য হাট বসেছে। ওড়িয়া মেয়েরা হাট থেকে ঝুড়ি মাথায় আসা যাওয়া করছে। হাটে গেলাম সবাই। বেগুন কুমড়ো প্রভৃতি তরিতরকারী চিংড়ি মাছ ও মুড়ি মুড়কি জাতীয় খাদ্য বিক্রি হচ্ছে। ধানের বিনিময়ে মুড়কি কিনতে দেখা গেল সেখানে।

বিক্রমখোল রওনা হবার পাঁচছ দিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম একটি পাগলা হাতী এই অঞ্চলে দেখা দিয়েছে,—একটি "proscribed rogue elephant"! এখানে এসে তারই কথা প্রথম মনে পড়ল। জংলা পথে যেতে হবে, পাগলা হাতীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় জানা নেই। ভাবলাম স্টেশনে গিয়ে স্টেশনের লোকদের কাছে পথের কথা শোনা যাক।

সন্ধ্যার দিকে গেলাম স্টেশনে। শুনেছিলাম স্টেশন-মাষ্টার এবং তাঁর সহকারী, বাঙালী। হাতীর কথা প্রসঙ্গে চায়ের কথাটাও বলা যাবে এইরকম একটা আশা আমাদের সবার মনেই জেগেছিল। কিরণকুমার বলল এ বিষয়ে সে নেতৃত্ব করতে রাজি আছে। বলল কোনো সূত্রে যদি একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় তা হ'লে চাই কি রাত্রের সমস্যাটারও একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নিরাশ হতে হল। যে পাথর দেখতে আমরা এতদূর এসেছি, সেই পাথরের প্রতিচ্ছবি দেখলাম স্টেশনে ছোট বাবুর মুখে। কিরণ-কুমার বুঝল মৃদু আঘাতে এ পাথর ভাঙবে না। তাই সে প্রথমেই চায়ের কথা পাড়ল তাঁর কাছে। ছোটবাবু বললেন, বেশ তো বেশ তো। তবে তাঁর হাতে

কাজ আছে বলে তিনি একখানি আদেশপত্র লিখে খালাসীর হাতে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর কাছে জানা গেল বন্য পথ খুব নিরাপদ নয়। বাঘ ভালুক ও আরও দুচার রকম হিংস্র প্রাণী এই সব অঞ্চলে আছে। আর কোন্ প্রাণী থাকতে পারে প্রশ্ন করলাম। তিনি এক হায়েনা ছাড়া অন্য কিছুর নাম বললেন না, তবে সাপও আছে জানা গেল। রীতিমতো জেরা ক'রে ক'রে কথা বের করতে হল। আমাদের মতো এ সব বিষয়ে তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। আমরা চট ক'রে আমাদের অভ্যাস মতো সেখানকার ঐতিহাসিক পরিচয় ইত্যাদি যতই সংগ্রহ করতে চাই—flora fauna ইত্যাদির পরিচয় জানতে চাই, ছোট বাবু ততই তাঁদের নিজেদের দুরবস্থার কথা বলতে থাকেন। আমাদের নানা রকম প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শেষে বললেন, "আপনারা নতুন এসেছেন, সব নিজ চোখে দেখুন, আমরা মশাই এর মধ্যে নতুন কিছু দেখিনে ; দিনে কাজ করি, রাত্রে বাঘের ডাক শুনি। ঐ যে সামনে পাহাড় দেখছেন। ঐ খানে সব ভালুক ছুটে ছুটে বেড়ায়, দেখে শুনে কোনো রকমে দিন কেটে যায়।"

কথাগুলো দ্রুত বলেই তিনি উঠলেন, বললেন তিনি বাসায় গিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের ততক্ষণ বাইরে প্লাটফর্মে অপেক্ষা করতে বললেন।

আমরা বাইরে কিছুক্ষণ বসতেই দেখি বড় বাবু, স্টেশনের দিকে আসছেন। তিনি আসতে আসতে আমাদের কাছথেকে অন্তত পনেরো হাত দূরে থেমে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনাদের কি চা"—

কথাটা শেষ হবার আগেই প্রমোদ বাবু বললেন—"ছোটবাবুর বাসায় বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।"

" ও, তাহলে ভালই, এক জায়গায় হলেই হল"—বলে তিনি আর এগোলেন না, ফিরেই গেলেন। মনে হল যেন তাঁদের পাড়া থেকে কথাটা শুনেই বেরিয়েছিলেন, এবং সেই সুযোগে ভদ্রতা রক্ষা ক'রে গেলেন। এখানে অবশ্য ভদ্রতা রক্ষার কথাই ওঠে না, কেননা আমরা এমন ভাবে প্রস্তুত ছিলাম যে ওঁদের আপত্তি থাকলেও জোর করেই চা আদায় করতাম। আমাদের কলকাতার

খুব বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত লোক মনে ক'রেই স্টেশনের লোকেরা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।

চার কাপ চা যথা সময়ে এলো, আমরা চা খেয়ে রেল লাইন পার হয়ে মাঠে বেড়াতে গেলাম। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দূরে, পশ্চিম আকাশে একটি পাহাড়ের মাথা, তারও উপরে একখণ্ড মেঘ অস্তগত সূর্যের লাল রশ্মিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কেমন একটা মধুর প্রশান্তি। আরও একটু পরে সমস্ত পরিমণ্ডল আবছা হয়ে এলো।

বিভূতি বাবু এ দিকে ওদিকে ঘুরে গাছপালা ঘাস এই সব দেখে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ দেখি তিনি কোথায় সরে পড়েছেন। আকাশের ক্ষীণ আলোয় আমাদের সবার অস্তিত্বই স্পষ্ট, কিন্তু বিভূতি বাবুর চিহ্ন নেই। দুতিনবার ডাকতেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কোথায় গেলেন বন্ধুবর এই কথা আলোচনা করছি এমন সময় অত্যন্ত কাছ থেকেই তিনি কথা বলে উঠলেন। বললেন "কি করছেন, এদিকে আসুন।"

শব্দ লক্ষ্য ক'রে দুচার পা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল বিভূতি বাবু অত্যন্ত অ-মানুষিক অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। ভঙ্গিটা হামাগুড়ি দেবার মতো—অথচ নাক সুদ্ধ মাথা মাটি স্পর্শ করেছে। ঠিক যেন একটি মেষশাবক ঘাস খাচ্ছে।

—"ব্যাপার কি ?"

—"অদ্ভুত গন্ধ এখানকার মাটির, শুঁকছি। আপনারাও শুঁকুন।"

আমরা চারজন তখন সারবন্দীভাবে বেলপাহাড়ের মাটি শুঁকতে লাগলাম। মাটির যেমন গন্ধ হয়ে থাকে তাই, কিন্তু সেই দূর দেশে, অপরিচিত আবেষ্টনে, রাত্রির নক্ষত্রদীপ্ত আবছা অন্ধকারে, হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত অন্তরে, বহুদিন মাটির গন্ধ বঞ্চিত চারজন সহরবাসীর কাছে সেই গন্ধ ভালই লাগল।

এমন সময় আল্লার নাম করতে করতে একটি শীর্ণ মূর্তি আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

হয় তো আমাদের দেখে তার মনে হয়েছে আমরা নামাজ পড়ছি, তাই সে আমাদের উদ্দেশে কিছু শুভকামনা জানাল।

রাত্রে গাঁউটিয়া এসে আমাদের জানিয়ে গেল, পর দিন বিক্রমখোল যাবার সব বন্দোবস্ত সে ক'রে রেখেছে। বন্দোবস্ত মানে দুখানা গোরুর গাড়ি—তাইতে আমাদের যেতে হবে বিক্রমখোলের দিকে। পথে একবার মাত্র বিশ্রাম করতে হবে গ্রিণ্ডোলা নামক গ্রামে।

বিভূতি বাবু তো গাড়ির প্রস্তাবে মহা খাপ্পা। চার জন তাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব, তা ছাড়া তাতে দেশের পরিচয় কিছুই পাওয়া যাবে না। কথাটায় আপত্তি কিছুই থাকতে পারে না, কেননা স্থানীয় লোকেরা বলেছে পথ দীর্ঘ নয়—মাত্র পাঁচ ছ মাইল। পথের দূরত্ব অবশ্য আমাদের জানা ছিল, এবং এটাও জানতাম যে পল্লীগ্রামের কোনো লোকই মাইলের পরিমাপে পথের দূরত্ব বোঝাতে পারে না। খাঁটি দশ মাইলকে পাঁচ ছ মাইল বলা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে আসাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়—তবু আমি একটু প্রতিবাদ জানালাম। আমি এঁদের মধ্যে দুর্বলতম, সেজন্য একটু সাবধানী, বিভূতি বাবুর মতো দুঃসাহস আমার নেই। আমি বললাম, আমরা পায়ে হেঁটেই যাব, কিন্তু সঙ্গে অন্তত একখানা গোরুর গাড়ি থাক,—যদি সামর্থ্যে না কুলোয়, তখন ব্যবহার করা যাবে। বিভূতি বাবুর তাতেও আপত্তি ছিল, কিন্তু আমি জোর করাতে একখানা গাড়ি আমাদের সঙ্গে যাবে ঠিক হ'ল।

সন্ধ্যাবেলা কিছু ডিম সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছিল, এবং কিরণকুমার খুব কৌশলে একটুখানি রুটি ও মাখন লুকিয়ে রেখেছিল। সকালে তাই একটু একটু খেয়ে রওনা হওয়া গেল। তখন আটটা বেজে গেছে। সঙ্গে দুজন ভারী (অর্থাৎ বাহক) বাঁকে ক'রে আমাদের বিছানা ব্যাগ ইত্যাদি বয়ে নিয়ে চলল। গোরুর গাড়িতে আর কিছু দিলাম না, খালি গাড়ি আগে রওনা হয়ে গেল।

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই ছোট ছোট শাল গাছের অরণ্যপথে গিয়ে পড়লাম।

জমি একটু একটু করে উঁচু হয়ে চলেছে। সেখানকার দৃশ্যে এমন একটা নবীনতা ছিল যাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। পথের ধারে ঘাস গুলো থেকে তখনও শিশির বিন্দু শুকিয়ে যায় নি। সকালের সোনালি রোদ এসে পড়েছে তার উপর। আমি তো সেখানে থেমে গেলাম। বললাম প্রথম যাত্রা পথের একখানা ফোটোগ্রাফ থাকা দরকার।

বাঁয়ের দিকে প্রমোদবাবু—হাফ প্যাণ্ট পরা, শাদা কোট গায়ে, মাথায় শোলা টুপি। আর একটু দূরে কিরণকুমার ধুতি শার্টের সঙ্গে শোলা টুপি মাথায়, খুব স্টাইলের সঙ্গে ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে right angle সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে। তার বাঁ ধারে বিভূতি বাবু—তাঁর মাথায়ও শোলা টুপি—অভিযান নেতৃত্বের গর্ব ফুটে উঠেছে তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। পথের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে আছে 'ভারী' আমাদের বোঝা কাঁধে নিয়ে। প্রত্যেকের পায়ের নিচে থেকেই ছায়া বেরিয়ে গেছে পথের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত। পিছনে ও আশে পাশে ঝোপ ও ছোট ছোট গাছ। অরণ্য নিবিড় নয়। মনে অভূতপুর্ব আনন্দ।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা কবিরা নানা ভাবে লিখেছেন। প্রকৃতিকে কখনও পৃথক সত্তা হিসাবে, কখনও মানুষের সঙ্গে একীভূত ক'রে তাঁরা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রকৃতি যে মানুষের মনে বিস্ময়ের চেতনা জাগায়, আনন্দের চেতনা জাগায়, তার কারণ দেহের সুখ থেকে মনের আনন্দ অধিকাংশ সময় আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু দেহের সঙ্গেই যে মনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে কথাটাও মাঝে মাঝে স্মরণ করা উচিত। ফুলের সম্ভার মনে যে আনন্দ জাগায়—ধানের ক্ষেতও সেই আনন্দ জাগায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। দুটোই সমান আনন্দ জাগায়। এক এক সময়ে এক একটা বড় হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখবার উপযুক্ত সব রকম জিনিসই তৈরি হয়ে আছে। মানুষ আসবে বলে প্রকৃতি তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে বহু দিন আগে থাকতে। যে প্রকৃতি মানুষের উদরের জন্য ফল ফলিয়েছে, সেই প্রকৃতি মানুষের মনের জন্য ফুল ফুটিয়েছে। কাজেই

মনের খাদ্য যখন দরকার, তখন প্রকৃতির আবেষ্টনে এলে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এই স্বাভাবিক জিনিসটি নিয়ে আমরা যে বাড়াবাড়ি করি—সে কেবল মনকে অনাহারে রাখার জন্য। ভাতের ফেনও যে অবস্থা-বিশেষে মানুষের মনে সমান উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তা গত ক বছর ধরেই দেখছি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দুটোর মূল্যই এক। কিন্তু তবু কবিরা আজও সমুদ্রের ফেনার উপর কবিতা লেখেন, কিন্তু ভাতের ফেনের উপর কবিতা লিখতে লজ্জিত হন।

আমার মতে কবিদের কিছুকাল না খাইয়ে রাখা উচিত। অবশ্য বাংলা দেশের ক জন কবিই বা খেতে পান? বাড়িতে ফেন খেয়েও তাঁরা যে জীবন ধারণ ব্যাপারটাকে চেপে রাখতে চান সে কেবল সংস্কারের বশেই। একটি কবিতা লিখে সের দশেক চাল পাওয়া যায়, কখনও বা তাও পাওয়া যায় না—এ লজ্জাকে চেপে রেখেও কবিতা লিখতে হয়। উপায় কি? এইটেই প্রথা। কিছুকাল আগেও কবিতার দাম ছিল না এ দেশে। এখনও কি আছে?

যাই হোক আমরা যে মানসিক আনন্দ ভোগ করতে করতে চলেছি তার গোড়ায় প্রতি একঘণ্টা অন্তর উদরকে ঘুস দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উদর যখনই বিদ্রোহ করবে বলে শাসিয়েছে, তখনই তাকে আদর ক'রে এটা-সেটা দিয়ে ভোলাতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, "লক্ষ্মীটি, কলকাতায় ফিরে গিয়েই তোমাকে পূর্ণ করে তুলব—একটা দিনের জন্য মনকে মুক্ত রাখ, আজকে কেবল তাকে প্রকৃতির আনন্দ ভোগ করতে দাও।" উদর বলেছে—"আজকে তা হলে কি একেবারে ফাঁকি?" তার উত্তরে বলেছি, "পাগল না কি? একেবারে ফাঁকি দিলে চলে? কোনো ভয় নেই, পথে একটা কিছু ব্যবস্থা করবই।" উদরকে ভদ্রলোক বলতে হবে—এই স্তোকবাক্যে সে সহজেই রাজি হয়ে গেল।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা হেঁটে গ্রিণ্ডোলা গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌছলাম। আড়াই ঘণ্টায় আমরা অতিক্রম করেছি ছ মাইল পথ। হাল্কা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। আশে পাশে কোথাও ঘন বন। লোকালয় বড় বেশি দেখা গেল না। দূরে দূরে দুএকখানা ঘর। আমরা এই সময় একটা ছোট মাঠ পাড়ি দিতে দেখলাম একদল মেয়ে পুরুষ একটা

আমগাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে সেখানে রান্না ক'রে খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করছে। আমাদের দেখামাত্র তাদের মধ্যেকার কয়েকজন আমাদের লম্বা সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। তারা কে, প্রশ্ন ক'রে জানা গেল তারা নৃত্য-ব্যবসায়ী। বড় আশা করে তারা আমাদের কাছে এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ আদেশ হলে তখুনি সেখানে নাচ দেখাতে পারে।

সেই সুদূর গ্রাম্যপথে আমাদের পোশাক সবার মনেই একটা ভয়মিশ্রিত বিস্ময় এবং সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলেছিল। বিশেষ ক'রে আমরা যে সরকারী লোক এই ধারণাই প্রথমে জেগেছে সবার মনে। সরকারী লোকের অসীম ক্ষমতা, তারা দেশের রাজা, তারা ভাগ্য বিধাতা, তাদের সমীহ ক'রে চলতে হয়, এ জ্ঞান দেশের সর্বত্র বিস্তারিত। মাথায় একটা শোলা টুপী—বাস্ আর কোনো চিহ্নের দরকার নেই,—জনতার শির লুটিয়ে পড়ে এই টুপীওয়ালার পায়ে। এ কি শ্রদ্ধা? না সম্মান? না সরকারী বিভীষিকা?

নৃত্য ব্যবসায়ীর দলে শাদা চুল দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ ছিল, আর ছিল কয়েকজন কিশোরী, যুবতী আর যুবক। বিভূতি বাবু বললেন আমরা বিকেলে গ্রিগোলা গ্রামে নাচ দেখব। এই বায়না পেয়ে তারা তো মহা খুশি। হয়তো তারা স্টেশনের দিকেই আসছিল, কিন্তু সরকারী হুজুরদের চিত্তরঞ্জন ছেড়ে কি আর কোথায়ও যাওয়া যায়? তা ছাড়া হাতের খদ্দের।

গ্রিগোলা গ্রামটি খুব চমৎকার। রাস্তার দুধারের বাড়িগুলোর মাটির দেয়ালগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার। গ্রামটি অবশ্য খুব ছোটই মনে হ'ল। এখানে একটা বাড়িতে আমাদের বিশ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। ঠিক হ'ল আমরা এখান থেকে কিছু জলযোগ ক'রে বিক্রমখোল রওনা হব এবং সেখান থেকে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করব। জলযোগের জন্য বেলপাহাড়ের সেই গাঁউটিয়া দুধ এবং ওখরা জোগাড় করে আনল। ওখরা হচ্ছে গুড়ের মুড়কি। গাঁউটিয়া আমাদের বহু আগেই এখানে এসে পৌঁছেছিল।

কিন্তু বিক্রমখোল থেকে ফিরে এসে কি খাব তার নির্দেশ দিতে হবে আগেই। বিভূতি বাবু বললেন পুরী বা লুচি করবে। আমি তাতে খুশি হলাম

না, কারণ ভাতের দিকেই টান আমার বেশি। বিভূতি বাবু বললেন, ভাত খেয়ে এক পা হাঁটতে পারবেন না। এত হাঁটার পরে ভাত খেলে এখানেই রাত কাটাতে হবে।”

আমি সে কথা মানলাম না। কারণ আমি এত কম খাই যে কোনো সময়েই খাওয়ার পর অস্বস্তি বোধ করি না, ভাত খাওয়ার পরেও না। বরঞ্চ লুচি খেলে দুর্বল হয়ে পড়ি সহজেই। তাই ঠিক করা গেল আমার একার জন্য ভাত হবে এবং তিনজনের জন্য পুরী হবে। বিভূতি বাবু প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না।

বিক্রমখোল রওনা হবার সময় আমাদের সঙ্গে তিনজন পথপ্রদর্শক চলল। এইখান থেকে পাহাড় ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠেছে। এর আগে যে পথ অতিক্রম করেছি সে পথে চড়াই উৎরাই থাকলেও তা পাহাড় নয়—এইবার যেন প্রকৃত পাহাড়ের স্পর্শ পেলাম। তবু উঁচু বেশি নয়—gradient (ক্রমোচ্চতা) আধমাইলে এক ফুট হবে হয়তো। পায়ের কোনো কষ্টই হচ্ছিল না। মাত্র দুএক জায়গায় gradient ওর চেয়ে সামান্য একটু বেশি মনে হয়েছিল। কিংবা আরও বেশি ছিল, আনন্দে কিছু খেয়াল নেই।

গ্রিণ্ডোলা থেকে এর কিছুদিন আগে মোটর যাবার মতো একটি পথ তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়ে পাহাড়ের অরণ্যপথ ধরলাম। আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের কোনো ত্রুটি নেই। খাওয়া থাকার ভাবনা করব না, ভাল পথ থাকতে জংলা পথ বেছে নেব, গাড়ি থাকতে হেঁটে যাব, ইত্যাদি কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের মতোই আমাদের চালচলন হওয়া চাই। মাথার টুপাটার কথা কেবল মনে পড়ে নি, মনে পড়লে, ওটাও হয়তো টান মেরে ফেলে দিতাম।

বিভূতি বাবু ইতিপূর্বে আসাম আরাকান ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন—সুতরাং ভ্রমণ বিষয়ে তাঁর নির্দেশ আমাদের প্রায় গুরুর আদেশ হয়ে দাঁড়াল। অরণ্যের পথে হিংস্র জন্তুর আবহাওয়ায় চলার কল্পনাটা আমাদের সবারই খুব ভাল লেগেছিল, তার কারণ আমাদের সঙ্গে তিনজন স্থানীয় অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক

ছিল। চলতেও বেশ আরাম বোধ হল। বন্যপথ ছায়াপথ। নানাজাতীয় বনস্পতির অরণ্য, কিন্তু ঝোপ খুব বেশি ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে পথের দুপাশে ছোট ছোট ঝোপ ছিল এবং তার মধ্যে অনায়াসে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারত। অরণ্যে মানুষের চলার চিহ্ন বেশি নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ—গভীর নির্জন—এবং তারই মাঝে মাঝে বাঘ মারবার জন্য পরিত্যক্ত মাচা কয়েকটা দেখা গেল। যত দূর যাই গাছের পর গাছ, জনমানবের চিহ্ন নেই। কোথায়ও বাঘের তাড়া খেলে আশ্রয় নেব এমন জায়গা নেই। বন্য বরাহের, বাঘের এবং ভালুকের থাকবার জায়গা এবং পরিচিত চিহ্নসমূহ পথপ্রদর্শকেরা আমাদের দেখাতে লাগল। তাদের সঙ্গে লাঠি এবং ধারালো অস্ত্র ছিল। জঙ্গলের ভিতর আমলকির ছড়াছড়ি। হরিতকীরও অভাব ছিল না। সবাই মিলে আমলকি আর হরিতকী কুড়িয়ে পকেটে পুরলাম।

একটা নতুন ধরণের গাছ দেখে আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। সে গাছ যেন মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি, এমন পালিশ এবং ঠাণ্ডা। তার গায়ে কে যেন খুব যত্ন ক'রে পাউডার মাখিয়ে রেখেছে। এই গাছের নাম 'গ্রিণ্ডোলা'! 'গ্রিণ্ডোলা' গাছ থেকে গ্রামের নাম, না গ্রামের নাম থেকে গাছের নাম কেউ বলতে পারল না। কিরণকুমার সে গাছকে আলিঙ্গন করল—এবং এতক্ষণ হাঁটার ফলে উত্তপ্ত মুখ গাছের সঙ্গে চেপে রাখল ঠাণ্ডা হবার জন্য। তার ফল অন্য দিক দিয়ে হল হাস্যকর। কিরণকুমার বলল এই গাছই মহাদেব। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখা।" "তবে জড়িয়ে ধরলে কেন?"—বলল, "শিবোঽহং—আমি স্বয়ং শিব হয়েছি।" কথাটা ঠাট্টা করে বলা, কিন্তু গাছের পাউডার কিরণকুমারের মুখে লেগে মুখখানা ছাইমাখার মতোই দেখাচ্ছিল।

এইভাবে হল্লা করতে করতে আমরা এসে পড়লাম আমাদের গন্তব্যস্থানে।



বেলপাহাড় স্টেশন থেকে বিক্রমখোলের পথে

শিলালিপি-খোদিত পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম

('সম্বলপুরের পথে' দ্রষ্টব্য)



দার্জিলিংয়ের …
আকাশ
('দার্জিলিংয়ের …
দপ্তর')

৬

আমরা যখন বিক্রমখোল পৌছলাম তখন বেলা একটা বেজে গেছে। সেখানকার পরিমণ্ডলে কি এক গভীর প্রশান্তি। মনে হল যেন বহু যুগ যুগান্ত পার হয়ে আমরা এক অতীত যুগে প্রবেশ করলাম। সে জঙ্গলে কোথাও এমন কোনো চিহ্ন ছিল না যা বর্তমান যুগের কোনো পরিচয় বহন করে।

বড় বড় গাছ থেকে মাটির বুকের ছোট্ট ঘাসগুলো সবই সেকালেও ঠিক এমনি ছিল। তখনকার লোকেরাও এই থানে বসে যে আনন্দ পেয়েছে আমরাও তাই পেলাম।

বসলাম গিয়ে একটি ছোট্ট পাহাড়ের কোলে। এই পাহাড়ের গায়ে সেই প্রাচীন লিপি খোদিত আছে। পাহাড়টি নিতান্তই ছোট, দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশ ফুট, এবং উচ্চতায় কুড়ি ফুট এই রকম মনে হল। প্রকাণ্ড একটা সাপের ফণার মতো মাথার উপর অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। ঠিক গুহা নয়, সাময়িক বিশ্রামের উপযোগী যেন পাহাড়ের চাল-ওয়ালা একখানি বারান্দা। এর চেহারায় এমন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ না ক'রে পারে না। আমাদের পক্ষে এ সৌন্দর্য যে অপরূপ মনে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তবু বলব শুধু চোখে দেখার সৌন্দর্য অপেক্ষাও সমস্ত দেহ মন দিয়ে এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় বেশি। যে-কোনো লোক এই অরণ্য পথে এলে তার মনে হবে এইখানে একটু বসে যাই, সে জন্য তার কল্পনাপ্রিয় হবারও দরকার নেই, আর্টিস্ট হবারও দরকার নেই।

আমরা নির্বাক বিস্ময়ে এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। আসা সার্থক মনে হল। আমরা চার জনেই সেখানে প্রায় শুয়ে পড়লাম। বিস্মৃত অতীত আমাদের মনে এক মোহ বিস্তার করল। অর্ধশায়িত অবস্থায় চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম সেই লিখন গুলো। সেগুলো নানা আকারের। এক একটি চার পাঁচ ইঞ্চি থেকে এক ফুট। গভীরতায় আধ ইঞ্চি বা বেশি।

আধঘণ্টা আন্দাজ বিশ্রাম ক'রে তার ছবি নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার সম্মুখে পাঁচ ছ হাত দূরেই সমতল ভূমি শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং যতটা দূরত্ব থেকে সবটা ছবি একবারে নেওয়া যায় ততটা দূরে যাওয়া গেল না। অগত্যা তার এক একটা অংশের পৃথক ছবি নিলাম। যে অংশের ছবি আদৌ নেওয়া গেল না, সে অংশ কাগজে এঁকে নিলাম ('অভিযাত্রিক' ব'তে এই আঁকা ছবিটি মাত্র ছাপা আছে)।

বিশেষজ্ঞেরা এই লিপির পাঠ উদ্ধার করতে পারেন নি, অন্তত তখন পর্যন্ত পারেন নি। পরে পেরেছেন কি না জানি না। অক্ষরগুলো মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার, কি Ideogram, বা Hieroglyph তাও জানা যায় নি। কারও মতে এ গুলো খৃষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগের। যাই হোক এর বয়স নির্ধারণের গৌরব আমাদের নেই, আবিষ্কারের গৌরবও নেই, আমরা এসেছি শুধু দেখার আনন্দ পেতে এবং পথের রোমান্স উপভোগ করতে। কিন্তু তবু একটি বিষয়ে আমাদের গর্ব হল এই যে বাংলা দেশ থেকে খুব সম্ভব আমরাই অতীতকালের এই একটি অবিকৃত গুহাগৃহ এবং তার সৌন্দর্যময় আবেষ্টনটি প্রথম দেখতে এসেছি।'

অতীত জীবন্ত হয়ে উঠল আমাদের কাছে। সেই গুহাবাসী অরণ্যচারী যেন আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কি সভ্যতার পথে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে? চাষ করতে জানে? বস্ত্রবয়ন করতে জানে? ধাতুর ব্যবহার নিশ্চয় শিখেছে, নইলে কঠিন পাথরের গায়ে এই খোদাই কাজ অন্য কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। তাদেরই কল্পনায় মন ভরে রইল। বিস্মিত হলাম কেন এমন হল। এই সামান্য কতকগুলো খোদিত অক্ষরের কাছাকাছি এসে তাদের এমন জীবন্ত স্পর্শ পাচ্ছি কি ক'রে। এ রকম কোনো শিলালিপি শহরের মিউজীয়ামে দেখলে ঠিক এ রকম কল্পনায় মাতা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আমরা প্রতিদিন যে মাটির বুকে চলাফেরা করি সেই মাটির বুকেই তো একদিন প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেইখানেই বিবর্তনের ধারাপথে আজকের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই মাটিতে আমাদের পূর্ব পুরুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছে,

কিন্তু তবু প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সে কথাটা এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না।

এখানে এসে অতীতকে যেন প্রত্যক্ষ দেখলাম। তার কারণ আমরা এই স্থানটিতে আসবার আগে কল্পনায় একে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে আমাদের পরিচিত প্রতিদিনের জগৎ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তারপর এখানে যেতে যেতে বর্তমান যুগকে ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চলেছি। শহর থেকে পল্লীতে, পল্লীর লোকালয় থেকে অরণ্যে, প্রবেশ করেছি। তারপর পায়ে হেঁটে সম্পূর্ণ নতুন পরিমণ্ডলে মানুষের আশ্রয় থেকে দূরে, হিংস্র পশুর রাজত্বের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গে অস্ত্রধারী প্রহরী নিয়ে চলেছি। মনে হয়েছে যেন চলতে চলতে বহু যুগ পার হয়ে এলাম, বহু জগৎ পার হয়ে এলাম। আজ একথা কল্পনা করতে হঠাৎ মনে পড়ছে একটি গানের ছত্র—"মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ, আসিতে তোমার দ্বারে"—আজকের শোনা গানের এই কথা গুলোর মধ্যে সেদিনের অনুভব করা ভাষাহীন আনন্দ যেন ভাষা পেল।

পাহাড়ের বুকে সে দিনের যে কথাগুলো লেখা আছে তার কোনটাই তো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এক একটি চিহ্ন হরিণ কিংবা ঐ জাতীয় কোনো প্রাণীর চেহারা পেয়েছে, দু একটা নৌকোর মতো, দুএকটা ত্রিশূলের মতো, কতকগুলো ইংরেজী "ভী", কতকগুলো "ও", কতকগুলো "ওয়াই"—এই রকম সব অক্ষর।

তারা চিরকালের বুকে তাদের কথা রেখে গেছে কিন্তু আমরা তা শুনেতে পাচ্ছি না। তারা মুখে যে কথা বলেছে তা প্রতিদিনের সাধারণ কথা, কিন্তু পাহাড়ের বুকে যে কথা চিহ্নিত করেছে সে কথাগুলো তারা চিরকাল ধ'রে লোককে শোনাতে চেয়েছিল। কোন্ সে নীতি কথা? কোন্ সে অভিজ্ঞতার কথা; কোন্ সে দেবতা-তুষ্ট করবার কথা? ব্যর্থ হল তাদের চেষ্টা। এ যুগের মানুষ সে কথা শুনতে পেল না। এ যেন তাদের তৈরি একখানা প্রকাণ্ড গ্রামোফোন রেকর্ড, কিন্তু ঘোরাবার যন্ত্র নেই, সাউণ্ড বক্স নেই, নীড্‌ল্ নেই। এত কাছে এলাম, তাদের মুখের কাছে কান পাতলাম, কথা তারা বলল,

কিন্তু কোনো অর্থই পেলাম না। একটুখানি বাধা পার হওয়া গেল না। ঐ বাধাটুকু পার হতে পারলে তাদের কত কথা জানা যেত। নিষ্ঠুর কঠিন পাথর! কাছে এলো, কিন্তু ধরা দিল না। কিন্তু সকল কালেই তো মানুষের এই একই ইতিহাস। যে কথাটি শোনবার জন্য মানুষ মাথা খুঁড়ে মরে সেই কথাটি তাকে কেউ বলে না। মানুষ কৃপণ। পাথর কৃপণ। কিছুই দেয় না, কিন্তু তবু তো সান্ত্বনা চাই। একটুখানি ইঙ্গিত, একটুখানি ইসারা, যা পাওয়া গেল তাকেই কেন্দ্র ক'রে কল্প জগৎ রচনার কাজ চলতে থাকে।

সুতরাং এ সব কথা থাক। আমরা ওখানে বসে যে স্বাস্থ্য লাভ করলাম, এবং পরে ফিরে এসে কাহিনী রচনা করলাম, তারও অনেক মূল্য। সেখানে যাতায়াত পথে যে মাটি, যে আকাশ, যে মানুষের স্পর্শ পেয়েছি, যে অরণ্য পথে পায়ের চিহ্ন ফেলে এসেছি, তারই স্মৃতিতে ভরে রইল সমস্ত অন্তর। সেই মুহূর্তে কারণহীন আনন্দে ক্ষণকালের জন্য মনের যে স্ফীতি হয়েছিল, জীবনের দিগন্ত রেখার পরিধির যে বিস্তার ঘটেছিল, আজ বুঝতে পারি তা মাত্র সেই ক্ষণকালের জন্যই নয়। সে শুধুই স্মৃতিমাত্র নয়, সে শুধুই ক্ষণিকের মায়া নয়, তা আমার সমস্ত সত্তাকে চির জীবনের জন্য আর এক ধাপ উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছে। এ জীবন পাওয়া-না-পাওয়ায় মিলিয়ে সুন্দর। সমস্তই পাওয়া হলে এর মূল্য কমে যেত।

এরপর একটুখানি 'এপিলোগ' আছে।

আমরা দু ঘণ্টা পরেই গ্রিণ্ডোলা গ্রামে ফিরে এলাম। আমাদের মাপা সময়, না এসে উপায় ছিল না।

ফিরলাম ঠিক চারটের সময়।

পথে প্রমোদবাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়। তিনি গোপনে আমাকে জানান তিনিও ভাত খেতে পারলে খুশি হবেন, কিন্তু বিভূতি বাবুর ভয়ে সে কথা প্রকাশ করতে পারছেন না। আমি বললাম আমার বরাদ্দ দুজনে ভাগ ক'রে খাওয়া যাবে। ভাত এবং পুরীর মিশ্রণ দুজনেই বেশ পছন্দ করলাম। পরামর্শ

হল, আমি খেতে বসে আমার ভাত থেকে কিছু অংশ প্রমোদবাবুর পাতে তুলে দেব। প্রমোদবাবু কিছু আপত্তি করবেন, কিন্তু আমি তা শুনব না ; বলব, আমাকে একা ভাত খাইয়ে আপনারা আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন—আমি তা সহ্য করতে পারছি না। প্রমোদবাবু ভাত খেতে পাবেন কল্পনায় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠলেন।

আমরা গ্রিণ্ডোলায় ফিরে স্নান ক'রে খেতে বসলাম। এমন সময় বিভূতি বাবুর হঠাৎ মত পরিবর্তন হল। তিনি বললেন, "আমি ভাত খাব।"

প্রমোদবাবু এবং আমি চমকিত হয়ে দুজনে দুজনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। সে দৃষ্টিতে কি বেদনা! আমার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছি না, তবে মনে হল আমার দৃষ্টিরই প্রতিবিম্ব দেখছি আমি প্রমোদ বাবুর চোখে।

কিরণকুমারের খাওয়া বিষয়ে কোনো বাছবিচার নেই। যখন যা জোটে নির্বিচারে খেয়ে চলে, এমন কি কিছু না খেলেও তার উৎসাহের কোনো কমতি ঘটেনা।

আমরা খেতে শুরু করলাম। প্রমোদ বাবু বিভূতি বাবুর ভাতের থালার দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে পুরী চিবোতে লাগলেন। ভাত প্রায় দুজনের মতো হয়েছিল, কিন্তু সে কথা আর বলে লাভ নেই। বহু পিঁপড়ের ভিড় হয়েছিল আমাদের থালা গুলোর চারিদিকে। তাদেরও ভাতের প্রতি লোভ ছিল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু সেদিন অন্তত তাদের পুরীর টুকরো ছাড়া আর কিছু বহন করতে হয় নি।

খাওয়া শেষ হতেই দেখি সেই নাচওয়ালারা এসে হাজির। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম তাদের কথা, কিন্তু তারা আমাদের ভোলেনি।

আমরা সবাই বারান্দায় বসেছি। তারা বিনা বাক্যব্যয়ে নাচ ও বাজনা শুরু করে দিল। চারটি মেয়ে কোমরে হাত রেখে মিনিট দশেক নাচল। সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যের মৃদু আলো এসে পড়েছে তাদের মুখে। সে অবস্থায় একটি

স্ন্যাপ না নিয়ে পারলাম না। ক্যামেরা দেখে গ্রামের সবাই আমাদের উপর আরও যেন বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল। ছোট ছেলে মেয়েরাও স্তম্ভিত হয়ে গেল আমাদের চালচলন দেখে।

নাচ সম্প্রদায়কে বিদায় করতে বিশেষ কষ্ট হল না। আমাদের নেতা বিভূতি বাবুই তাদের পয়সা দিলেন কিছু। এইবার আমাদের বিস্মিত হবার পালা। তারা মাত্র তিন আনা পয়সা পেয়েই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওদের কত দিতে হবে তা অবশ্য ঠিক করে দিয়েছিল আমাদের স্থানীয় নেতা গাঁউটিয়া। কিন্তু এই সামান্য পয়সা পেয়ে তারা এত খুশি দেখে আমার তো নিজেদের অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল। মনে হল যেন এত আশা নিয়ে এলো, কিন্তু ঠকে গেল আমাদের হাতে। বিভূতি বাবুকে সে বিষয়ে সচেতন ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি বললেন, "দেখছেন না ওরা কেমন খুশি হয়েছে? তা ছাড়া কত দিতে হবে তা এরাই বলে দিয়েছে, ওর চেয়ে বেশি দিলে গাঁউটিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হবে। মনে রাখবেন, এখনও অনেককে দিতে হবে। হঠাৎ রেট বাড়াবেন না, মুশকিলে পড়বেন।"

এমন সময় বিম্বাধর নামক স্থানীয় এক মহাশয় ব্যক্তি বিভূতি বাবুর কাছে এসে এক আর্জি পেশ করল। তাকে ডাকাত সন্দেহ ক'রে সরকার বাহাদুর তার বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেছেন, বিভূতি বাবুকে সেটা উদ্ধার ক'রে দিতে হবে। বিভূতি বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন ভাববার কথা। বিম্বাধর নাছোড়, অগত্যা বিভূতি বাবুকে স্বীকার করতে হল যে তিনি চেষ্টা করবেন।

আমাদের যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। বেশি দেরি করলে রাত হয়ে যাবে, পথে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তখনই যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল, সম্মুখে ছ মাইল পথ, ছটা বেজেছে, কাজেই পথে রাত হবেই। আমরা সেই কথাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ দেখি বিভূতি বাবু নেই! আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি, ভাবছি আশেপাশে কোথাও আছেন। আমাদের সঙ্গে আমার ইচ্ছামতো যে গোরুর গাড়িখানা এসেছিল, শেষে দেখা গেল তারই ভিতর থেকে বিভূতি বাবু মাথা

বের ক'রে বলছেন—"আপনারা তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যান, আমিও আপনাদের প্রায় সঙ্গেই থাকব, কোনো ভয় নেই।"

আমাদের জন্য আমাদের কোনো ভয় ছিল না, ভয় সত্যিই হল বিভূতি বাবুর জন্য। অসুখ করল নাকি হঠাৎ? জানা গেল, না, অসুখ করেনি—তিনি একা গাড়িতে যেতে যেতে বিশ্বপ্রকৃতিকে একটু ধ্যান করতে পারবেন, সেই জন্যই আমাদের সংশ্রব ত্যাগ ক'রে তাড়াতাড়ি গাড়িখানা দখল করছেন। এতে আমরা যে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম সে কথা বলা বাহুল্য। প্রশ্ন করলাম, "ভয় করবে না তো একা যেতে?" তিনি বললেন, "নিতান্ত একা নয়, গাঁউটিয়া তাঁর সঙ্গে আছে, বেচারীর জ্বর হয়েছে, তাই সেও এই গাড়িতেই আছে।"

—"আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে তো?"

—"স্বাস্থ্য ভাল আছে, মনও বেশ প্রফুল্ল আছে।"

—"তবে হেঁটে না গিয়ে গাড়িতে যাচ্ছেন কেন? গাড়িতে যাওয়া তো আপনারই আপত্তি ছিল।"

—"এখনও আপত্তি আছে। হেঁটে না গেলে সত্যকার ভ্রমণ হয় না।"

—"তবে?"

—"সে আপনারা বুঝবেন না। আসবার সময় পা দুখানা দিয়ে এখানকার মাটির স্পর্শ এমন গভীর ভাবে টেনে নিয়েছি যে আপনারা যাতায়াতের দ্বিগুণ হাঁটাতেও ততখানি পারবেন না। আমার পক্ষে সে জন্য এখন আর হাঁটবার প্রয়োজন নেই। এখন আমি সমস্ত মন দিয়ে প্রকৃতির রস টানতে থাকব।"

বিভূতি বাবুকে ছেড়ে দিলাম। গাড়ি প্রত্যেকের জন্য একখানা ক'রে থাকলেও আমরা গাড়িতে যেতে পারতাম না। সে পথে দল বেঁধে হাঁটায় যে আনন্দ, গাড়ির খাঁচার মধ্যে বসে সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রিণ্ডোলায় দীর্ঘ বিশ্রামের পর আমাদের সবারই পায়ে এবং মনে নতুন উৎসাহ জেগে উঠেছিল।

সন্ধ্যায় একটুখানি চাঁদ উঠেছিল, কিন্তু সে "তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী, ধীরে পড়ি গেল খসি, কুটীরের বামে।"—তার পর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সেই নির্জন অরণ্যপথে আমরা সে দিন পায়ে হেঁটে সত্যিই আনন্দ পেয়েছিলাম।

গ্রিগোলা থেকে রওনা হবার সময় রাত্রে যে আবার খাওয়া দরকার হতে পারে এ কথা পুরীভুক আমাদের মনে হয়েছিল, কিন্তু বিভূতি বাবু বলেছিলেন ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি ধরতে হবে, ওসব হাঙ্গামায় আর দরকার নেই। কিন্তু স্টেশনে এসে যখন জানা গেল গাড়ি আসতে অনেক দেরি তখন বিভূতি বাবু ক্ষিধেয় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন, এবং আগের দিনের মতোই সমস্ত কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে হল।

তারপর বাংলোয় ফিরে এসে বাহক ইত্যাদিকে পারিশ্রমিক দেওয়া প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বার একটি ধাক্কা খেলাম। বাহককে সমস্ত দিন মোট বহন করার জন্য দেওয়া হল চার আনা। গোরুর গাড়িকে দেওয়া হল ছ আনা। আরও একটি বিষয় জানতাম না, এইখানেই শুনলাম আমাদের রক্ষীদের প্রত্যেককে চার পয়সা ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই পাওনা নাকি তাদের একেবারে আশাতীত !

রাত্রি এগারোটার পর আমরা স্টেশনে এলাম। কিন্তু গাড়ি পেলাম আমরা শেষ রাত্রে, আড়াইটার সময়। বিভূতি বাবু বললেন, এ এক রকম মন্দ হল না, কেননা পাহাড়ের গায়ে সূর্যোদয় দেখবার লোভ তিনি আর সামলাতে পারবেন না, সে জন্য না ঘুমিয়ে জেগে থাকবেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা যে যার মতো শুয়ে পড়লাম। কলকাতা-মুখী হতেই আমাদের মন থেকে বেলপাহাড়, গ্রিগোলা, বিক্রমখোল সমস্তই অন্তর্হিত হল। গাঁউটিয়া, বিম্বাধর, সমস্তই গেল। বিম্বাধরের বন্দুক উদ্ধার ইহজীবনে আর হবার সম্ভাবনা রইল না।

বিভূতি বাবুর ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। কিন্তু তখনও তাঁর আশা রইল সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখবেন।

তিনটি রাত্রি এমনি ভাবে আমাদের পথেই কেটে গেল। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে মনে হল যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম ! (১৯৪৫)

দার্জিলিঙের পথে

দীর্ঘ ছ বছর পরে আবার পথের ডাক ধ্বনিত হল অন্তরে। ১৯৩৯ সনের নবমী পুজোর দিন আমরা চার বন্ধু মিলে দার্জিলিং যাই, অতুলানন্দ, কিরণকুমার, সুধাংশুপ্রকাশ ও আমি।

পুজোর ছুটি উপলক্ষে মাত্র তিনচার দিনের জন্য এই ভ্রমণ কল্পনা প্রথমে সুধাংশুকে বাদ দিয়েই করা হয়েছিল, কেননা সে সময় সে তার কোনো আত্মীয় বিয়োগে মুখে দাড়ি গজিয়েছিল এবং পায়ে জুতো ছিল না।

বঙ্গশ্রীর সম্পাদক কিরণকুমার, সহকারী সম্পাদক সুধাংশুপ্রকাশ, যেতে হলে দুজনেরই যাওয়া শোভন, এবং যদিও দার্জিলিঙে দাড়ি অশোভন নয়, বরঞ্চ শীতনিবারক হিসেবে প্রয়োজনীয়, কিন্তু খালি পা একেবারে অচল। সে জন্য ভ্রমণসঙ্গী যে সুধাংশু সে সময় হতে পারে না, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল।

অতুলানন্দকে নিয়েও কিছু অসুবিধা ছিল। প্রায় শেষ মুহূর্তে সে বলল, "বলেছিলাম বটে যাব, কারণ তোমাদের প্রস্তাবে কোনো গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু তোমরা জান বিনা উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত কোথায়ও যাইনি, ভবিষ্যতেও যাব না।"

বলা বাহুল্য কথাটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। অবশ্য কিরণেরও কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, ভয় হল সেও বেঁকে না দাঁড়ায়। তবু বললাম কিরণ তো বিনা উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

অতুলানন্দ বলল "কিরণের জীবনেরই কোনো উদ্দেশ্য নেই।"

মাসিকপত্র সম্পাদকের জীবনের প্রতিই সম্ভবত এই কটাক্ষ। কথাটা তর্কমূলক. তাই আর কোনো জবাব না দিয়ে কিরণের দিকে চাইলাম।

কিরণ অতুলানন্দকে বলল "তোমাকে যেতেই হবে, নইলে আমাদের যাওয়া বন্ধ। তা ছাড়া দার্জিলিং আমার মতো তুমিও দেখনি।"

"দার্জিলিং দেখিনি, কিন্তু হিমালয় দেখেছি এবং সিমলায় বাস করেছি, আমাকে আর টেনো না।"

বড়ই দমে গেলাম। কল্পনা ইতিমধ্যে হিমালয় প্রমাণ উঁচুতে উঠেছিল। আমাদের বিমর্ষ ভাব দেখে অতুলানন্দ বলল, "আসল কথা হচ্ছে এই যে আমার অন্তরবাসী ইচ্ছা তোমাদের সঙ্গে যাই, কিন্তু সে এখন ষোল আনাই নির্ভর করছে আমার অন্দরবাসিনীর ইচ্ছার উপর। তবে শোন, বলি। আমি প্রায় প্রতি মাসে দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ বা অন্য কোথায়ও অন্তত একবার ক'রে স্ত্রীবর্জিত ভ্রমণ করছি, কারণ সে সবই বৈষয়িক কাজে ভ্রমণ। কতবার তাঁকে বলেছি বিনা কাজে যদি কোথায়ও যাবার সুযোগ পাই তবে তাঁকে নিয়ে যাব।"

আমি বললাম "তা হলে ভয় নেই, তুমি অন্দরে যাও, কথার মারপ্যাঁচ ঘটিয়ে দিনকে রাত বানাও, এটাকেও উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণের তালিকায় স্থান ক'রে দাও, প্রকৃত আর্টিস্টের কাজ কর, হিন্দু মুসলিম ইউনিটি নিয়ে এত বই লিখলে, এবারে সত্য মিথ্যার ইউনিটি ঘটাও।"

এ আবেদনে কাজ হল, অতুলানন্দ অন্দরে প্রবেশ করল, এবং মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে এসে বলল, "চল।"

আমরা বেরিয়ে এসে অভিযানের উপযুক্ত জিনিসপত্র কিনতে দোকানে ঢুকব এমন সময় চলতি বাস্-এ দেখি সুধাংশু চলেছে কোথায়। আমাদের দেখেই নেমে পড়ল, তাকে বললাম "আজই সন্ধ্যায় আমরা দার্জিলিং চলেছি।"

সুধাংশু একটুখানি চিন্তা ক'রে বলল, "বেশ, তা হলে স্টেশনেই দেখা হবে।" কাছেই জুতোর দোকান ছিল, সেখানে ঢুকে সে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো কিনে নিল।

সবগুলো যোগাযোগই ঘটল অপ্রত্যাশিতরূপে। একেই ভদ্রভাষায় বলে অ্যাক্সিডেন্ট। আনন্দও তাই, ওটাও নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার।

আমরা পূজোর ভিড় এড়াবার জন্যই নবমীর দিনটি যাত্রার দিন ঠিক করেছিলাম। এবং ভালই করেছিলাম।

তখনও রেলওয়ে থেকে 'ভ্রমণ কমাও' আন্দোলন শুরু হয়নি, যুদ্ধের বয়স

তখন মাস দেড়েক মাত্র, যুদ্ধের পরিণতি কি ঘটবে তা তখন কল্পনারও অগোচর ছিল, যুদ্ধ তখনও 'ফোনি' যুদ্ধ, অর্থাৎ মিত্র সৈন্য আর জার্মান সৈন্যরা তখন প্রতিদিন মাজিনো আর জিগফ্রিড লাইন পার হয়ে একত্র দাবা খেলছে আর মাঝে মাঝে দু একটা ফাঁকা আওয়াজ করছে। সুতরাং আমাদের কাছে সময়টা তখন ছিল প্রায় যুদ্ধপূর্ব সময়েরই মতো। আমাদের আনন্দে তখনও আতঙ্ক মেশবার সময় আসে নি, আমাদের সবারই আনন্দ তখন অতুলানন্দ।

হিমালয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ বাল্যকাল থেকে। ১৯১৩ সনের মে মাসের ৮ কিংবা ৯ তারিখে, প্রায় পনেরো বছর বয়সে, আমি দার্জিলিঙে প্রথম যাই। তার আগে কখনো পাহাড়ই দেখিনি। সে সময় শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে প্রথম তুষার-মণ্ডিত হিমালয় দেখে আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। এ রকম যে হতে পারে তা কি ক'রে জানব। চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। একটা গল্প পড়েছিলাম এক ইংরেজ মেয়ে জীবনে প্রথম জিরাফ দেখে অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজে নিজেই বলে উঠেছিল— It's simply impossible--I can't believe it. আমার অবস্থাও তাই হয়েছিল।

সেই প্রথম দার্জিলিং যাওয়া এবং সেখানে দিন সাতেক বাস ক'রে ফিরে আসা আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। সবটাই স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে। সমতল ভূমির আশৈশব পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আচম্বিতে এমন অভিনব দেশে এসে পৌছানো যে আদৌ সম্ভব এ ঘটনা রূপকথার জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত বালক-মনে এক অকল্পিতপূর্ব প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছিল। এই হিমালয়! এই কাঞ্চনজঙ্ঘা! যার রিলীফ ম্যাপ আর তার ফোটোগ্রাফ দেখে কি উদ্দাম কল্পনা জাগত মনে। সেই স্বপ্নই এমন বাস্তব হয়ে দেখা দিল আমার জীবনে! যে দিকে তাকাই সব নতুন, সব অভিনব। কি ঘোর লাগল চোখে, মনে। একটা মাদকতাপূর্ণ অনুভূতি। কুয়াসায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার সব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে, এ কি স্বপ্ন না

সত্য ? সাত দিন ধ'রে অর্ধচেতন অবস্থায় উন্মনা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে। কখনো বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি, পাথর স্পর্শ ক'রে ক'রে সমস্ত স্নায়ুতে তার শিহরণ অনুভব করেছি। সমস্ত দিন প্রায় না খেয়ে পথে কাটিয়েছি, দেখে দেখে চোখে ক্লান্তি আসে নি।

এটি খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। হামাগুড়ি দেবার পর বছর-পনেরো ধ'রে পৃথিবীটার সামান্য একটুখানি অংশই তখনও ভাল ক'রে চিনতে পারিনি, এরই মধ্যে কিনা একেবারে মেঘের দেশে এসে পড়া !

হিমালয় সম্পর্কে সেই যে স্বপ্নের ঘোর লেগেছিল চোখে, তা আজও কাটেনি। তারপর ১৯১৯ সনে আরও একবার গিয়েছি, ঘুম নামক জায়গায় ছিলাম সেবারে। দেখলাম সেই বাল্য জীবনের দৃষ্টি তখনও লেগে আছে। কি দুর্বার আকর্ষণ হিমালয়ের প্রতি। এ রোমান্স ভাল নয়, তাই সেই মোহ ছিন্ন করার প্রবৃত্তি হয়েছিল এবারে। আগে দুবারেই কোনো দর্শনীয় জিনিস দেখিনি, শুধু পথের আর পাথরের মায়ায় পথে পথে ঘুরেছি।

তাই এই তৃতীয় বারের পরীক্ষা। কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে এই বোঝাপড়া আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত।

শিয়ালদ থেকেই আমরা শোবার জায়গা পেয়েছিলাম গাড়ির মধ্যে—এবং তৃতীয় শ্রেণীতে। ঘুমও হয়েছিল ভালই, ঘুম ভাঙল জলপাইগুড়ি স্টেশনে। এইখান থেকে বরফে ঢাকা হিমালয়ের চূড়াগুলো চোখে পড়ে। জানা না থাকলে নতুন চোখে তাকে হঠাৎ মেঘ বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। সমতল দেশে বাস ক'রে হিমালয়ের মতো একটা অপ্রত্যাশিত বিরাটত্ব তার সমস্ত আকাশ ছোঁয়া বাস্তবতা নিয়ে মনের মধ্যে সহজে ধরা দিতে চায় না। মন কেবলই প্রশ্ন করে এ কি দেখছি।

সঙ্গীরা চুপ ক'রে সেই দিকে চেয়ে রইল, আমরা প্রায় নীরব ভাবেই শিলিগুড়ি পর্যন্ত গেলাম। দার্জিলিং (হিমালয়ান) মেল প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আমরা পরবর্তী ট্রেনে যাব ঠিক ছিল, কারণ মেলের ভাড়া বেশি। পরের

গাড়িতে শস্তা। আমাদের তিনদিনের যাবতীয় ভ্রমণ শেষে কলকাতা ফিরে হিসেব ক'রে দেখেছিলাম ঊনিশ টাকার বেশি কারোই খরচ হয় নি।

হাতে এক ঘণ্টা সময় ছিল, শিলিগুড়ি বাজারের দিকটা ঘুরে এলাম। ১৯১৩ সনে দামুকদিয়া ঘাট পার হয়ে সান্তাহারে গাড়ি বদল ক'রে যে বারে দার্জিলিং যাই সে বারের শিলিগুড়ির অভিজ্ঞতা কিছু বলা আবশ্যক।

আমরা সমবয়সী দুই বালক স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটিতে পাবনা জেলার এক গ্রাম থেকে নিজ নিজ বাড়িতে ফেরবার মুখে পথে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে খেয়াল হল দার্জিলিং গেলে কেমন হয়।

এইটুকুই এর ভূমিকা। যে-কোনো বিষয়েই হোক, এ বয়সে এর চেয়ে বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব। অতএব সমস্ত রাত ও দিন ট্রেনে কাটিয়ে রাত নটা আন্দাজ সময় আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছলাম। শুধু আকস্মিক একটি খেয়াল। সম্পূর্ণ অজানা পথ এবং অজানা ভবিষ্যৎ।

আমার সঙ্গে একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ছিল, বন্ধুর খালি হাত। স্টেশনে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল দার্জিলিঙের গাড়ি সকালে ছাড়ে।

তখন মনে সামান্য একটু প্রশ্ন জাগল, অতঃপর কি করা যায়। প্ল্যাটফর্মই সে রাতে আশ্রয় এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করা যায় বলুন তো?" তিনি বললেন "ঐ তো দার্জিলিং মেল পাশে রয়েছে, ওর মধ্যে শুয়ে রাত কাটাতে পার।"

কথাটা বড়ই ভাল লাগল। কিন্তু আসল সমস্যা হল কি খাওয়া যায় রাত্রে। জানা গেল সেখানে কোনো হোটেল নেই, তবে একটি মাত্র খাবারের দোকান আছে।

যথেষ্ট। সমস্ত দিন ট্রেনে বিশেষ কিছুই খাওয়া হয় নি। আমরা তখনি রওনা হচ্ছি এমন সময় সেই ভদ্রলোক বললেন "দোকান বেশি দূরে নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুরে আসতে পারবে, ব্যাগের বোঝা বয়ে দরকার কি।"

"ব্যাগ কোথায় রাখব?"

"কেন, এই প্ল্যাটফর্মের এক ধারে রেখে যাও, কোনো ভয় নেই।"

বয়স তখন কম, কোনো ভদ্রলোকের কথা যে অবিশ্বাস করা যেতে পারে এমন কল্পনাও মনে স্থান পায় না। তাই ব্যাগটি প্ল্যাটফর্মে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খাবারের দোকানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

খানদুই করুগেটেড টিনের ছাউনি বিছিয়ে খাবারের দোকানের ছাত তৈরি, বাকী অংশটা বাঁশের এবং চাটাইয়ের। যতদূর সম্ভব নোংরা, এবং যা খাবার কিনলাম তা অন্তত মাসখানেক আগের তৈরি, বাসি এবং পচা। আদৌ খাওয়া গেল না। একমাত্র উপায় ছিল দোকানীর মুণ্ড ছিঁড়ে খাওয়া। কিন্তু ঘোর বিদেশে তা সম্ভব হল না।

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে এলাম যথাস্থানে। এসে দেখি ব্যাগটি যেখানে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেখানেই পড়ে আছে। কেউ তা স্পর্শ করেনি। স্পর্শ করবে বলেও মনে কারো কোনো সন্দেহ জাগে নি।

পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, এবং ভেবে অবাক হয়েছি। শিলিগুড়িকে এজন্য প্রশংসা করছি না, কেননা শিলিগুড়ি ১৯১৩ সনে যে কত অবনত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে। সে সময় শূন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ চুরি করবার মতো লোকও সেখানে ছিল না। চোর তো ছিলই না, এমন সুযোগ পেলে সাময়িকভাবে চোর হয়ে উঠবে এমন সাধুও সেখানে কেউ ছিল না। উপরন্তু ঐ খাবারের দোকান শিলিগুড়ির তৎকালীন অবনতির সাক্ষ্য দেবে। দোকানী একদিন যে সব খাবার তৈরি ক'রে রেখেছে তা মাসখানেকের মধ্যে কেনার লোক জোটে নি।

কিন্তু ১৯৩৯-এর শিলিগুড়ি দেখি লোকে ঠাসা। এখন প্ল্যাটফর্মে অরক্ষিত অবস্থায় একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ ফেলে যেতে বোধ হয় এক বছরের শিশুও রাজি হবে না। এবারে যখন আমরা ছোট্ট ট্রেনে উঠে এগিয়ে চলেছি তখন মনে হল যেন এ এক সম্পূর্ণ পৃথক শহর, এত লোকের ভিড়, এত বিস্তৃত বাজার।

আমাদের গাড়িখানার মধ্যে বহু জাতীয় লোকের ভিড়, আমাদের কামরায় আমরাই মাত্র চারজন বাঙালী, বাকী সবাই পাহাড়ী।

গাড়িগুলো খুবই ছোট, কত ছোট তা না দেখলে কল্পনা করাই শক্ত।

হঠাৎ দেখলে খেলার গাড়ি মনে হয়, যেন 'মেকানো' সেট। দুখানা রেল মাত্র ২৪ ইঞ্চি ব্যবধানে পাতা। দার্জিলিং যাবার পথে এই রেলগাড়ি ও রেলপথও কম আকর্ষণীয় নয়। হিমালয়ের সঙ্গে এর স্মৃতিও আমার মনে বাল্যকাল থেকে গাঁথা। এ যেন হিমালয়েরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে জন্য মোটরে দার্জিলিং যাওয়া আমার কাছে রুচিকর বোধ হয় না।

ছোট্ট ইঞ্জিন ছোট্ট গাড়িগুলোকে পাহাড়ে টেনে তুলতে হাঁফিয়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় এর বেগ ঘণ্টায় দশ মাইলের বেশি নয়।

শিলিগুড়ি ছাড়িয়েই মহানদীর বেশ বড় সেতু। সেই সেতু পার হয়েও বহুদূর পর্যন্ত পথ সমতল। আমাদের ডান ধারে রইল বিস্তীর্ণ তীস্তা উপত্যকা। এইদিকে পৃথক একটি রেলপথ কালিমপঙ্ যাবার।

পরবর্তী স্টেশনের নাম শুকনা। শুকনার পরেই গাড়ি পাহাড়ে উঠতে শুরু করে। এই শুকনা স্টেশনটির প্রতি স্থানীয় বন্য জন্তুদের কিছু আকর্ষণ আছে। আমি যে সময় প্রথম গিয়েছিলাম দার্জিলিঙে, তার কাছাকাছি সময়ের অনেক ঘটনা পড়েছি। একবার এক বাঘ স্টেশনের বুকিং অফিসের কাছে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ছিল। সে দৃশ্য দেখে স্টেশনের সবাই প্রাণ ভয়ে ছুটে পালিয়ে যান এবং শেষে এক বন্দুকধারীর শরণাপন্ন হয়ে বাঘটিকে মারার ব্যবস্থা করেন। আর এক বার স্টেশনের কাছাকাছি এক কালভার্ট ব্রিজের নিচে থেকে ইঞ্জিনের শব্দ পেয়ে এক বাঘ বেরিয়ে এসে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। একবার একদল হাতী গাড়ির পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়ায়, সে এক বিষম অবস্থা। শেষে ট্রেনকেই পিছু হটে স্টেশনে ফিরে আসতে হয়েছিল। ট্রেন আক্রমণ করতেও ছুটে এসেছিল একবার একদল হাতী। ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে সশব্দ বাষ্প ছেড়ে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করেছিল। এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে শুকনা স্টেশনের কাছাকাছি।

শুকনার পর থেকে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত জঙ্গল এমন ঘন যে তাতে সব রকম জন্তুই বেশ নিশ্চিন্ত মনে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। এখানে ঘাসও খুব বড় বড় এবং তা অন্যান্য ঝোপের সঙ্গে মিলে একটা ভয়ঙ্কর রহস্য রাজ্য সৃষ্টি

হয়েছে। এর সঙ্গে বনস্পতির দল তো আছেই। সব মিলিয়ে রেলের দুপাশে নিবিড় অন্ধকার। রাত্রে এর মধ্য দিয়ে যখন ট্রেন ছুটতে থাকে তখন গা ছম ছম করে।

রেলপথের অভিনবত্বও এইখান থেকেই আরম্ভ। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কখনো একটু ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলাম, তার পরেই হয় তো একটা পাক ঘুরে একটা অরণ্য বেষ্টন ক'রে আবার ঢুকে পড়লাম সেই অন্ধকার রাজ্যেই। প্রতি পাকে ট্রেন অনেকখানি উপরে উঠে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ অন্ধ না হলে এ দৃশ্য দেখে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চকর অনুভূতি সবার মনেই জাগবে। কেননা এই অনুভূতি শুধু অরণ্যে নয়, শুধু উপরে ওঠায়-নয়, এর সবটাই নির্ভর করছে এইভাবে একটা খেলনা গাড়িতে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গির উপর। অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু থেকেও যেন এর স্টাইলের মধ্যেই এর রোমাঞ্চ সৃষ্টির ক্ষমতা বেশি লুকিয়ে আছে। কিংবা হয় তো দুটোই এমন ভাবে মিশে আছে যে অভিনবত্ব সৃষ্টিতে কার হাত বেশি তা বুঝতে পারছি না বলেই ও রকম মনে হচ্ছে।

শুকনা স্টেশন ছেড়ে পাহাড়ে উঠতে উঠতে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা 'লুপ' পাওয়া যায়। গাড়ি যেখানে সোজাসুজি ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠতে পারে না, অর্থাৎ সে রকম ওঠায় যেখানে বাধা আছে, সেখানে এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধিতে এই 'লুপ'-এর সৃষ্টি হয়েছে। রেল স্টেশনে ওভারব্রিজ সকলেরই দেখা আছে। রেলগাড়ি যদি তার নিচে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার সেই ওভারব্রিজের উপর এসে উঠত তা হলে রেলযাত্রীর চোখে তা যেমন লাগত, এই লুপের চক্র ঘুরে উপরে ওঠার সময়েও অনেকটা সেই রকম মনে হয়। পদে পদে এই ধরনের সব নতুনত্ব দার্জিলিঙের পথটিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছে।

আমরা যে গাড়িতে ছিলাম সে গাড়িতে যাত্রীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু তবু তাকে ভিড় বলা যায় না। যে সব পুরুষ এবং মেয়ে ছিল তাদের গায়ের রং বাঙালীদের মতোই, মাত্র এক জনের ছাড়া। একটা ধারে

চার পাঁচ জন পুরুষ এবং মেয়ে, এক পরিবারভুক্তই বোধ হল, তাদেরই মধ্যে একটি মেয়ে অত্যন্ত ফর্সা চেহারা। মুখখানা নিটোল, আদর্শ শ্বেতাঙ্গ সুন্দরীর মতো রং, মনে হচ্ছিল ঠিক যেন মোম দিয়ে তৈরি—সদ্য ছাঁচ থেকে তোলা, চোখ মুখ নাক তার উপর কেউ এঁকে দিয়েছে, কেননা তার দৃষ্টি ছিল স্থির, মুখে কোনো ভাবের প্রকাশ ছিল না।

আমরা যতই উপরে উঠছি, ততই আমাদের ভ্রমণ উপভোগের আশা মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসন্ন, কিন্তু ভরসা এই যে আমরা যে পরিমাণ উঁচুতে উঠে ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যকে মনে মনে বরণ করছি, দার্জিলিং শহরটি তা থেকে আরও তিনচার হাজার ফুট উঁচু, কাজেই এই মেঘের অন্ধকার পেরিয়ে আমরা আলোর দেশে পৌঁছে যাব এমন আশাও মনে জাগছে মাঝে মাঝে। তা ছাড়া যে মেঘের ভয়ে আমরা কাতর হচ্ছি, তা আমাদের দেশের বর্ষাকালের মতো বৈচিত্র্যহীন, দিগন্তবিলীন, সূর্যঢাকা একখানি পর্দামাত্র নয়; সে মেঘ সব সময়েই খণ্ড মেঘ, তা কখনও সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে, কখনও প্রকাশিত করছে।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। ট্রেনের দুপাশে পরিচিত ফুলের মধ্যে অতিকায় ধুতুরা আর গাঁদা ফুল খুবই বেশি দেখা গেল।

শুকনা স্টেশন ছেড়ে পাহাড়ে ওঠার পথে পনেরো মাইলের মধ্যেই দুটো লুপ। দ্বিতীয় লুপের আগের স্টেশনটির নাম রংটং। রংটংএর পর থেকে পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে বাঘের দৌরাত্ম্য খুব বেশি। দ্বিতীয় লুপের বাঁ ধারে বাঘ ধরা ফাঁদও পাতা আছে। বহু বাঘ এই ফাঁদে ধরা পড়ে।

সাড়ে পনেরো মাইলের জায়গায় তৃতীয় লুপ। এই লুপটির সাহায্যে ট্রেন একবারে অনেকখানি উঁচুতে উঠে যায়, সেজন্য ট্রেনকে দুবার চক্রাকারে ঘুরতে হয়। এই কারণে এর নাম 'ডাব্‌ল্ লুপ'। দু চক্র ঘোরা যখন শেষ হয় তখন ট্রেনখানা ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপরে উঠে পড়ে। পাহাড়ের মাথাটি কেটে অনেকখানি জায়গা সমতল করে ফেলা হয়েছে। এইখানে ছোট একটি স্টেশন আছে, নাম চুনা ভাঁটি।

নিচু থেকে উঁচুতে ওঠার জন্য সব জায়গাতেই লুপ নেই, অন্য রকম ব্যবস্থাও আছে। ইংরেজীতে একে বলা যায় 'জিগ্ জ্যাগ্' ভঙ্গি। ট্রেন আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল। কিছুদূর গিয়ে থামল। রেললাইনের পয়েণ্ট পরিবর্ত্তন করা হল। ট্রেন পিছিয়ে আসতে লাগল দ্বিতীয় লাইনে। এই পিছিয়ে আসার সময়েও ট্রেন অনেকখানি উপরে উঠে গেল। তারপর আবার পয়েণ্ট পরিবর্ত্তন ক'রে ট্রেন সম্মুখের দিকে বরাবর উঁচুতে উঠতে লাগল। সবটা মিলিয়ে ইংরেজী 'Z' অক্ষরের মতো।

ট্রেন যখন রংটং স্টেশন ছাড়ল, তার কয়েক মুহূর্ত আগে একটি বাঙালী যুবক এসে উঠল আমাদের কামরায়। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ হবে, গায়ে টুইলের শার্ট, হাতে বিছানার প্যাকেট। চোখ দুটি তার বড় বড়, কিন্তু চোখের চারদিকে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। সে এই স্টেশন থেকেই গাড়িতে ওঠেনি, শিলিগুড়ি থেকে আমাদের সঙ্গেই অন্য গাড়িতে চলছিল। মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বিনীত ভাবে সে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কি দার্জিলিং যাচ্ছেন?"

আমরা দার্জিলিঙেই যাচ্ছি শুনে সে যেন খুবই আশ্বস্ত হল। বলল, "আমিও যাচ্ছি, এর আগে কখনও যাইনি, আপনাদের সঙ্গেই কোথায়ও গিয়ে ওঠা যাবে।"

আমরা মনে মনে শঙ্কিত হলাম। হয়তো এর পরে এই অসহায় ব্যক্তিটিকে সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে, হয় তো লালন পালনের ভার গ্রহণ করতে হবে। তাই তার সঙ্গে আর বিশেষ আলাপ করলাম না। আমরা আমাদের ভ্রমণসঙ্গী রূপে এক অজ্ঞাতকুলশীলকে সহজে মেনে নিতে পারছিলাম না।

আমাদের উদাসীনভাব লক্ষ্য ক'রে সে পরবর্তী স্টেশনে নেমে তার আগের কামরায় চলে গেল। আমরাও আপাতত তার হাত থেকে বেঁচে খানিকটা আরাম বোধ করলাম।

কিন্তু পরে একে নিয়ে সামান্য কিছু অশান্তি ঘটেছিল।

পথের বৈচিত্র্যে কিরণকুমার এবং সুধাংশুপ্রকাশ অভিভূত হয়ে পড়েছে। তাদের মুখে আর কথা ছিল না। কথা বলতে গেলেই চারদিকের চমৎকার

দৃশ্যগুলো চোখের আড়ালে চলে যাবে, হয় তো কখনও অপ্রত্যাশিত কোনো বিস্ময় এইভাবে দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে পরে অনুশোচনা হবে, তার চেয়ে চুপচাপ বাইরে চেয়ে থাকাই ভাল। ওরা যে হিমালয়ের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছে এতে আমি খুব গর্ব বোধ করছিলাম, কেননা আমিই এদের ভজিয়ে হিমালয়ের পথে টেনে এনেছি। অতুলানন্দও খুব গর্বিতভাবে বসে ছিল; তার গর্বের কারণ হচ্ছে সে আমাদের অনুরোধে পড়ে ত্যাগ স্বীকার ক'রেও আমাদের সঙ্গ দান করেছে।

কিরণকুমারের চরিত্রে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। শহরবাসী এই ব্যক্তিটির চরিত্রের দুটি স্পষ্ট বিভাগ আছে। একটি অভিজাত; অন্যটি সহজাত। বিক্রমখোল যাবার পথে বিভূতি বাবু ট্রেনের মধ্যে কীর্তন গান গেয়েছিলেন এবং কিরণকুমার তার সঙ্গে নেচেছিল, আশা করি পাঠকের তা মনে আছে।

শহর ছাড়লেই যে ব্যক্তি ট্রেনের মধ্যে নাচতে পারে, সে এবারে পদযুগলকে সংযত ক'রে প্রাণ ভরে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। তার স্বভাবের দ্বিতীয় বিভাগটি হিমালয়ই খুলে দিয়েছে। হিমালয়ের বিরাট মহিমার কাছে নিজেকে সর্বদা অত্যন্ত ছোট মনে হয়, কিন্তু হাল্কা মনে হয় না।

সুধাংশুপ্রকাশের চরিত্রেও দুটি বিভিন্ন গুণ প্রকাশ পায়। স্বভাবতই সে গম্ভীর। একে আমরা 'রেফারেন্স বুক' হিসাবে কাজে লাগাই। কথা না বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন কথা বলতে শুরু করে তখন তাকে থামানো মুশকিল।

কিন্তু শুধু এদের দুজন কেন, সকল মানুষের চরিত্রেই একই সঙ্গে বহু রকম বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের স্বভাবে এই বৈচিত্র্য আছে বলেই মানুষ এত চিত্তাকর্ষক।

সুধাংশুপ্রকাশের গাম্ভীর্য হঠাৎ ভেঙে গেল কার্সিয়াং স্টেশনে এসে, এবং তারপর থেকে সে অতি মাত্রায় মুখর হয়ে উঠল। কেমন ক'রে তা ঘটল পরে বলা যাবে।

চুনা ভাঁটি থেকে ট্রেন ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলো তিনধরিয়া স্টেশনে। স্টেশনটি বেশ বড়—শহরটিও বেশ জনবহুল। এখানে বড় ওয়ার্কশপ আছে। ট্রেনও এখানে মিনিট পাঁচেক থামে। আমরা যে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে এসে পড়েছি তা এই স্টেশনে ভালভাবে অনুভব করা যায়। জায়গাটার উচ্চতা ২৭৪৮ ফুট, অর্থাৎ বাংলা দেশের সমতল ক্ষেত্র থেকে আধ মাইলেরও কিছু বেশি। শীতের গরম জামা আমরা এইখান থেকেই পরে নিলাম। বহু যাত্রী এইখানে নেমে গেল, এবং বহু নতুন যাত্রী উঠল। তবে মোটের উপর ভিড় এইখান থেকে বেশ কমে গেল।

যে সব নতুন যাত্রী উঠল তারা পূর্বের যাত্রীদের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির, সকলেরই যেন একটা বেপরোয়া ভাব। তিনধরিয়া স্টেশনের টিকিট কলেক্টর কিংবা আমাদের ট্রেনের গার্ড, ঠিক মনে পড়ছে না, এসে আমাদের বললেন, "আজ বিজয়া দশমী, পাহাড়ীরা সবাই আজ মাতাল হয়ে চলাফেরা করছে, আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন এবং যদি সম্ভব হয় সবাই আপনাদের সব জিনিষপত্র একত্র ক'রে গাড়ির একটা দিক দখল করে থাকুন, সে দিকে যাতে এরা উঠতে না পারে।"

আমরা তাঁর উপদেশ মতো সেই ভাবেই বসলাম।

ট্রেন এখান থেকে ছাড়বার পর কিছু দূর এগিয়ে দ্বিতীয় Z ভঙ্গীর আরোহণ এবং আরও কিছু পরে চতুর্থ লুপ। এই লুপটির ব্যাসার্ধ মাত্র ৫৮ ফুট। খুব অল্প জায়গার মধ্যে ট্রেনটি চক্রাকারে ঘুরে উপরে উঠে পড়ে। তারপর আরও একবার Z ভঙ্গীতে উঁচুতে উঠে পরবর্তী স্টেশন গয়াবাড়ি বা গৌবাড়িতে পৌঁছয়। এতক্ষণে আমরা মাত্র ২৬ মাইল এগিয়ে এসেছি এবং উপরের দিকে উঠেছি প্রায় এক মাইল। দার্জিলিং শহর এখান থেকে ২৭ মাইলের কিছু বেশি দূরে।

তিনধরিয়া স্টেশন থেকে যে সব উন্মত্ত যাত্রী আমাদের ট্রেন খানায় উঠল, তা ছাড়াও কিছু কিছু যাত্রী রাস্তার মাঝখানে যেখানে-সেখানে উঠছে নামছে দেখা গেল। গয়াবাড়ি স্টেশনেও খুব হল্লা শোনা গেল। এইখান থেকে কিছু

দূর এগিয়ে যেতেই চতুর্থ এবং শেষ Z ভঙ্গির আরোহণ। এর পর পাগলা ঝোরা নামক প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। বর্ষাকালে এর উন্মত্ত বেগ দেখবার মতো। এই পাগলা ঝোরা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রেলপথের এবং কার্ট রোডের ভীষণ ক্ষতি করেছিল, সে সময়ে রেল লাইনকে নাকি অন্য পথে ঘুরিয়ে নেবার কথাও হয়েছিল।

গাড়ি চলল এগিয়ে মহানদী স্টেশনের দিকে। যেতে যেতে এক হৈচৈ কাণ্ড ঘটে গেল। আমাদের পিছন দিককার গাড়িগুলো থেকে সবাই চিৎকার করছে। গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি গাড়ি থেকে সবাই নেমে ছুটে চলেছে দুর্ঘটনার জায়গার দিকে।

আমরাও নামলাম; একটু এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেলাম চলতি গাড়ি থেকে একজন পাহাড়ী মত্ত অবস্থায় নিচে পড়ে গেছে। সুখের বিষয় গাড়ির বেগ তখন খুব বেশি ছিল না, তাই সে পড়ে গিয়েও আহত হয় নি, তবে তার নেশা সম্পূর্ণ ছুটে গেছে। দুর্ঘটনার মধ্যে সম্ভবত এইটিই সর্বপ্রধান, এর চেয়ে একখানা হাত কিংবা পা ভাঙলেই সে বেশি সন্তুষ্ট হত।

আমাদের গাড়িতে দুজন পাহাড়ী মেয়ে বসে ছিল, ভদ্র চেহারা, তারা কিন্তু এই দুর্ঘটনায় আদৌ বিচলিত হয় নি। দিব্যি বেণী দুলিয়ে তারা বসে বসেই মজা দেখছিল। মনে হল এ রকম দৃশ্য তাদের কাছে নতুন নয়।

মহানদী স্টেশন থেকে কার্সিয়াং যাবার পথে এতক্ষণ বড় বড় পাহাড় আর অরণ্য যে আবরণ সৃষ্টি করেছিল সেই আবরণের এক দিকের পর্দাটা উঠে গেল। বাঁয়ের দিকে চেয়ে যেন চমকে উঠলাম। এতক্ষণ আমরা উপরে উঠেছি, কিন্তু কত উপরে উঠেছি তা টাইম টেবল্ ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে জানা সম্ভব ছিল না, কিন্তু এবারে আমাদের উচ্চতার পরিমাপ না হলেও উচ্চতার গৌরব স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম। বাংলার সমতলভূমি ব্যাপকভাবে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ উন্মুক্ত হল। যেন প্রকাণ্ড একখানা ম্যাপ নিচের দিকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাহাড় থেকে যত নদী বেরিয়েছে সেই সব নদী আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল, শুধু নীল রেখার মতো, ঠিক যেমন আমরা ম্যাপে আঁকা দেখি।

মনে হল যেন অগণিত নদী—যত দূর দৃষ্টি যায় ততদূর কেবল নদী আর নদী। তারপর দিগন্ত রেখার দিকে তা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেছে, তারপর দিগন্ত রেখাও আর দেখা যায় না, সেও দূর কুয়াসায় বিলীন।

' খাড়া পাহাড়ের পাশ কেটে কেটে তারই ধারে ধারে রেলপথ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে চলতে চলতে এক এক সময় ভয় হয়। বাঁয়ের দিকে নিচে তাকালে মনে হয় শূন্যের উপর দিয়ে চলেছি, গাড়ির নিচে চাকার পাশে এক ইঞ্চি পরিমাণ সমতল ভূমিও আছে বলে মনে হয় না। গাড়ি যদি কোনো রকমে একবার লাইনচ্যুত হয় তা হলে নিচে কোথায় যে নিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই। ভাবতে গেলে গা ছমছম করে। এমনি সঙ্কটময় অবস্থায় রেল লাইন আবার এমন এঁকে বেঁকে গেছে যে এক এক সময় সত্যিই মনে হয় যে বাঁক ঘোরবার সময়েই বুঝি ট্রেনখানা নিচে পড়ে যাবে। ডান দিকে তাকালে ভরসা, বাঁ দিকে তাকালে ভয়। ডান দিকে লক্ষ বছরের দৃঢ় গঠিত পাষাণ, তারই কোলে আমাদের পরম নির্ভরতাপূর্ণ আশ্রয়। কিন্তু বাঁ দিকে তাকাও, কিছু নেই। যে কঠিন পথকে আমরা সংসারের পথের রূপক হিসাবে বর্ণনা করি, বাঁ দিকে সে পথও নেই। তখন হিমালয়ের বন্ধুর পথকেও আর বন্ধুর পথ বলে মনে হয় না, তাকে নিতান্তই বন্ধু-পথ বলে মনে হয়।

হিমালয়ের আশ্রয়ে এখানকার গাছগুলোও নির্বিবাদে বেড়ে উঠেছে। নিচের দিকে চেয়ে এই সব বনস্পতিদের শীর্ষভাগ দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল :

"বন-সভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য ॥"

আমরা প্রায় মেঘের রাজ্যে এসে পৌচেছি। নিচের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, যা মাঝে মাঝে দৃশ্য হয়ে আবার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কখনও দূরের পাহাড়ের গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। কখনও শাদা মেঘের স্তর জমে আছে দূর পাহাড়ের গলার কাছে। পাহাড়ীরা দলে দলে পায়ে চলার পথ বেয়ে চলছে। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা অপূর্ব চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। এই চলার মধ্যে লেশমাত্র

ক্লান্তি বা অবসাদ আসছে না। লক্ষ্যস্থলে পৌছনর জন্য মনে কোনো রকম তাগিদই লাগছে না।

দার্জিলিং যাওয়ার পথটা ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো মোটেই নয়। ডিটেকটিভ উপন্যাসে প্রকৃত অপরাধী কে, তা জানবার জন্য মনে যে আগ্রহ জাগে—তার ফলে দ্রুতবেগে গল্পটি পড়ে যেতে হয়, এবং শেষ অধ্যায়ে পৌছনর পরে কোনো দিকেই আর কোনো আগ্রহ থাকে না। দার্জিলিঙের পথটি ঠিক এর বিপরীত। প্রকৃত অপরাধী দার্জিলিং ; ধরা পড়ার আগেও তার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো যত মনোরম, ধরা পড়ার পরেও তেমনি মনোরম, তার সৌন্দর্য কিছুমাত্র কমে না। বইখানা বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মতো।

বাংলাদেশের সমতলভূমির সৌন্দর্য আমাদের চোখে খারাপ লাগে তা নয়, কিন্তু বড় এক ঘেয়ে লাগে। সে জন্য পাহাড়ের পথে যেতে বার বার বাংলা-দেশের কথা মনে পড়ে আর সে সময় তার সৌন্দর্যের দুর্বলতা অত্যন্ত বেশি মনে হয়। নতুনকে পেলে পুরাতনকে এই ভাবেই আমরা ভুলে যাই। জানিনা, কোনো আজন্ম হিমালয়বাসী বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে এসে হিমালয়ের সৌন্দর্যকে ভুলে বাংলাদেশের সমতল শোভায় অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন কি না। হওয়া বিচিত্র নয়।

আজ আমি বাংলাদেশে বসে হিমালয়ের কাহিনী লিখছি। আজ মানে এই ১৯৪৪ সালে। আজ বাংলা দেশের সব কিছুই খারাপ মনে হচ্ছে। অল্পক্ষণ হল ভাত খেয়ে উঠেছি। অর্ধেক ভাত, অর্ধেক কাঁকর। বাংলাদেশের অন্তত পাঁচ কোটি লোক ভাত খায়। সবাই যদি প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে এতটা ক'রে কাঁকর খায় এবং তার সঙ্গে বাংলার বাইরের বাঙালীদেরও ধরা যায় তাহা হলে সহজেই অনুমান করা যায় যে হয় তো দার্জিলিং-পথের এই উন্মাদকারী শোভা আর থাকবে না। চালে কাঁকর মেশাতে ইতিমধ্যেই হয় তো হিমালয়ের বহু পাহাড় শেষ হয়ে গেছে। আরও কিছুকাল এইভাবে চললে নগাধিরাজের শিকড়সুদ্ধ টান পড়বে।

পথের আকর্ষণ আমাদের যেমন প্রবলবেগে টানতে লাগল তেমনি মাত্র তিন চার দিনের মধ্যেই দার্জিলিং পর্ব শেষ করতে হবে ভেবে অন্ততপক্ষে কিরণ-কুমারের মনটা যে ইতিমধ্যেই খারাপ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ পেলাম যখন সে গুন্ গুন্ ক'রে একটি করুণ সুর ভাঁজছে যার অর্থ হচ্ছে—ওগো নিষ্ঠুর পথ, জানি তুমি আমার বাঞ্ছিতকে আবার টেনে নিয়ে যাবে আমার সম্মুখ থেকে।

দার্জিলিং পথের আর একটি দ্রষ্টব্য হচ্ছে কার্ট রোড। এই কার্ট রোডই আদি পথ—রেলপথের আগে এর জন্ম। রেললাইনের পাশে পাশে কখনও পৃথকভাবে, কখনও এক সঙ্গে, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে এই পথ দার্জিলিং পর্যন্ত গেছে, এবং শহরের বাজার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌছলাম কার্সিয়াং স্টেশনে। ইতিপূর্বে বলেছি, প্রথম হিমালয় দর্শনের রোমাঞ্চকর বিস্ময় আমার সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তারই জন্য এখানকার সব কিছু আমার কাছে সব সময়েই নতুন। তাই আমি সহজেই কল্পনা করতে পারি আমার সঙ্গীরা দার্জিলিঙের পথে প্রথম এসে আমারই মতো অভিভূত হয়ে পড়েছে, তাদের আনন্দ-আবেগ-জনিত দ্রুত হৃৎস্পন্দন যেন আমার কানে এসে বাজছে।

প্রথম দৃষ্টিতে চকিতে ভাল লাগার কি কোনো দাম নেই? প্রথম দেখেই যাকে ভাল লাগে সে কি ভাল লাগার অযোগ্য? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার আরও উল্টোটাই বেশি সত্য মনে হয়। এ বিষয়ে আমি স্ট্যানলি লরেলের সঙ্গে একমত। স্থূলকায় অলিভার হার্ডি প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ে ক্ষীণকায় লরেলকে গদগদ ভাবে জিজ্ঞাসা করল "What do you think of love at first sight?" লরেল এ প্রশ্নে বিপন্নভাবে মাথা চুলকিয়ে জবাব দিল, "Well, it saves a lot of time!"—দেখা ও ভালবাসার মধ্যে অকারণ সময় নষ্ট করার মতো সময় যার আছে তার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই, আমি শুধু তার সঙ্গে আমার মতভেদের কথাটি জানিয়ে রাখলাম।

কার্সিয়াং স্টেশনে আসতেই এই নতুন দেশের নতুন মানুষগুলোকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার সুযোগ হল। মেয়েরা চা বিক্রি করছে, তারা অধিকাংশই

স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দরী। এ রকম ফর্সা চেহারার এতগুলো মেয়ে কার্সিয়াং প্ল্যাটফর্মে আছে কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। অতুলানন্দ বলল, "এরা রানি হবার যোগ্য অথচ কুলির কাজ করছে!" চেহারায় রানি হবার যোগ্যই বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কি এত রাজা আছে?

এই পাহাড়ী মেয়েদের সুন্দরী বললে অনেকে আপত্তি করবেন। তাঁদের সৌন্দর্যের আদর্শের সঙ্গে সবার আদর্শ মিলবে না। নিটোল স্বাস্থ্য এবং কাঁচা সোনার মতো রং—তার সঙ্গে পাহাড়ী পোশাক এবং অলঙ্কার চমৎকার মানিয়েছে। আর্টিস্টের চোখে এদের ভাল না লেগে পারে না, এবং আরও যাদের চোখে এরা সুন্দর তারা সবাই আর্টিস্ট নয়। এ দুএর বাইরে আর এক সৌন্দর্য বিচারক আছেন, তাঁর কাছে এদের কথা বলে ঠকেছি। তিনি বলেছেন, বাইরেই ঐ রকম, আসলে ওরা নোংরা! যিনি বলেছেন তিনি গত যুদ্ধে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হয়েছেন, এবং বর্তমান যুদ্ধে আরও ধনী হওয়ার আশা রাখেন।

গাড়ি কার্সিয়াং স্টেশনে মিনিট দশেক কিংবা বেশি দাঁড়াল। আমরা চা কেক ইত্যাদি খেয়ে নিলাম। কিরণকুমার মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করল—"অদ্ভুত!"

অতুলানন্দেরও মন খুব প্রফুল্ল দেখা গেল। নতুন আবেশে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরম চা খেয়ে কারুরই মন এত উৎফুল্ল স্বভাবত হয় না। অতুলানন্দ কিরণকুমারের কথার প্রতিবাদ ক'রে বলল, "কিরণটা বরাবর বোকা।"

কিরণকুমার বিস্মিত হয়ে বলল, "তোমার হৃদয় নেই, অনুভব করার ক্ষমতা নেই—তুমি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর।"

অতুলানন্দ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর একটু হেসে বলল, "কিরণ মাত্র 'অদ্ভুত' বিশেষণটি ব্যবহার ক'রেই মনে করেছে ও বেশি হৃদয়বান, ওর অনুভব করার ক্ষমতা বেশি।"

কিরণকুমার প্রশ্ন করল, "তা হলে তুমি কি বলতে চাও?"

"বলতে চাই যে অদ্ভুতের চেয়ে অনেক বেশি। সমস্ত অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা

এমন বিচিত্র সুন্দর যে বহু-প্রাচীন এবং অর্বাচীন ঐ বিশেষণটি কানে হঠাৎ খারাপ লেগেছে।"

"তা হলে একটা নতুন বিশেষণ বল।"

অতুলানন্দ বলল, "ওর একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে অদ্ভুত।"

সবাই হেসে উঠলাম। অতুলানন্দ বলল, "কিরণের দুঃসাহসটা দেখ। আমি যে-কথাটা বলতে চাই তা ও আগেই বলবে কেন? কথাটা তো আমারই মনে এতক্ষণ আনাগোনা করছে, কিন্তু ভাবছিলাম, বলে লাভ কি?"

সুধাংশুপ্রকাশের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে একবার বলেছি। অর্থাৎ সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে, একটি কথা না বলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারে, কিন্তু কথা বলতে শুরু করলে তার মাঝখানে অন্য কারও কিছু বলার অবসর থাকে না। এতক্ষণ সে গম্ভীর হয়েই ছিল, কোনো-কিছুর মধ্যে ছিল না, কিন্তু কার্সিয়াং এসে সবারই মনোজগতে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। গাড়ি কার্সিয়াং ষ্টেশন থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুপ্রকাশ কথা বলতে শুরু করল। মন তার আনন্দে ভরে উঠেছে, দার্জিলিং ভ্রমণ যে এত সুন্দর তা বোধ করি আরও বেশি ক'রে মনে হচ্ছে, তাই সে বকতে শুরু করল। বলল, "দার্জিলিং তো যাচ্ছ, দার্জিলিঙের ইতিহাস জান?"

দার্জিলিংকে না দেখেই দার্জিলিংকে সুধাংশুপ্রকাশ ভালবেসে ফেলল, এবং স্পষ্টই বোঝা গেল কোনো জায়গা সম্বন্ধে হৃদয় বিগলিত না হলে তার সে জায়গার ইতিহাস মনে পড়ার কোনো হেতু নেই।

প্রাণের আনন্দ ইতিহাস-রূপে প্রকাশ হল এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রকাশভঙ্গীও স্বতন্ত্র। কিন্তু তার মানে এ নয় যে সুধাংশুপ্রকাশ নামক বিশেষ ব্যক্তিটি আনন্দে উৎফুল্ল হলে সর্বদা প্রাচীন ইতিহাস আবৃত্তি করে। আমরা যে-কোনো আনন্দের প্রকাশ দেখলেই তাকে আনন্দের প্রকাশ বলেই বুঝতে পারব এমন কোনো কথা নেই। যে-জিনিস আমাদের প্রাণে আনন্দ জাগায় সে জিনিসের রূপও এক নয়। পক্ষান্তরে যাকে আনন্দের প্রকাশ বলে

নিঃসন্দেহ হই, তার মূলে হয় তো কোনো বেদনা লুকিয়ে থাকতে পারে। আনন্দে লোকে কাঁদে এবং দুঃখে হাসে এ কথা সবারই জানা। কিন্তু কোনোটাই সকল অবস্থার পক্ষে সমান সত্য নয়। অতএব ইতিহাস আবৃত্তিকারীকে পাঠক রসবোধহীন জার্নালিস্ট মনে করলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে।

ইতিমধ্যে টুং ও সোনাদা ছাড়িয়ে কখন ঘুম স্টেশনে এসে পড়েছি খেয়াল নেই। এতক্ষণে লক্ষ্যে পৌছনর জন্য মনে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। মাথার উপরের আকাশ সম্পূর্ণ মেঘহীন। চলতে চলতে ক্রমে রৌদ্রালোকিত দার্জিলিং শহর আমাদের চোখে ছবির মতো ফুটে উঠল। ঘুম থেকে আমরা ক্রমশঃ নিচের দিকে চলেছি, কেননা, শুকনা-দার্জিলিঙের মধ্যবর্ত্তী পথে ঘুমই হচ্ছে উচ্চতায় সবচেয়ে বেশি। ঘুমের উচ্চতা ৭৪০৭ ফুট—দার্জিলিঙের ৬৮১২ ফুট।

কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত আমরা আর অভিনবত্বের সন্ধান করিনি। সোনাদা এবং ঘুমের মাঝখানে পথের ধারে গভীর অরণ্য, অরণ্যের মাঝখান দিয়েও রেলপথ মাঝে মাঝে গেছে এই টুকু মাত্র মনে আছে।

দার্জিলিং স্টেশনে এসে পৌছলাম। কিন্তু নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই ভূতপূর্ব সহযাত্রীটি পূর্বপরিচয়ের অধিকারে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটল। যেমন অসহায় মূর্তিতে সে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তখনও সে তেমনি অসহায়।

যে লোকটি কোনো দিন দার্জিলিং আসে নি, সে কলকাতা থেকে বিজয়া দশমীর দিন দার্জিলিং আসছে এবং পথে আমাদের দেখে আমাদের সঙ্গী হয়ে, অপরিচিত জায়গার অসুবিধা এড়িয়ে চলবে, অথচ সে শিশু নয়—এই কল্পনাটাই আমাদের কাছে একটু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। তবু তাকে মেনে নিলাম, কেননা তার সম্পর্কে আমাদের কোনো কৌতূহল ছিল না, আমরা যদি একই হোটেলে থাকি বা একই শহরে বেড়াই, তা হলে আরও অপরিচিত শত সহস্র লোকের সঙ্গে তার কোনোই পার্থক্য থাকে না, এবং তাকে অপছন্দ করারও কোনো মানে হয় না—অবশ্য সেও যদি

অন্যান্য অপরিচিত লোকের মতোই ব্যবহার করে এবং আমাদের খরচে খেতে না চায়।

অনেকগুলো হোটেলের প্রতিনিধিকে এড়িয়ে আমরা ধরমশালায় যাব ঠিক করলাম; যাবার পথে গ্রহের-ফেরে-পাওয়া যুবকটিও দেখি আমাদের উপগ্রহের মতোই অনুসরণ করছে।

ধরমশালায় জায়গা হল না, অগত্যা মালপত্র নিয়ে কাছাকাছি একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এই হোটেল মনোনয়নে আমাদের কে সাহায্য করেছিল মনে নেই, হয় তো কুলিদের মধ্যেই কেউ ক'রে থাকবে, হয় তো তাদের মধ্যে সেই হোটেলের এজেন্ট কেউ ছিল।

যা হোক হোটেলে ভাল একটা ঘর আমরা পেলাম, সেটাকে নিচের দিকের দোতলা বলা যেতে পারে। প্রথমে মনে হয়েছিল পাতালে প্রবেশ করছি। কিন্তু প্রবেশ ক'রে দেখি সামনের দিকে খোলা এবং সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

আমাদের এই উপগ্রহটিকেও আমাদের হোটেলেই স্থান ক'রে দিতে হল, কিন্তু এক ঘরে নয়, হোটেলের মালিককে বলে দেওয়া হল তার হিসেব আলাদা।

আমরা যখন দার্জিলিং পৌঁছেছি তখন বেলা দুটো কিংবা তিনটে হবে। চারদিকে মেঘের আবেষ্টনী কিন্তু সে শুধু পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে—মাথার উপর মেঘ ছিল না, সুতরাং রোদেরও অভাব ছিল না। দার্জিলিং হাসিমুখেই আমাদের অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু পরদিনই বুঝতে পারলাম, সব প্রতারণা।

হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া সেরেই শহর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। পোশাক আমাদের বিচিত্র। শীত খুব বেশি ছিল না, খবরের কাগজ থেকে জানা গেল গত দিনে সর্ব্বোচ্চ তাপ ছিল ৬৫ ডিগ্রী, সর্ব্বনিম্ন ৪৭, কিন্তু আর্দ্রতা নব্বুয়ের কাছাকাছি।

আমাদের পোষাক বিচিত্র ছিল সে কথা আগেই বলেছি। বিশবছর আগে একটা আলস্টার তৈরি করিয়েছিলাম, তার ওজন হবে প্রায় সতেরো সের।

সে রকম মোটা শীতের জামা কলকাতায় কোনো দিনই দরকার হয় না, দার্জিলিঙেও দরকার হয় না বোধ হয়। সম্ভবত ক্যাপটেন স্কট দক্ষিণ মেরুতে যাবার সময় এই রকম ওভারকোট পরেছিলেন। পূর্ববারে দার্জিলিং গিয়ে কয়েকদিন ঘুমে কাটিয়েছিলাম, সেখানে কাজে লেগেছিল। সে সময় ঘুমে কড়া শীত ছিল—সেখানকার হাওয়া ছিল হাড় কাঁপানো। সেখানে বোধ হয় সব সময়েই ঐ রকম শীত থাকে, অন্তত আমার অভিজ্ঞতা থেকে ঐ রকমই মনে হচ্ছে।

কিরণকুমারও দার্জিলিঙের শীতের কথা শুনে একটা ওভারকোট নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু নেবার আগে ভাবতে পারেনি যে তার পক্ষে ওটা বহনমাত্রই সার হবে। তার কোটটি দুটি বিশিষ্ট কারণে অচল। প্রথমত সেটি তার নয়, তার ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ওটিকে শেষ ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, কোটটি কিরণকুমারের গায়ে ছোট হয়।

অতুলানন্দের পোষাক ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক। সুধাংশুপ্রকাশের পোষাকও একদিক দিয়ে আধুনিক বলা চলে। তার ছিল ঢিলে পাজামা, এবং উলের সোয়েটারের উপর ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। শীতের জন্য পৃথক পোষাক তার না হলেও চলে, কেননা প্রকৃতিদত্ত চর্বির কোট তার চামড়ার নিচে জন্মাবধিই আছে।

প্রথম হোটেল থেকে বেরুবার সময় আমরা শীত আন্দাজ করতে না পেরে যার যা সম্বল ছিল সব পরেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুল বুঝতে পারলাম। পথে বেরিয়ে কিরণকুমার ও আমি কোট খুলে ফেলে ঘাড়ে নিলাম। বলা বাহুল্য কিরণকুমারের কোট তার গা থেকে খুলতে আমাদের সববেত শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। আশেপাশে পুলিস থাকলে নিশ্চয় একবার কাছে এসে দেখে যেত আমরা জীবন্ত মানুষের চামড়া ছাড়াচ্ছি কি না।

যথাসময়ে কোট খুলে ভালই করেছিলাম।

দার্জিলিঙে বাঙালী পুরুষ এবং মেয়েরা আসে আধুনিকতায় দীক্ষা নিতে।

নতুন আবহাওয়ায় এসে নিজেদের নতুন ক'রে দেখতে ইচ্ছা করে। যে সব বাঙালী স্বভাবতই সাহেবি পোষাক পরে না, তারা এখানে এসে সাহেব সাজে। যে সব বাঙালী মেয়ে ট্রামে উঠতে ভয় পায়, এখানে এসে তারা ঘোড়ায় চড়ে। বাংলাদেশে কোনো প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতের পণ্ডিত যদি মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলী জড়িয়ে মোটর সাইকেলে পাইপ টানতে টানতে ছুটে চলেন তা হলে সে দৃশ্যে আমরা চমকে যাব। কোনো বাঙালী ঘরের বধূকে ঘোড়ায় চড়তে দেখলেও আমরা ঠিক তেমনি চমকিত হব। কিন্তু এই দেশছাড়া দেশে কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়। এখানে সবারই মনের শক্তি অশ্বশক্তি লাভ করে, বাঙালী মেয়ের অশ্ববাহনটিও তার মনেরই শক্তি এবং গতিরূপের প্রতীক। এখানে সবই এগিয়ে আছে। হিমালয় স্বর্গের কাছাকাছি এসেছে, গাছেরা মেঘ ভেদ ক'রে উপরে মাথা তুলেছে। এখানে মানুষের মনও এগিয়ে চলে। সুতরাং এই নতুন এবং আধুনিক আবহাওয়ায় আমরা প্রাচীন পোষাকে প্রাচীন কালের হাওয়া বয়ে আনলে কেউ আমাদের ক্ষমা করত না।

আমরা বিকেলে বেরিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত ঘুরলাম, কিন্তু তবু ক্লান্ত বোধ করিনি। গভীর কালো মেঘ মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিল আসন্ন বৃষ্টির পূর্বাভাস বহন ক'রে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেদিন আর বৃষ্টি হল না। সন্ধ্যার একটু পরেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের সেই পথে পাওয়া উপগ্রহটি যে এতক্ষণ কোথায় কি অবস্থায় আছে তা আমাদের আর খেয়ালই হয়নি। কিন্তু হোটেলে ফিরেই তার সঙ্গে আমাদের দেখা হল। সে নিজে থেকেই বলল, "আমিও আপনাদের মতো খুব খানিকটা বেড়িয়ে এলাম।" আমরা যে খুব খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি এ ছোকরা তা জানে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। সে বলল আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাকি সে ছিল।

সন্ধ্যার পর থেকে শীতটা বেশ ভালভাবেই অনুভব করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠল আমরা টাইগার হিলে উঠব কিনা। ইতিপূর্বে দুবার দার্জিলিং এসেও সেখানে যাবার সুযোগ ঘটেনি, ইচ্ছাও খুব হয় নি। চিরতুষার

মণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যই বার বার আমার মনকে এমন অভিভূত করেছে যে একই সঙ্গে বহু রকম বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে আমার উৎসাহ জাগেনি। এ বিষয়ে আমার স্বভাব একটু কৃপণ। সব কিছু একবারে উপভোগ করতে মন সরে না, একটু একটু ক'রে উপভোগ করতে ভাল লাগে। তবু এবারে মনের মতো সঙ্গী পাওয়াতে এবং এক সঙ্গে চারজন জোটাতে টাইগার হিলে যাবার ইচ্ছা মনে জেগেছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনায় যাওয়া হল না। সেই রাত্রেই শুনলাম সেই হোটেল থেকে একদল মাড়োয়ারী টাইগার হিলে যাচ্ছে। তারা সবাই ব্যবসাদার, পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং এসেছে। এই খবরটা শুনে টাইগার হিলে যাবার ইচ্ছাটা নষ্ট হয়ে গেল। কেন, তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। কেন যেন সে সময় মনে হল, তাহলে সেখানকার সূর্যোদয়ের দৃশ্যের মধ্যে মন ভোলানোর মতো যে উপাদান আছে তা নিশ্চিতই খুব শস্তা। নিশ্চয়ই সে এমন একটা সিনেমা ছবির মতো যা দেখতে সাধারণ লোকে টিকিট ঘরের কাছে মারামারি করে।

পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। টাইগার হিলে সূর্যোদয় অযথা ভাল্গার হবে কেন? ওরা হয়তো টাইগার হিলে হোটেল খোলা যায় কিনা দেখতে গেছে, হয়তো সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে আদৌ যায় নি।

কিন্তু যে জন্যই হোক, টাইগার হিলের দুর্লভ সূর্যোদয়-শোভা দেখতে যে-পরিশ্রম ক'রে যেতে হয় এবং যে ভাবে সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে আসতে হয়, তাতে মন তৃপ্ত হয় কিনা, এ প্রশ্ন টাইগার হিলের সূর্যোদয় না দেখা সত্ত্বেও আমার মনে জেগে আছে।

দার্জিলিং শহরে এলে বৈচিত্র্যের স্বাদ এত বেশি পাওয়া যায় যে তা ছেড়ে সহজে অন্য কোথায়ও যেতে ইচ্ছা হয় না। একই জায়গায় বসে এ রকম দৃশ্যবদল আর কোথাও দেখা যাবে না। কুয়াসার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সম্মুখের দৃশ্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল, মনে হল এখুনি কুয়াসা কেটে গেলে আবার পূর্বের দৃশ্য দেখা যাবে, কিন্তু ঠিক তা হয় না। কুয়াসার স্তর-ভেদে একই দৃশ্য বহু রূপ ধারণ করে। সম্মুখে যে সুন্দর দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখছি—একটু অন্যমনস্ক হয়ে আবার সেদিকে চাইলে চমকে উঠি। অন্যমনস্ক অবস্থায় পকেট কাটা গেলে যেমন

বোধ হয়, যা স্পষ্ট এবং স্পর্শযোগ্য ছিল, সহসা দেখা যায় তার মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে, দৃশ্যের বেলাতেও তাই। যেন একটা গোটা পাহাড় তার গাছপালা-সুদ্ধ পকেটমারের হাতে কাটা পড়েছে। এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে বোঝানো যায় না। সেই জন্যই এই বিষম উপমাটা মনে এলো।

প্রথম দিনের বিকেল বেলাটা ভালয় ভালয় কাটল, পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম জলা পাহাড় রোডের দিকে। পথটির নাম ইংরেজীতে যে ভাবে লেখা তাতে অনেকেরই মনে হয় জল এবং পাহাড় একসঙ্গে মিলে নামটি হয়েছে। আসলে কিন্তু সম্পর্কটি আগুনের সঙ্গে। ওখানকার কোনো পাহাড়ে এক সময় ভীষণ আগুন লেগে যায়—তা থেকেই ঐ নাম। জলা পাহাড় নয়, জ্বলা পাহাড়। সত্তর পঁচাত্তর বছর আগে সেন্ট হিল রোড থেকে জলাপাহাড় ডিপো পর্যন্ত জায়গা ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সে জঙ্গল এমন ঘন ছিল যে তার মধ্যে বাঘেরা নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে পারত। সে সময়ে এইখানে একটা লোক বাঘের হাতে মারাও পড়ে। ১৮৪০ সাল আন্দাজ সময়ে এই জঙ্গলের প্রায় সবখানিই আগুনে পুড়ে যায়, উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্র থাকে না, সেই থেকে এই পাহাড়ের নাম হয় জ্বলা পাহাড়।

এই পথের ধারে একটা বাড়িতে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক থাকতেন, তাঁকে খুঁজে বের ক'রে আমরা সবাই মিলে এদিককার পরিচিত পথগুলোয় ঘুরব এই ছিল মতলব। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই পথের ধারের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য কুয়াসা ও মেঘ ভেদ ক'রেও কিছু কিছু তখন দেখা যাচ্ছিল। চুপচাপ বসে কাটালাম কিছুক্ষণ। তারপর উঠে সেই ভদ্রলোককে নিয়ে ঘণ্টা দুই খুব হাঁটা গেল।

ভদ্রলোক সৌভাগ্যক্রমে নানা দিক দিয়ে আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান, সে জন্য সব বিষয়েই তাঁর একটি বিশিষ্ট মত আছে। সেই সব মতের প্রতিবাদ বোধ হয় কেউ করেনি, আমরাও করলাম না। তিনি কুয়াসা ভেদ ক'রে যেতে যেতে বললেন, "এই কুয়াসা নাকে টানলে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে—কেননা এতে ozone (ওজোন) আছে খুব বেশি" সে কথা শুনে বিজ্ঞানী

সুধাংশুপ্রকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ভদ্রলোক তা লক্ষ্য ক'রে বললেন "ঘণ্টাখানেক রোজ এই রকম টানতে পারলে খুব উপকার পাবেন।"

তারপর কথায় কথায় টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের কথা উঠল। তিনি এবারেও আমাদের অজ্ঞাত একটি খবর শোনালেন। খবরটা হচ্ছে এই যে সার্ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এই টাইগার হিলের সূর্যোদয় থেকেই তাঁর সুবিখ্যাত 'রামন-এফেক্ট'-এর সন্ধানসূত্র আবিষ্কার করেন। এ খবর শোনার পর আমাদের চারজনের মিলিত দীর্ঘ-নিশ্বাসে জলা পাহাড় রোডের কুয়াসা কেটে গেল।

বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষে কিছু বিশ্রাম ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম শহর ভ্রমণে। আকাশ ক্রমেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল—ফোটোগ্রাফ তোলবার মতো উপযুক্ত আলো মিলল না। মাঝে মাঝে দুচার সেকেণ্ডের জন্য যদি বা রোদের মুখ দেখা যায়, কিন্তু দূরের দৃশ্য সবই মেঘে বা কুয়াসায় ঢাকা—কোথায়ও কোনো ফাঁক নেই।

সন্ধ্যার দিকে কনকনে শীত অনুভব করতে লাগলাম, এবং হোটেলে ফেরবার পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। সে কি ভীষণ বৃষ্টি! সমস্ত রাত বৃষ্টি—পরদিন সকালেও সে বৃষ্টির বিরাম নেই। সমস্ত আবহাওয়া ভিজে—আকাশ অন্ধকার —আর অবিরাম বর্ষণ। সকালে মন বড় খারাপ হয়ে গেল।

আমাদের জানালার সম্মুখে পাহাড় ক্রমশঃ নিচু হয়ে নেমে গেছে এবং আরও অনেক দূর পর্যন্ত দু তিনটি ছোট পাহাড় থাকাতে অনেকখানি দৃশ্য চোখের সম্মুখেই উন্মুক্ত ছিল। সে হিসাবে আমাদের ঘরটি মূল্যবান বলতে হবে। কিন্তু ভাগ্যিস এই সুবিধাটুকু ছিল, তাই ও রকম বৃষ্টিতে ঘরে বন্ধ থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা হিমালয়েই আছি, নইলে ঘরের বাইরে যদি দৃষ্টি না চলত, তাহলে কলকাতার ঘর আর দার্জিলিঙের ঘরে কোনো তফাৎ থাকত না।

কিন্তু তবু বৃষ্টিতে দার্জিলিঙের ঘরে বসেও সান্ত্বনা মিলল না—আমার মনে হল যেন হিমালয়ে আসার সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আসার পথে যে আনন্দ লাভ করেছি তার ধারাবাহিকতা দার্জিলিঙে বসেই কাটা পড়ে গেল এ

চিন্তা আরামপ্রদ নয়। তাছাড়া হিমালয়ের কাছে আমরা এসেছি একটা প্রেমের ভাব নিয়ে। আমরা তার বিরাটত্বের কাছে আপনা থেকেই নিজেদের ছোট মনে করেছি, সুতরাং এটা তো বোঝাই উচিত যে আমরা একটুখানি ভাল ব্যবহার আশা করি—একটুখানি স্নেহ প্রীতি আশা করি। এমনি অবস্থায় যদি দেখি সে আমাদের গ্রাহ্যও করে না, আমাদের খুশি করার তার এতটুকু গরজ নেই, তাহলে আমাদের মনে অভিমান জাগা স্বাভাবিক।

বেলা দশটাতেও যখন মেঘ কেটে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তখন আমাদের মধ্যে একটা ঘরোয়া বৈঠক বসানো নিতান্তই দরকার হয়ে পড়ল। টাইম টেবল দেখে ঠিক করলাম সেই দিনই দার্জিলিং ছেড়ে অন্য কোনো স্টেশনে যাওয়া হবে। মেঘের এলাকা পার হয়ে কার্সিয়াং যাওয়াই ঠিক হল। ভাবলাম হয়তো সেখানেও বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু দার্জিলিঙের নিশ্চিত বৃষ্টিতে বসে না থেকে অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অনিশ্চয়তার মধ্যে ভাগ্যকে ছেড়ে দেওয়া ঢের ভাল। দার্জিলিং আমাদের চোখে ডিটেকটিভ উপন্যাসেরই ক্রিমিন্যাল হয়ে গেল, কার্সিয়াংকে অন্তত 'বেনিফিট অব দি ডাউট' দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিছানাপত্রও বেঁধে ফেললাম।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে—তারই মধ্যে স্টেশনে গিয়ে দুপুর বেলা গাড়িতে চেপে বসলাম। অতুলানন্দের মনটা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হোটেলের ছোট্ট পরিচারক, বাহাদুর, তাঁর মনে অপত্য স্নেহ জাগিয়ে তুলেছে, তা আমরা জানতাম না। ছেলেটি অতুলানন্দকে যে ভাবে সেবা করেছে তাতে তার প্রতি মমতা হওয়া স্বাভাবিক।

দার্জিলিং স্টেশনে এসে গাড়িতে আমরা চারজন পাশাপাশি বসতে পারলাম না, আগে থাকতেই গাড়িগুলো যাত্রীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। একই গাড়ির মধ্যে উত্তরে বসলাম অতুলানন্দ ও আমি, দক্ষিণে বসল কিরণকুমার ও সুধাংশুপ্রকাশ। গাড়ির পাশে একটি ভিখারী পাহাড়ী মেয়ে করুণ চোখে চেয়ে ছিল; সাত আট বছরের মেয়ে, তাকে সেই নতুন দেশের পটভূমিকায় একখানি ছবির মতো মনে হচ্ছিল।

তার ছবি তুলতে দেখে আমার পাশের একটি মেয়ে আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সে তার ভাইবোনদের সঙ্গে আমাদেরই সঙ্গে দার্জিলিং ত্যাগ করছিল। মেয়েটির চেহারা পাহাড়ীদের মতো নয়, নাক চোখ সবই খুব চমৎকার, তার আশা ছিল তাদের ছবিও আমি হয় তো এক সময় নেব, কিন্তু গাড়ির ভিড়ের মধ্যে সেটা আর সম্ভব হয়নি—তারা এত কাছে ছিল যে সেখান থেকে ছবি তোলা সম্ভব নয়।

তারা ছোট দুটি বোন আমাদের দিকে সর্বদা সবিস্ময়ে চেয়ে ছিল। ছবি তুলি আর না তুলি, তারা যে আমাদের পাশে বসে ধন্য হয়ে গেছে এ ভাবটা তাদের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটি মেয়ে আমার হাঁটুর উপর হাত রেখে বসল। যেন মুহূর্তে তার নিজের আত্মীয়দের চেয়ে আমি বেশি আত্মীয় হয়ে উঠলাম। তাকে কি ভাবে খুশি করব সেই হল আমার এক ভাবনা। যদি বলি এ রকম অবস্থায় ফোটো তোলা সম্ভব নয় তা হলে সে তা বিশ্বাস করবে না, তাই কিছু বলতেও পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তাকে ফিল্মের একটি কৌটো দান করলাম, সে খুশি হয়ে তা গ্রহণ করল।

কিন্তু গোল বাধল কার্সিয়াং-এ এসে। একটি দান পেয়ে সে যে এতক্ষণ এতখানি আত্মীয় হয়ে উঠেছে আমি তা বুঝতে পারিনি; সেও বুঝতে পারেনি কার্সিয়াং-এ হঠাৎ তাদের ছেড়ে নেমে যেতে পারি। তাই আমার নামার উদ্যোগ দেখে সে অবাক হয়ে বলল, এখানেই নেমে যাবে?

তার চোখে বেদনা ফুটে উঠল। তার শিশু মন নিয়ে সে হয়তো কল্পনা করছিল আমি তাদেরই সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠব।

এতখানি আশাভঙ্গে মেয়েটি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। আমিও ক্ষণকালের জন্য বেদনাবোধ করলাম। সে মুহূর্তে মনে হল ও যেন হিমালয়ের আত্মা—দার্জিলিং ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের এই অন্তরতম আনন্দের কেন্দ্র থেকে আমার বিচ্ছেদ ঘটল। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ছোট সরল মেয়েটি,—মানুষের প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই ওর প্রথম মুখোমুখি পরিচয়; কে জানে, হয়তো এই স্মৃতিই ওর ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে।

কার্সিয়াং-এও বৃষ্টির হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই ধরমশালায় গিয়ে উঠলাম। কার্সিয়াং-এর ধরমশালাটি খুবই ভাল লাগল। তা ছাড়া এবারে সঙ্গে সেই উপগ্রহটি নেই বলে আরও আরাম বোধ করলাম।

দার্জিলিঙের হোটেলের খাতায় আমাদের পরিচয় যা লিখিয়েছিলাম, এখানেও তাই লিখিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমরা চারজনেই জার্নালিস্ট, এবং ভ্রমণ উদ্দেশ্য, দেশ দেখা। ভগবান জানেন, উদ্দেশ্য এমন কিছুই না যার জন্য বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের জার্নালিজম্‌ গর্বিত হতে পারে।

যাই হোক এখানে আসবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু তখন প্রায় সন্ধ্যা, ক্যামেরার সদ্ব্যবহার আর তখন করা যায় না। আমরা বেরিয়ে শহরটা মোটামুটি ঘুরে এলাম এবং খাবার জন্য হোটেলও একটা খুঁজে বের করলাম। হোটেলটি ধরমশালার খুবই কাছে।

এর মধ্যে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা ধরমশালা থেকে বেরিয়ে বাজারের ভিতর দিয়ে কিছুদূর যেতেই দেখি আমাদের সেই উপগ্রহটিও কখন এসে জুটেছে কার্সিয়াং-এ। মুখে পূর্বের মতোই করুণ হাসি। এই অসহায় যুবকটিকে তখন আর নিতান্ত অসহায় বলে মনে হল না, এখন সে নিজেই চলাফেরা করতে পারে, এবং হিমালয়েও সে দেখি নিতান্ত নিরাশ্রয় নয়। অতুলানন্দের মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধি জাগল।

সে যুবকটিকে দেখেই বলে উঠল 'এই যে ছোট দাদু!' সে দাঁত বের ক'রে এগিয়ে এসে তার কার্সিয়াং আসা সম্বন্ধে এক কৈফিৎ দিল। বলল কলকাতা থেকে তার কাকা পাঠিয়েছেন তাকে একটা বাড়ি ভাড়া করার জন্য, দার্জিলিঙে বাড়ি না পেয়ে অগত্যা তাকে কার্সিয়াং আসতে হয়েছে।

আশ্চর্য যোগাযোগ! আমরা যেখানে যাচ্ছি সেও ঠিক সেখানে হাজির হচ্ছে, সুতরাং তাকে নিয়ে রসিকতা করবার একটি মহা সুযোগ উপস্থিত। অতুলানন্দ তাকে কাছে নিয়ে বেদান্ত দর্শন বোঝাতে লাগল। সে কিছুই বোঝে না, কিন্তু অতুলানন্দও কিছুতেই ছাড়ে না। এবং সে যত বোঝে না ততই তাকে বোঝাবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। যুবকটি উঠি উঠি ভাব

দেখাতে লাগল, অতুলানন্দ উঠতে দিল না। শেষে প্রাচীন ভারতের কথা উঠল, প্রাচীন ভারতের সমাজের কথা উঠল, লোকটার কোনো বিষয়েই কিছু জানা নেই, সে আর কতক্ষণ সহ্য করবে! বিদ্যা স্কুলের বেশি আছে বলে মনে হল না। যাই হোক ঘণ্টাখানেক তাকে জোর ক'রে ধরে রেখে গোটাকতক বক্তৃতা দেবার পরেই আমাদের ঘাড় থেকে স্থায়ী ভাবে ভূত নেমে গেল, তার পর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

আমাদের অনুসরণ ক'রে তার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হল তা সেই জানে।

রাত্রে ধরমশালা থেকে বেরিয়ে হোটেলের পর্ব মিটিয়েই আবার ধরমশালায় ফিরে এলাম। কিন্তু সুধাংশুপ্রকাশ এবং কিরণকুমার বলল, এখুনি ফিরে আসা ঠিক হয়নি, আরও কিছুক্ষণ বেড়ানো উচিত ছিল। তখন সবে নটা বেজেছে, সে সময় শোয়া চলে না, অথচ নতুন জায়গায় এসে অকারণ ঘরে বসে থাকা অস্বাভাবিক।

আমার কিন্তু ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল এক বেলা হেঁটেই! দার্জিলিঙে এর চেয়ে বেশি হেঁটেও ক্লান্ত হইনি, এখানে এসে এ রকম মনে হওয়ার অন্য কারণ ছিল। ক্যামেরার কাজ যতক্ষণ চলার সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ হাঁটার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে না, কিন্তু কার্সিয়াং-এ রাত্রি নটার পর খালি হাতে দ্বিতীয় বার ঘোরায় মন সায় দিচ্ছিল না বলেই মন বেঁকে বসল। সুতরাং আমিও আপত্তি জানালাম।

বৃষ্টির আবির্ভাবে সুখনিদ্রার কল্পনা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু আমার মনে দার্জিলিঙের নৈরাশ্য জেগে উঠল। মনে হল কার্সিয়াংও আমাদের প্রতি বিরূপ হল, এবারের যাত্রাটাই অশুভ। সুতরাং দ্বিতীয় কর্তব্য শুয়ে পড়া, তাইতেই মনোযোগ দিলাম। কিন্তু ঘুমনো গেল না।

আজকের দিনে কলকাতা শহরে ট্রাম বা বাস্ কোনো স্টপে থামলেই শত শত যাত্রী তাকে যেমন আক্রমণ করে একটুখানি জায়গা পাবার জন্য, তখনকার অবস্থাও হল ঠিক তেমনি। অগণিত ছারপোকা এসে আক্রমণ করল আমাদের। আলো নিবিয়ে দিয়েছিলাম, আবার জ্বালতে হল। ছারপোকা

বাহিনীগুলো রুশ বাহিনীগুলোর মতো। জার্মানরা রুশ বাহিনী বার বার 'ধ্বংস' এবং 'নিশ্চিহ্ন' করা সত্ত্বেও সেগুলো যেমন দুর্বার হয়েই রইল, কার্সিয়াং ধরমশালার বাহিনীগুলোও তেমনি তাদের অমরত্ব প্রমাণ করল আমাদের কাছে। আমাদের পক্ষে ঘুমনো অসম্ভব হল।

বৃষ্টি চলল সকাল সাতটা পর্যন্ত।

তারপর হঠাৎ বাইরে চেয়ে দেখি রোদ উঠেছে।

লাফিয়ে উঠে পড়লাম। হোটেলে বলা ছিল সকালে চা ও খাবার পাঠিয়ে দেবে। দিয়েছিল পাঠিয়ে, কিন্তু একটু দেরিতে। আটটার আগে বেরোন গেল না। বেরিয়েই পরিষ্কার আকাশের দিকে চেয়ে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল।

সম্মুখে যা দেখি তারই ছবি নিতে ইচ্ছে হয়! হিমালয়ের বহু ছবি তুলব বলে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম, সেজন্য মনে কি রকম ক্ষোভ ছিল তা বলা বাহুল্য। মনে হল হিমালয়কে এবারে একবার দেখে নেব। এ রকম পরিষ্কার আবহাওয়া তো আর মিলবে না।

ধরমশালা থেকে বেরিয়েই দেখি এক পাহাড়ী, তার স্ত্রী, ছোট একটি মেয়ে ও একটি কুকুর নিয়ে চলেছে। স্বামী স্ত্রী দুজনের ঘাড়েই দুটো বোঝা। ওরা ওদের যা কিছু সম্পত্তি সব পিঠে বহন ক'রে চলেছে।

এদেরই ছবি আগে নেওয়া ঠিক করলাম। ক্লান্তভাবে ওরা হেঁটে চলছে, তবু বলা মাত্র থামল এবং যেমন ভাবে দাঁড়াতে বললাম তেমনি দাঁড়িয়ে গেল আমাদের শখ মেটাবার জন্য। সবাইকে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে হাসতে বললাম, ওরা কিছুমাত্র আপত্তি না করে হাসতে লাগল।—সরল সুন্দর হাসি।

বহু দূর থেকে ওরা আসছিল, বহু দূরে যাবে, এমনি অবস্থায় ওদের দাঁড় করিয়ে এতখানি কষ্ট দিলাম, বিনিময়ে ওদের খুশি করার জন্য ছোট মেয়েটির হাতে কিছু পয়সা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওরা কেউ পয়সা নিতে রাজি হল না। অথচ ওরা যে দরিদ্র এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ ছিল না। পয়সা নিল না, উপরন্তু হাসতে হাসতে আমাদের নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

দানের গর্ব থেকে সহসা বঞ্চিত হয়ে নিজেকে ক্ষণকালের জন্ম ঐ পাহাড়ী দম্পতির কাছে বড় ছোট মনে হল।

দার্জিলিঙে যাদের দেখেছি তারা এ রকম নয়। তারা শহরে থেকে থেকে আমাদেরই মতো পয়সার দামটাই সব চেয়ে বেশি মনে করতে শিখেছে। অল্প দুচার জনের সংস্পর্শে এসেই এটা বোঝা গেছে। ওখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশলে অবশ্য ওদের ঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব, সে সুযোগ হয়নি। শুনেছি মেয়েরা না কি খুব ভাল। পুরুষদেরও প্রশংসা শুনেছি অনেকের মুখে। ১৯১৯ সালে ঘুম স্টেশনে থাকবার সময় একটা ঘটনা জানি। আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেই বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক বাজার করতে যান দার্জিলিঙে। সেখানে এক কুলীর পিঠে নানা রকম জিনিস পত্র চাপিয়ে চলতে চলতে ভিড়ের মধ্যে কি ক'রে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যান। ভদ্রলোক কুলীর চেহারা মনে রাখেননি, তাড়াতাড়ি খুঁজেও পান নি। অবশেষে পালিয়েছে সন্দেহ ক'রে অল্প কিছু জিনিস নিজ হাতে কিনে আনেন। তিনি ফেরেন বেলা এগারোটায়। এদিকে কুলীটি তাঁকে খুঁজে না পেয়ে জনে জনে জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁর ঠিকানা বের ক'রে বিকেল বেলা মোট এনে পৌছে দেয় তাঁর বাড়িতে। আন্দাজ ক'রে এসেছিল, ভেবেছিল হয় তো ভুল বাড়িতে আসছে। এ জন্য সে কেঁদেই অস্থির।

কার্সিয়াং শহরে পাহাড়ীদের এই ধর্মের সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয় ঘটল এই প্রথম। হিমালয়কে ভুলেই গেলাম। যে হিমালয়কে এতকাল ধরে দর্শনীয়দের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়ে রেখেছি, যার স্তুতি গানে লেখনী সর্বদা মুখর হয়ে ওঠে, সেই হিমালয়ের চেয়েও মহৎ হয়ে দেখা দিল হিমালয়ের মানুষগুলো। ক্যামেরায় কোন্ ছবি নেব তা তখনই ঠিক ক'রে ফেললাম এবং আমরা বাজারের ভিতর দিয়ে দার্জিলিঙের দিকের পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

এইখানে পথের ধারে বসে যতগুলো ছবি তুলেছি, আর কোনো দিন একই জায়গায় বসে এত ছবি তোলার সুযোগ পাইনি। যে যায়, তাকেই দাঁড় করিয়ে ছবি নিচ্ছি নানাভাবের পোজ্ দিয়ে। কেউ আপত্তি করল না, সবাই খুশি

হয়ে পোজ দিয়ে গেল। যাবার সময় একখানা ছবি চেয়েও গেল না। পথ চলতি নরনারী, ছ'চার মিনিট আমাদের খেয়াল মিটিয়ে নিজেরাই খুশি !

তারপর যখন ফিরে আসছি তখন হঠাৎ পথে দেখি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সেই পথেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য কার্সিয়াং এসেছেন। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য তিনি কবে হারিয়েছেন তা তিনিও ঠিক বলতে পারলেন না।

আরও এগিয়ে আসতে দেখি কতকগুলো মুরগী বসে আছে নিচের দিকের একটা বাড়ির পাশে। এই মুরগীর ছবি আজকের দিনে ছাপলে বহু হিন্দুরসনা লালায়িত হবে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলার প্রবৃত্তি ছিল না আগেই বলেছি। দূরে পাহাড়ের গায়ে বহুদূর বিস্তৃত একটি শাদা মেঘের স্তর ছিল। সে যেন ঘুমিয়ে আছে মেঘের কোলে।

ফেরবার পথে এক জায়গায় দোকান ঘরগুলোর পাশ দিয়ে পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে দেখি ছ সাত জন পাহাড়ী মাতা ছেলে কোলে নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কেউ স্তন্য পান করাচ্ছে। এ অবস্থায় এদের ছবি তোলা সম্ভব কিনা আমরা আলোচনা করছিলাম, এমন সময় আমাদের মুখপাত্র অতুলানন্দ তাদের মধ্যে গিয়ে এক বক্তৃতা দিল, তারা ফোটো তোলার ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই নিল, কোনোই আপত্তি করল না, বরঞ্চ যথাসাধ্য আমাদের সাহায্য করল।

এদের ছবি তুলছি এমন সময় একটি আধুনিকা পাহাড়ী মহিলা কোত্থেকে ঝড়ের মতো এসে পড়ল আমাদের কাছে। সে তো ক্যামেরা দেখে মহা খুশি ! সঙ্গে তার একটি কুকুর ছিল সেও লেজ নাড়তে লাগল ! মহিলাটির ঘরের সামনেই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, সে তালা খুলে তার কতরকম ফোটো তোলা আছে ঘরে ডেকে নিয়ে দেখাল। আমি বললাম, আমিও তোমার একখানা ছবি তুলি। সে তৎক্ষণাৎ কুকুরটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শ্যামবর্ণ চেহারা, উঁচু নাক, চোখ দুটি বড় এবং বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে বরাবর ইংরেজীতেই কথা

বলল আমাদের সঙ্গে। ছবির লোভ তার খুবই বেশি, সুতরাং তার ঠিকানাটাও আমাদের হাতে দিয়ে দিল। নাম তার লামাইন। কলকাতায় ফিরে তার দুখানা দুরকম ফোটো, এবং তার প্রতিবেশী মাতা-শিশুর যতগুলো ছবি নিয়েছিলাম তার একখানি করেও একসঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যদিও তারা কেউ চায়নি। ফোটোগুলো পেয়ে সে তখুনি বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করেছিল ভাঙাভাঙা ইংরেজীতে।

এখানকার পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে কুয়াসায় দিক দিগন্ত ছেয়ে গেল। কুয়াসার মোটামোটা দানাগুলো এত স্পষ্ট যেন ওগুলো মরুঝড়ের বালুকণা। এই কুয়াসার আবরণে যেন কার্সিয়াং নাট্যের যবনিকাপাত হল, আমরা সোজা ফিরে এলাম ধরমশালায়। এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করতেই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হল দীর্ঘ মেয়াদে। আকাশ যেন নিতান্ত কৃপাবশতই আমাদের জন্য তিন ঘণ্টা কাল মেঘের আবরণ খানা খুলে দিয়েছিল।

হিমালয় বাসের হ্রস্ব মেয়াদ ফুরিয়ে এলো। এসেছিলাম পাথরের মায়ায়। যাবার সময় দেখি পাহাড়ী মানুষগুলোই আমার মনকে বারো আনা দখল ক'রে আছে। তখন যেন স্পষ্ট দেখলাম, এদের জন্যই তো হিমালয়ের মতো এমন বিরাট একটি চিত্রপট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি পাথরে এদেরই পায়ের ছাপ আঁকা, তাই তো হিমালয় এমন সুন্দর।···

কিছুক্ষণ পরেই বিছানাপত্র বেঁধে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। ট্রেন আসা পর্যন্ত বৃষ্টি থামল না। তিনটি 'রাজকন্যা' আমাদের মোট বহন ক'রে স্টেশনে পৌছে দিল। ধরমশালার গেট পর্যন্ত তারা এসেছিল, উপরে ওঠেনি। উপরে ওঠা কিছুকাল হল তাদের নিষেধ হয়ে গেছে। পথে রাজকন্যাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, "এক শালা বাঙালী" ধরমশালায় তাদের একজনের সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার করেছিল, সেই থেকে এই নিষেধ। বাঙালী চরিত্র স্মরণ ক'রে সেই সময় চুপ ক'রেই গেলাম। কুলী মেয়ে বাঙালীকে "শালা বাঙালী" বলছে, তাতে বোঝা গেল পাহাড়ীদের মধ্যে বাঙালী তার জঘন্যতম রূপটিই প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছে এতদিনের মেলামেশায়। (১৯৪৪)

হাজারিবাগের পথে

আজকের দিনে অন্তত পক্ষে ইউরোপ ভ্রমণ না লিখলে ভ্রমণ-কাহিনী লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু পাঠক বিশ্বাস করুন, বহুবার ইউরোপ যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আলোচনা করছিলাম যুদ্ধপিষ্ট মনকে এইবার অন্তত কয়েক দিনের জন্য শহরের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া দরকার। এত দিন যখন তখন সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে গর্তে প্রবেশ ক'রে ক'রে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে, নিয়ন্ত্রিত অন্নবস্ত্রে, নিয়ন্ত্রিত চলাফেরায়, কয়েদীর মতো জীবন কাটানো গেছে, এবারে মুক্তিদিবস পালন করা দরকার।

মাসতিনেক ধরে আলোচনা করা গেল কোথায় যাওয়া যায়। পৃথিবীর ম্যাপ খুলে ভাল ভাল জায়গা চিহ্নিত করেছি তিন মাস ধরে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে ম্যাপখানা যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে এলো, কোনো জায়গার নাম আর স্পষ্ট পড়া যায় না, তখন ঠিক হল হাজারিবাগ যেতে হবে। যুক্তিগুলো ছিল সবই হাজারিবাগের অনুকূলে। কিন্তু সে সব যুক্তির স্বরূপ প্রকাশ করবার আগে আমি এই ভ্রমণ-কাহিনী আদৌ লিখছি কেন তার অনুকূলে কিছু যুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সর্বজনপরিচিত স্থানের ভৌগোলিক বিবরণেও অভিনবত্ব থাকবার কথা নয়, অতি পরিচিত পথ-যাত্রাতেও অভিনবত্ব কিছু নেই। কিন্তু আমরা যারা এক সঙ্গে এই অতি সাধারণ ভ্রমণ সাঙ্গ করেছি, সেই আমরা বিহারের মাটি-জল-হাওয়া-অরণ্য-পথ-প্রান্তরের সঙ্গে মিশে যদি একটি গল্প রচনা করি, তাহলে তা হবে নিতান্তই আমার নিজস্ব নিবেদন, যা কোনো টাইম টেবল, গাইড বুক বা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এটাকে ভ্রমণকাহিনী হিসাবে না দেখে শুধু কাহিনী হিসাবে দেখলে এর মধ্যে অসঙ্গতিও হয় তো কিছু পাওয়া যাবে না।

হাজারিবাগ যাওয়া স্থির করলাম তার প্রধান কারণ স্থানটি ইউরোপের মতো বহু দূরে নয়। দ্বিতীয়ত সেখানে র‍্যাশন-প্রথা নেই। তৃতীয়ত হাজারিবাগ রোড স্টেশনের প্রায়-সংলগ্ন একটি দখল-উপযোগী খালি বাড়ি আছে, এবং সে বাড়ির কলকাতাবাসী মালিক শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে সুধাংশুপ্রকাশ ইচ্ছে করলেই চাবি চেয়ে নিতে পারে। আরও আকর্ষণ ছিল। আমাদের সঙ্গী রবির বাড়ি ছিল হাজারিবাগ শহরে—আমারও নিমন্ত্রণ ছিল দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে, সুতরাং রোড স্টেশন ছেড়ে শহরে গেলেও নিরাশ্রয় হব না, এ কল্পনাটি ভাল লাগল।

রোড স্টেশনের খালি বাড়িতে গিয়ে নিজেদেরই রান্না ক'রে খেতে হবে এই হল ব্যবস্থা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রাচুর্যের প্লাবন বয়ে যাবে, চার্চিলের যুদ্ধকালীন এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও হাজারিবাগের মতো জায়গায় গিয়ে হঠাৎ যদি চাল ডাল না পাই, এই আশঙ্কায়-সুধাংশুপ্রকাশ নির্দেশ দিল সঙ্গে অন্তত এক দিনের মতো চাল ডাল চা চিনি ইত্যাদি নিয়ে যেতে হবে। যাবার তারিখ ঠিক করা হ'ল ১২ই এপ্রিল শুক্রবার। সুধাংশুপ্রকাশ রেল-কম্পানির লোকদের কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে জেনেছে শুক্রবার বম্বে মেলে ভিড় কিছু কম থাকে। তার কারণ শুক্রবার মাড়োয়ারী সম্প্রদায় নাকি স্থানান্তরে প্রায় যায় না।

রাত আটটায় সুধাংশু এক ফীটনে চেপে আমাদের বাড়ির সম্মুখে এসে হাজির হল। আমি ব্যাগ বিছানা নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি সে এক মহাকাণ্ড! সুটকেস্ আর তার বিছানার বাণ্ডিলে ইতিমধ্যেই সে গাড়িতে স্থানাভাব ঘটেছে। কোনো রকমে সব ঠেলেঠুলে একটুখানি জায়গা করা গেল। আমার বিছানা ব্যাগ উটের পিঠের শেষ বোঝার মতো সসঙ্কোচে চাপিয়ে দিলাম সেই উষ্ট্র-পৃষ্ঠাকার বোঝার উপর।

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সমস্ত কি?"

সুধাংশু গম্ভীর সুরে বলল, "র‍্যাশন, বাসন এবং বসন।"

ট্রেনের মধ্যে ভিড় মোটামুটি ভালই হল, কিন্তু তখনও অসহ নয়। আমি এবং রবি দুই বিছানা এক ক'রে তাতে বসলাম। কিরণ এবং সুধাংশু পৃথক

বিছানা বিছিয়ে দু'খানি বেঞ্চি দখল করল। বিছানা বিছিয়ে নেবার মতো অবস্থা তখনও ছিল। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই ভিড় বাড়ছে, এবং পৌনে দশটায় আমাদের দু'জনের এক বিছানা আধ-বিছানায়, এবং দশটায় সেই আধ-বিছানা সিকি-বিছানায় পরিণত ক'রে দু'জনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে চাপা পড়লাম। সুধাংশু এবং কিরণ গাড়িতে উঠেই শুয়ে পড়েছিল এবং ভান করতে করতে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যাত্রীরা আশ্চর্য রকমের ভদ্র মনে হল, তাঁরা নিজেরা তাঁদের মালপত্রের উপর বসে রইলেন, অনেকে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকে ঘুমন্ত দুটি যাত্রীর পাশ দিয়ে সার বেঁধে বসে গেলেন, তবু এদের উঠিয়ে দিলেন না।

যুদ্ধের শেষ তিন বছরের মধ্যে কখনও ট্রেনে চড়বার সুযোগ হয় নি, শুনে-ছিলাম ট্রেনে ওঠা যায় না। এতদিন পরে যুদ্ধোত্তর ভিড় দেখলাম। অবস্থা এর চেয়ে তখন কত খারাপ ছিল কল্পনা করা শক্ত হল। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায়, পথে ঘাটে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, সর্বত্র চরমতম দুর্দশা ভোগ আমাদের জাতিগত শিক্ষা, শুধু আমরা এর প্রতিকার-চেষ্টার অসুবিধাটুকু ভোগ করতে চাই না।

গাড়ি ছুটে চলেছে বম্বে-মেলোচিত বেগে। আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে সুধাংশুর ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ-বোজা অবস্থাতেই নিজের কৃতিত্ব স্মরণ ক'রে বেশ গর্বের সঙ্গে আমাকে ডেকে বলল, "বলেছিলাম না, শুক্রবারে ভিড় কম হয়?" বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

রবি এবং আমি পাশাপাশি। আমরা দুজনেই ক্ষীণকায়। যাত্রীর চাপে আমাদের উভয়ের দেহাস্থি পরস্পরকে বিঁধতে লাগল, এবং ট্রেনের ঝাঁকানিতে মনে হল যেন তা থেকে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে। ভয় হল আগুন ধরে না যায়। কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করছি যাতে ঘুমের ভিতর দিয়ে এই অবস্থাটি উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল ক্যামেরা, সেটাকে কোলের উপর চেপে রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম বসে বসেই। সাফল্যও কিছু লাভ হল। এইভাবে মাঝে মাঝে ঘুমোচ্ছি, মাঝে মাঝে জাগছি। গাড়ি বর্ধমান

ছাড়বার সময় মনে হল—এইবার দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। একখানি গাড়িতে এত ভিড় সত্যই অসহ্য। কিন্তু নিত্য যাদের গাড়ি চড়া অভ্যাস, তারা এই অবস্থাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পারে। যেখানে এক ইঞ্চি সরা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল সেখানে ভিড়-অভ্যস্ত যাত্রীর চলাফেরার কৌশল দেখে বিস্মিত হলাম। ঘটনাস্থল আসানসোল, সেখানে ফেরিওয়ালাদের একজন 'কেলা' 'কেলা' ক'রে চিৎকার করতেই তার চতুর্গুণ বেশি তীব্র সুরে হঠাৎ আমার পায়ের নিচে থেকে কে 'কেলা' 'কেলা' করে চেঁচিয়ে উঠল। চেয়ে দেখি একটি মাথা বেরিয়ে আসছে বেঞ্চির নিচে থেকে। মাথাকে অনুসরণ ক'রে একটি দেহ বেরিয়ে আসতে লাগল কচ্ছপের ভঙ্গিতে। কি আশ্চর্য কৌশলে ভদ্রলোক বেঞ্চির নিচে প্রবেশ ক'রে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন তা দেখি নি। তিনি বেরিয়ে এলেন আর এক যাত্রীর পিঠের উপর দিয়ে। উঠে দাঁড়ালেন একজনের পায়ের উপর। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল আর একজনের পিঠের উপর। তারপর বাংকের শিকল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে শূন্য পথে তিন জন যাত্রীর মাথা ডিঙিয়ে দুখানা পা নামালেন একজনের ঘাড়ে। সেখান থেকে দরজা ধ'রে, দরজার পাশে দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কলাওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "জোড়া কত?"

"জোড়া চার পয়সা।"

কলা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললেন, "এই কলা চার পয়সা? দু পয়সা হবে?"

কলাওয়ালা কোনো কথা না বলে কলা ফিরিয়ে নিয়ে আবার 'কেলা'-ধ্বনি তুলে এগিয়ে যেতে লাগল। ভদ্রলোকটিও পূর্বভঙ্গির সবগুলো অনুকরণ ক'রে ফিরে এলেন যথাস্থানে এবং বেঞ্চির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটা গণ্ড-গোলের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু দেখলাম কোনো যাত্রীই তাঁকে কিছু বললেন না।

ট্রেনের মধ্যে আমরা দেখেছি বাঙালী যাত্রীরা অধিকাংশই হিন্দি বলায় বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু ভাল হিন্দি জানি বা না জানি, আমরা বাংলাদেশের মধ্যে

থেকেও যে-কোনো উপলক্ষে হিন্দি বলবার চেষ্টা করি, বাইরে এলে তো কথাই নেই। সেটা হিন্দি হয় কিনা তা অবশ্য ভাষাভিজ্ঞ বলতে পারেন, কিন্তু সেটা বাংলা নয় বলে আমরা তাকেই হিন্দি বলে জানি। বাঙালী উড়িষ্যায় গিয়ে ওড়িয়াদের সঙ্গেও হিন্দি বলতে চেষ্টা করে, দার্জিলিঙের পথে বাঙালীর সঙ্গেও বাঙালী হিন্দি বলতে চেষ্টা করেছে দেখেছি। সুতরাং হাজারিবাগে এসে এখানকার লোকদের সঙ্গে আমরা যে বাংলা বলব না এ একরকম নিশ্চিত। রবি কিরণকে আগে থাকতেই সাবধান ক'রে দিল এই বলে যে যদি তাকে হিন্দি বলতেই হয় তা হলে তার নিজস্ব হিন্দিকে একটু পরিবর্তন করা দরকার হবে। কারণ তার মুখে ইতিপূর্বে দু-একবার আমরা হিন্দি শুনেছিলাম।

কিন্তু হাজারিবাগে এসে আমরা সবাই এ বিষয়ে জব্দ হয়ে গেলাম।

যে বাড়িতে এসে উঠলাম, সে বাড়ির রক্ষক বুধনকে আগে থাকতেই চিঠি দেওয়া ছিল। ভোরবেলা আমরা সেখানে পৌঁছে বুধনকে ডাকতে লাগলাম। ডাক শুনে বেরিয়ে এলো তার দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এবং তার মতোই আরও দুটি ছেলে। রাত্রে এরাই বাড়ি পাহারা দেয়। বুধনের ছেলে আমাদের হাতে ঘরের চাবি দিল, আমরা গৃহে প্রবেশ করলাম। এদের সঙ্গে হিন্দি বলতে গিয়েই আমরা প্রথম নিরাশ হই। আমাদের কথার উত্তরে তারা প্রত্যেকেই পরিষ্কার বাংলায় সব বলতে লাগল—একেবারে বাঙালী ছেলের মতো। অথচ তারা সবাই বিহারী এবং হাজারিবাগের বাসিন্দা। এর পর থেকে কোথায়ও আর হিন্দি বলবার সুযোগ আমাদের হয় নি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা চা খেয়ে এলাম স্টেশনের স্টল থেকে। তারপর রান্নার আয়োজন। সুধাংশু তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করল। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম, রুটি, মাখন, নানাবিধ মশলা, তেল, নুন, লঙ্কা, থালা, ঘটি, গেলাস, কেটলি, চা, চিনি, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, একে একে বেরোতে লাগল তার সুটকেস আর বিছানার বাণ্ডিল থেকে। পর পর জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখতে অর্ধেক ঘরের জায়গা লাগল। সুটকেসটি যেন গণপতির ম্যাজিক বক্স। তা থেকে সর্বশেষ নিষ্কাশিত হল প্রকাণ্ড একখানা ছুরি।

রান্নার জন্য বাদবাকী সব জোগাড়ের ভার ছেলে দুটির ঘাড়ে চাপিয়ে আমরা বেড়াতে বেরুব পরামর্শ করতে লাগলাম। বাড়িটি স্টেশনের বিপরীত দিকে—কিন্তু মাঝখানে পাহাড়ের মতো রেললাইন বরাবর উঁচু ঢিবি থাকাতে স্টেশনটি এখান থেকে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ ঘেরা জায়গাটিতে বসে বড়ই অস্বস্তি বোধ হওয়ায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। গ্রীষ্মকাল হওয়া সত্ত্বেও এখানে বেশ শীত করছিল, পথের দুধারের ঘাস শিশিরে ভেজা, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাড়ির পিছন দিকে বুধনের বাড়ি। সেখান থেকে খোলা মাঠের দৃশ্য অতি চমৎকার। সেই দিকে চাষের জমির আলের উপর দিয়ে দিয়ে যেতে বেশ লাগছিল।

ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু এই বেড়ানোর ফল হল অতি বিস্ময়কর। প্রত্যেকেই খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছি এরই মধ্যে। বিনাবাক্যব্যয়ে রুটি মাখন ইত্যাদি একেবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের মতো পেটভরে খেয়ে তবে কিছু শান্ত হলাম।

জায়গার গুণে খিদে বাড়ে এটা প্রচলিত কথা। কিন্তু জায়গার গুণ এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের পাকস্থলীতে এমন উগ্রভাবে প্রকট হয় কি ক'রে তা ভেবে দেখবার মতো। একটা ইনকিউবেশন পীরিয়ডও তো থাকা দরকার। আমার মনে হয়, শুধু জায়গার গুণ বললে অর্ধেক সত্য বলা হয়। কারণ, নতুন পরিবেশে প্রতিদিনের অভ্যস্ত একঘেয়ে জীবনের বাইরে এলে নতুনকে গ্রহণ করবার জন্য ক্ষুধাতুর মন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং তারই ফলে দেহমন দুইই সম্পূর্ণ বদলে যায়, দুইয়েরই স্বাস্থ্য ফিরে আসে—এবং একটু বেশি পরিমাণেই আসে নতুনত্বের প্রথম ঝোঁকে। নইলে চারজন শহরবাসী পরিমিত-ভোজী ব্যক্তি তাদের এক দিনের পুরো র‍্যাশন এক বেলায় একেবারে কণাহীন-ভাবে নিঃশেষ ক'রে ফেলল কি ক'রে? এরই ফলে নতুন জায়গার নৈসর্গিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় গ্রহণের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমাদের চার জনের মনে সমস্বরে যে ঐকতান বেজে উঠল তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে ধ্বনিত ও বিস্তারিত হতে দেখা গেল একই দিকে—হাজারিবাগ রোডের চালের আড়তের দিকে।

ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমরা এসেছি এ খবর যাদের জানবার তারা কি ক'রে জেনে ফেলেছে। কাঠওয়ালী এলো কাঠ বেচতে, তরকারিওয়ালী এলো তরকারি বেচতে—ঘরে বসেই সব মিলতে লাগল এবং আমরা রাত্রের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা ক'রে ফেললাম যা-কিছু দরকার সব কিনে। ভাবনা রইল মাছের, কিন্তু মাছও এসে গেল বাড়ির উপরেই। রুইমাছ দেখে কিরণকুমার উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশ্ন করল "সের কেতনা কর্কে?" মাছওয়ালা জবাব দিল, "আজ্ঞে একটি মাছ আছে, দু'সের হবে, আড়াই টাকা লাগবে।" পরিষ্কার বাংলা কথা। তার মানে মাছ-বিক্রেতা বাঙালী; গোমো থেকে এসেছে মাছ বেচতে।

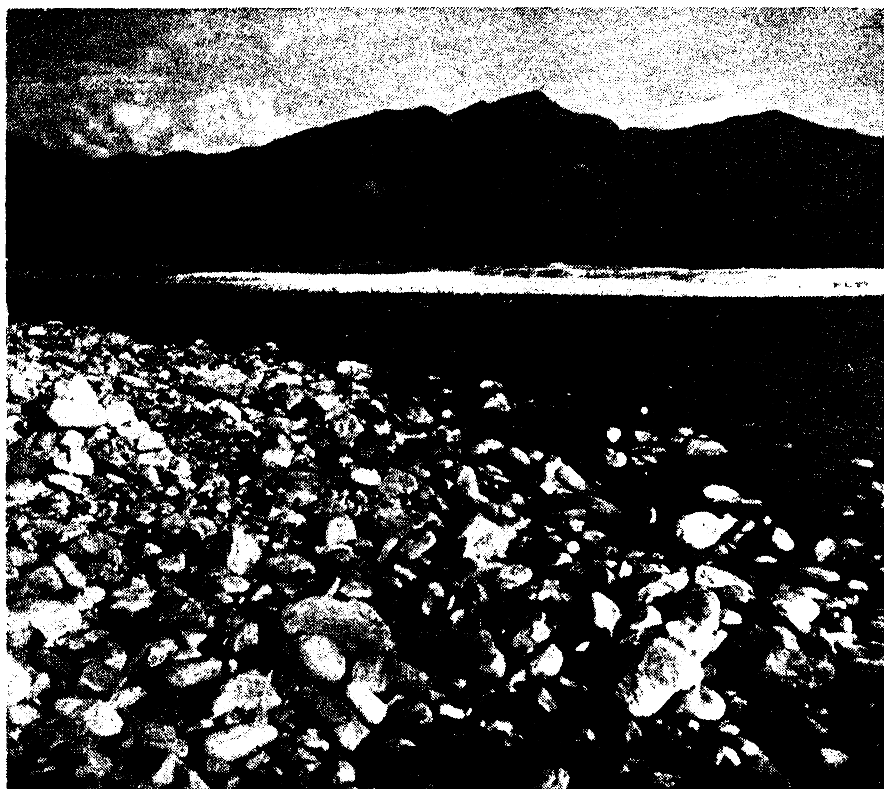
কেরোসিন তেলের জন্য দোকানে একখানি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলাম। ঐ সঙ্গে ইংরেজী বাংলা সব রকম খবরের কাগজও কিনতে বললাম। তেল পাওয়া গেল, কিন্তু খবরের কাগজের বদলে পেলাম একখানা চিঠি। বাংলায় লেখা, বেশ বড় চিঠি। এজেণ্ট লিখছেন, "আজকের কাগজ পড়া মানে কাল কলকাতায় যা পড়েছেন তাই, সুতরাং কেন অকারণ কাগজ কিনবেন।" এইটিই হল সে চিঠির মূল কথা। এজেণ্ট নিশ্চয় ছোকরাদের কাছে শুনেছেন যে আমরা সেই দিনই কলকাতা থেকে এসেছি। কিন্তু তাঁর যে কথাটি লেখা উচিত ছিল তা হচ্ছে এই যে কাগজ সবই ফুরিয়ে গেছে, একখানাও নেই। পরদিন অবশ্য কাগজ পাওয়া গিয়েছিল।

রান্না শেষ করতে করতে বেলা দুটো বেজে গেল। রাত্রের জন্যও মাছ ডাল তরকারি রান্না ক'রে রাখা হল। রান্না শেষে স্নান। কিন্তু ইঁদারার জল কনকনে ঠাণ্ডা। আমার বরাবর গরম জলে স্নান করা অভ্যাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেই সর্দি, কিন্তু এখানে গরম জলের অসুবিধা হওয়ায় অগত্যা সেই ঠাণ্ডা জলেই স্নান করতে হল। ইতিমধ্যে পেটে এমন আগুন জ্বলে উঠেছে যে খেতে বসবার আগে স্বাস্থ্যবিধি চিন্তা করবার সময় ছিল না। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক হাঁড়ি ভাত শেষ হয়ে গেল এবং ঐ সঙ্গে রাত্রের জন্য যা কিছু রান্না হয়েছিল তারও চিহ্নমাত্র রইল না, এবং খাওয়া শেষ করতে না করতে



রামগড়ের নিকটস্থ একটি পুরাতন শিব মন্দির

(হাজারিবাগের পথে দ্রষ্টব্য)



রায়ডাক নদীর বুকে

('ডুয়ার্সের পথে' দ্রষ্টব্য)

রাত্রের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। যেন শুধু এই জন্যই এখানে আসা। কিরণ বলল তাতেই বা ক্ষতি কি? কলকাতায় খেতে পার না, এখানে খেতে পারছ, অতএব দিন রাত কেবল খেতে থাক।

আকাশে একটু একটু ক'রে মেঘ জমছিল, বেলা চারটে আন্দাজ সময়ে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাড়ির বাইরে পাহাড়ের জন্য দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আশেপাশের বাড়িগুলোতে জনমানবের চিহ্ন নেই, এমনি সময়ে রীতিমতো প্রবাস-জনোচিত মনোভাবের উদয় হয়। আবহাওয়া ছিল তার সম্পূর্ণ অনুকূল। নিজেকে সত্যই নির্বাসিত মনে হচ্ছিল সে সময়। সে অনুভূতিতে বেদনা ছিল, কিন্তু আনন্দও ছিল। পাশের বাড়ির একমাত্র পেঁপেগাছগুলো দেয়ালের উপর মাথা তুলে বৃষ্টির ছন্দে পাতা নাচাচ্ছিল—বৃষ্টি ভিন্ন সমস্ত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে তখন অতিরিক্ত ঐটুকুই মাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু এ তো নিতান্তই বাইরের জিনিস। মন ভুলল না ঠিক মতো। একটি গভীর নৈরাশ্য একটি মাত্র বৃহৎ প্রশ্নের আকারে সবারই চিত্তকে উতলা ক'রে তুলল, সবারই মনে এক প্রশ্ন—এ বেলা খাওয়া হবে কি?

এমন সময় কোথেকে এক ছাগশিশু দৌড়ে এসে ঢুকে পড়ল আমাদের ঘরে। আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হল প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। কিরণ এক লাফে বিছানা থেকে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। এমন বৃষ্টির দিনে এই বস্তুই আমরা যেন মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম। মধ্য-কলকাতাবাসী রবি মধ্যাহ্ন-রবির মতো দীপ্ত হয়ে উঠল আনন্দের উগ্রতায়। সুধাংশু খুব বিরক্তির সঙ্গে বলল আমি কিন্তু মশলা বাটতে পারব না, কিরণ যদি রাজি থাকে তা হলে রান্না করতে রাজি আছি। রবি বলল, বুধনকে বললেই সে ক'রে দেবে—হত্যা থেকে মশলা বাটা সব।

কাজটা যে এত সহজ তা আমাদের কারও মাথায় আসেনি। তাড়াতাড়ি আরম্ভ পর্ব শেষ ক'রে ফেলবার জন্য রবি অধীর হয়ে উঠল। এমন সময় বুধনের কণ্ঠস্বর:

"ছাগল বাচ্চাটা গেল কোথায়?"

রাত বারোটায় সেদিন এক বাটি ডাল দিয়ে চারজনে এক হাঁড়ি ভাত খেয়েছিলাম, খারাপ লাগে নি কিছু।

পরদিন খুব সকালেই আবার বৃষ্টি শুরু হল, সকালে আর বেড়ানোর আশা রইল না। মেঘ কাটতে কাটতে বেলা দশটা বেজে গেল। কিন্তু হাওয়া ঠাণ্ডা ছিল বলে অত বেলাতেও বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বাজারের দিকে। বাজারের চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন, বিশেষ ভাল লাগছিল না, তবে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানোতে ক্লান্তিও ছিল না কিছু। বাজার থেকে বেরিয়ে রেল-লাইন পার হয়ে ধানোয়ার রোডের মুখে এসে খানিকটা চুপচাপ বসে রইলাম। সেখানে বড় বড় গাছের নিচে বিশ্রামরত কয়েকটি লোককে দেখা গেল – তারা ময়ূরের পালক বিক্রি করতে যাচ্ছে। সঙ্গে একশটি পালকের এক একটি আঁটি। দাম বলল ছ'টাকা আঁটি। কলকাতায় বোধ হয় ওগুলো পনের বিশ টাকা। ধানোয়ার রোড এখানকার সবচেয়ে প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন পথ। দীর্ঘও কম নয়। কিন্তু তখন আর সে পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা, ফিরে গিয়ে রান্না ক'রে খেতে হবে। বাজার থেকে চাল এবং ডাল আনিয়ে রাখা হয়েছিল, তরকারি বাড়ির উপরেই কেনা ছিল, মাছ আর সেদিন জুটল না।

সাত-আট দিনের জন্য বাইরে এসে আমরা সাত-আট মাসের আনন্দ ঐ অল্প দিনের মধ্যে উপভোগ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথমেই খাওয়া-শোয়ার সময় সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে মনে হতে লাগল যেন আমরা একেবারে নতুন জীবন লাভ করেছি। শুধু হাওয়া পরিবর্তন নয়, সমস্ত অভ্যাসের পরিবর্তন। দুদিনেই সমস্ত দেহে একটা সজীবতা অনুভব করতে লাগলাম—একটা নতুন শক্তি, একটা নতুন কর্মোদ্যম এবং উৎসাহ, যা অত অল্প সময়ে লাভ করা যায় কিনা জানা ছিল না।

সেই দিন বিকেলে আবার ঝড়বৃষ্টি। আকাশ পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সমস্ত আকাশে সাপের মত খেলে বেড়াচ্ছে। ঝড় উঠে এলো অতি প্রবল বেগে। এমন প্রবল ঝড় বহুদিন দেখি নি। সমস্ত আকাশ জুড়ে একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি—বাঁশির করুণ সুরের মতো একটানা বেজে চলেছে।

ঝড়ের গর্জনে, বৃষ্টির শব্দে, বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা শিখায় মন মেতে উঠল। হাজারিবাগ রোডের সেই পাকস্থলীপীড়ক আবহাওয়া সহসা যেন সেই মুহূর্তে পার্থিব সব কিছুকে সেই ঝড়ের মুখে উড়িয়ে দিল। কিরণ বহুকাল পরে চিৎকার ক'রে রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।

রাত্রি আটটায় ঝড়বৃষ্টি থামলে সুধাংশু প্রস্তাব করল এইবার একটা নতুন পথে বেড়ানো যাক। আকাশের ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা দিচ্ছে—পথে কিছু জল জমেছিল—কিন্তু সে অতি সামান্য। আমরা স্টেশনের ওভার-ব্রিজের কাছ থেকে সোজা পূব দিকে রওনা হলাম। দু'মিনিটের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা নতুন রাজ্য আবিষ্কৃত হল সেই পুরানো জায়গায়। এমন অপূর্ব সুন্দর পথ থাকতে আমরা দিনের বেলা বৃথা ঘুরেছি বাজারের দিকে। পথের দুধারে বাড়িগুলো ছবির মতো সাজানো। চাঁদের আলোয় বাড়ির গায়ে লেখা নামগুলো পড়া যাচ্ছিল, সমস্তই বাংলায় লেখা বাঙালীদের বাড়ি। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই লতাকুঞ্জ ফুলের গাছ এবং দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছের সারি, সেই ঝাপসা চন্দ্রালোকে অপরূপ মনে হচ্ছিল। এই দূর দেশে এত বড় একটা বাংলা পথে চলতে ভাল লাগল।

পথের শেষে একটি বাঁক ঘুরেই উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে পড়লাম। উঁচুনিচু জমি, পথের ধারেই গভীর খাল, বর্ষায় স্রোত বয়ে যায় তার ভিতর দিয়ে। বহু দূর বিস্তৃত প্রান্তর, ঘন জঙ্গলপূর্ণ। যে পথে চলছিলাম সে পথটি বেশ প্রশস্ত, গোরুর গাড়ির চাকার চাপে গর্ত হয়ে তাতে জল জমেছে। রাত্রি নটা, পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য। যত এগিয়ে চলেছি ছোট ছোট শালগাছের ভিতর দিয়ে, ততই যেন জঙ্গলের গভীরতা বাড়ছে। আবছা চাঁদের আলোয় সমস্ত জগৎ স্বপ্নাচ্ছন্ন। আমরা অবিরাম এগিয়ে চলেছি, কিন্তু পথের শেষ কোথায়? কিন্তু শেষ না থাক আমরা চলা থামাব না, আমাদের মন সেই স্বপ্নে ডুবে গেছে, আমরা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে চলেছি জনহীন অরণ্যপথে।

রবি বলল, এই দিকটায় খুব বাঘ চালফেরা করে সেই জন্য এ সময়ে এ পথে কেউ চলে না।

হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে উল্টো দিকে ফিরলাম। কিন্তু এ পথের মায়া মনকে অধিকার করেই রইল সর্বক্ষণ এবং পরদিনই বিকেলে আবার রওনা হলাম সেদিকে। সোনাসুত বা স্বর্ণসূত্র নদী আমাদের লক্ষ্যস্থল হল। পূর্বদিন জ্যোৎস্নার আলোয় পথের ধারে বাড়িগুলোর যে সৌন্দর্য দেখেছিলাম, দিনের আলোয় আর তা তেমন অপূর্ব সুন্দর মনে হল না। সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রায় থাকে না। সব বস্তুরই অবশ্য একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে বস্তু যেখানে মনের উপকরণ-মাত্র, তার বিশুদ্ধ উপকরণরূপের মধ্যে মনোহারিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

আমরা এই পথের শেষে একটি বাঁক ঘুরে অরণ্যপথে গিয়ে পড়লাম।

উঁচুনিচু জমির উপর দিয়ে, ছোট ছোট শালগাছের মধ্য দিয়ে, সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গায় এসে উঠলাম। বহুদূর সমতল ভূমি, প্রকাণ্ড পথ। পথের পাশে জোড়া-অশ্বথ গাছ। পথের ডান দিকে যে অরণ্য ছিল একটু দূরে, ক্রমেই তা কাছে এসে পড়ল, এবং আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে ধীরে ধীরে ঘন অরণ্যে প্রবেশ করলাম। সে পথও বেশ পরিচ্ছন্ন। দুধারের ঝোপও খুব নিবিড় নয়, পথের দুধারে ছোট ছোট কুলজাতীয় কাঁটা গাছ। প্রকাণ্ড যে পথটি আমরা ছেড়ে এলাম সে পথ দূরদিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সে পথের শেষে দিগন্তবলয় ঘিরে সবুজের সমুদ্র। দূরে ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। যদি সেই জনহীন শব্দহীন স্থানে বসে কেউ কল্পনা করে সে লক্ষ বছর পূর্বের পৃথিবীতে ফিরে গেছে তা হলে তা অসম্ভব মনে হবে না। কালের চিহ্নহীন প্রকৃতির উদার বুকে এই সীমাহীন মুক্তি মনকে অভিভূত না ক'রে পারে না। বিশ্ব কি বিরাট, আর তার বুকে মানুষ কত ছোট, কত অসহায়, এই বিস্মৃত সত্যটি এমনি অবস্থায় হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ শহরে থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে চার দিক দেখে শুনে হিসেব ক'রে এক এক ধাপ এগিয়ে চলি, একটু অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই, প্রতি পদে ধাক্কা সামলে চলতে হয়, এবং নিয়ন্ত্রিত চলাই আমাদের প্রকৃতিগত কিন্তু এখানে কোনো বিধিনিষেধ নেই,

পথে শুয়ে থাক, ঘুমিয়ে থাক, অথবা ছুটোছুটি ক'রে বেড়াও কেউ ঘণ্টা বাজাবে না, কোথাও কোনো নোটিস্ নেই—একেবারে দিগন্তবিস্তৃত স্বাধীনতা। এ রকম অবস্থা হঠাৎ কল্পনা করাই কঠিন। বিশ্বপ্রকৃতির এমন উদার রূপ সমস্ত সত্তা দিয়ে ঠিক এমনভাবে আর কখনও উপলব্ধি করি নি, শালবনের এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যেও আর কখনও প্রবেশ করি নি।

সূর্য প্রায় অস্তগামী, সমস্ত পরিমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি। আমরা সবাই নীরবে এগিয়ে চলেছি স্বর্ণসূত্র নদীর দিকে। নদীটি এ সময়ে একটি ক্ষীণকায় ধারামাত্র। বর্ষায় এর যতখানি বিস্তার হয় ততখানির জন্য বিছানা পাতা আছে। নদীপথ-রেখা শালবনের বুক চিরে এঁকেবেঁকে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। ক্যামেরাটি সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু অরণ্যের এই অনুভূতিসাপেক্ষ সৌন্দর্যের ছবি নেবার মতো দুঃসাহস তার হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যার মুখে উঠলাম সেখান থেকে। বেরিয়ে এসে খোলা পথের ধারে একটু না বসে পারা গেল না। সৌন্দর্যের অতিভোজে মন আমাদের অবসন্ন। সে অবস্থায় শহরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমরা একেবারে শুয়ে পড়লাম সেখানে।

কাঠবোঝাই গোরুর গাড়িগুলো সমস্ত দিনের শেষে ঘরে ফিরছে। চাকা ঘোরার সঙ্গে এক রকম তীক্ষ্ণ করুণ একটানা বাঁশির মতো শব্দ হচ্ছে তা থেকে। মজুরের দল কাঠকাটার কাজ শেষ ক'রে দূর অরণ্য থেকে ফিরছে দলে দলে। এদের ঝাপসা মূর্তি আকাশের বুকে আঁকা হচ্ছে একের পর এক। মেঘের বাধা কাটিয়ে চাঁদও দৃশ্যমান হয়ে এলো।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলাম এখানে শুয়ে। দূরে বিলীয়মান গোরুর গাড়ির চাকার শব্দ তখনও কানে আসছে। মজুরেরা তখনও ঘরে ফিরছে সে পথে। তাদের কোলাহল, গাড়ির চাকার করুণ শব্দ, এখানকার জল-মাটি আলো-হাওয়ার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। আমরাই এখানে বেসুরো। আমাদের শহুরে পোষাক যেন এখানকার সহজ সুরের তাল কেটে দিচ্ছে।

এই উপলব্ধি সেদিনকার সত্য উপলব্ধি।

এখানকার বাঘের ভয়ও অত্যন্ত সত্য।

এখানে ধানোয়ার রোডই সবচেয়ে প্রশস্ত মনে হল। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় এই পথে বেড়িয়ে এলাম। এ পথের দুধারেও অনেক বাঙালীর বাড়ি। এক মাইলের কিছু বেশি গিয়ে আমরা দুজনে একটা কালভার্টব্রিজের উপর বসলাম, আর দুজন আরও দূরে চলে গেল। পূব আকাশে কালো মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, সমস্ত প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা। পথে লোকজন তখন খুব সামান্যই চলছে। দু-এক জন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোক ও মহিলাকে দেখা গেল সেই অন্ধকার পথে দীর্ঘ দূর ভ্রমণ করতে। পথে যাবার সময় ডানদিকের বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি দেখলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাইন। উঁচু-নিচু পথ, লোকালয় ছাড়িয়ে শূন্য প্রান্তরের বুকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই অন্ধকারে, তা আর দেখা গেল না। হাওয়া বেশ জোরে বইছিল, আর কি ঠাণ্ডা সে হাওয়া, একটু বসতেই বেশ শীত করতে লাগল। এপ্রিল মাসের ষোল তারিখেও এখানে এমন ঠাণ্ডা থাকতে পারে তা ভাবতে পারি নি। শুনলাম সাধারণত এ রকম থাকে না, এবারেই শুধু গ্রীষ্ম আসতে একটু দেরি হচ্ছে।

আমাদের হাজারিবাগ রোডে থাকার এইটেই শেষ দিন। পরদিনই আমরা হাজারিবাগ শহরে যাব এই রকম আলোচনা করছিলাম, কিন্তু কে কোথায় গিয়ে উঠব সেই হল এক সমস্যা। প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে ওঠবার জায়গা আছে, কিন্তু হাজারিবাগের মতো শহরে সবাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে প্রত্যেকেরই মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, কারণ হাজারিবাগ শহরে এসে কি কি দেখব, কোন্ কোন্ জায়গায় যাব, তার কোনোটাই আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ছিল না, প্রতি মুহূর্তে আলাপ-আলোচনা ক'রে সে সব ঠিক করছিলাম। সেজন্য সব সময়েই আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার, অন্তত কাছাকাছি। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে ওঠবার একটা দায় ছিল আমার, কেননা তাঁর নিমন্ত্রণ আমি বহু পূর্বেই গ্রহণ করেছিলাম। শহরে যেখানেই উঠি, তাঁদের বাড়িতে অন্তত এক দিনের জন্যও আমাকে থাকতে হবে এটা প্রায় ঠিক ছিল। সমস্যা

হল কি ক'রে সবাই কাছাকাছি থাকা যায়। এ সমস্যার একটা মীমাংসাও হয়ে গেল। ধানোয়ার রোডে আমাদের সান্ধ্যভ্রমণের শেষে আকাশে মেঘের আড়ালে যে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, সে চাঁদ দৃশ্যমান হতে দেরি হল বটে, কিন্তু তার আগে এই পথে যাত্রারম্ভে আর এক চাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে হাজারিবাগ শহরের সমস্যাটা সমাধানের একটা কিনারায় এসে গেল। চাঁদ রবির বন্ধু। তিনিও পরদিন সকালে শহরে যাবেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁদের বাড়িতে উঠতে হবে এই রকম অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাকে অনুরোধ না বলে প্রায় আদেশ বলা চলে। আমি যে অন্যত্র উঠব তা তখন আর তাঁকে বললাম না।

আমরা সেই রাত্রেই স্টেশনে এসে বাস্ কম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা বলে সীট রিজার্ভ ক'রে এলাম। স্টেশন থেকে ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রথমে যে বাস্ শহরে যায় তাতে যাওয়া সম্ভব হল না, কারণ যে সব ট্রেন-প্যাসেঞ্জার একেবারে হাজারিবাগ শহরের টিকিট কেনে তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে এই মোটর কোম্পানি বাধ্য। সে রকম প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কত হবে তা না দেখে এরা আগে কোনো কথা দিতে পারে না। সেজন্য আমরা দ্বিতীয় আর একটি বাস্ কম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম। এরা হচ্ছে মাড়োয়ারি মোটর-প্রতিষ্ঠান। শুনলাম এদের গাড়ি সকাল আটটায় ছাড়বে।

১৭ তারিখে যথাসময়ে এসে বাসে উঠলাম। তার আগে স্টেশনের দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। চাঁদবাবু আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ওখান থেকে প্রকাণ্ড এক মাছ সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বাসে। বাস ছাড়তে ছাড়তে সাড়ে আটটা হয়ে গেল। সে দিনও সকালে বেশ শীত ছিল, তাই কোনো কষ্টই হল না শহরের পথে এগিয়ে যেতে। সদাহাস্যময় চাঁদের সঙ্গ আমাদের সবাইকে পুলকিত করল, তিনি সমস্ত পথ নানা রকম গল্প ক'রে আমাদের পথশ্রম লাঘব করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও হাজারিবাগ শহরের পথে আমাদের অদৃষ্টে সে দিন যে সামান্য কিছু দুর্ভোগ ছিল তা তিনি খণ্ডন করতে পারলেন না। আমাদের বাহন-বাসখানা ঘণ্টাখানেক এগিয়ে

যাবার পরেই বিগড়ে গেল। শোনা গেল চাকা খুলে নতুন চাকা পরাতে হবে। সব শেষ হতে আধঘণ্টা লাগল। কিন্তু আবার কিছু দূর গিয়েই গাড়ির ইঞ্জিন আর চলে না। তখন যন্ত্রীরা ইঞ্জিন মেরামতের কাজে লাগল। এইভাবে, পথের মাঝখানে, বাসের সাধারণ থামবার জায়গার বাইরে, ইঞ্জিন ও চাকার গোলমালে আমাদের চার বার থামতে হয়েছিল। পথের মাঝখানে এ ভাবে অকারণ থামায় আমাদের অন্য কোনো রকম অসুবিধা হয় নি একমাত্র দেরি হওয়া ছাড়া। পথের দৃশ্য এতই চমৎকার যে ওর যে-কোনো জায়গায় নেমে কিছুকাল থেকে যেতে ইচ্ছে করে।

পথের দুধারে বড় বড় বটগাছ, নিমগাছ এবং আম গাছের সারি। কখনও শালবন, কখনও খোলামাঠ—দূরে ছোট ছোট পাহাড়। তার উপর বেলা বাড়ছে কিন্তু সে পরিমাণে গরম বাড়ছে না বলে আমাদের কোনো কষ্টই হচ্ছিল না।

বাংলাদেশ থেকে নতুন এ পথে এলে এ রকম অভিনব আবহাওয়া, এ রকম পাহাড়-অরণ্যের দৃশ্য, এ রকম চলতি পথের ক্রম পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য যে খুবই ভাল লাগবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ রকম তরঙ্গায়িত পাহাড়িয়া পথের কল্পনা বাংলাদেশে বসে করা যায় না। লোকালয়ের চিহ্নহীন উদ্দাম অরণ্য-শোভা প্রতিমুহূর্তে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলছিল মনের মধ্যে। সমস্ত আকাশ কালোমেঘে ছেয়ে গিয়ে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চললে নিজেকে যেমন পরিচিত জগৎ থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে হয়, এখানকার অরণ্যদৃশ্যেও মনে তেমনি উদাস করা এবং পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি গভীর বেদনামিশ্রিত আনন্দের উদয় হয়। অত্যন্ত আধুনিক কালের মোটর বাসে আমরা আধুনিক কালের যাত্রীরা শহরে চলেছি, এ ঘটনা নিতান্তই অবান্তর, নিতান্তই বাইরের। মনোজগতের বিরাটত্বের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ। নতুনকে হঠাৎ গ্রহণ করা বিষয়ে মনের কৃপণতা আছে বলে যে একটি কথা শুনতে পাওয়া যায় সে কথার কি কোনো দাম আছে? মন তো বিনা বাধায় এই আদিম পৃথিবীর উদ্দাম উদার রূপকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে

গ্রহণ করল। কিংবা এ চির পুরাতন, এরই সঙ্গে মনের চির আত্মীয়তা। তাই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম অপরিচয়ের বাধা ঘুচিয়ে জীবনের যে-কোনো লগ্নে বা তিথিতে অকস্মাৎ যদি তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো যায় তা হলে তাকে পরম আত্মীয় বলে চিনে নিতে তার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। কিন্তু বিদেশে নতুন পারিপার্শ্বিকে হঠাৎ যদি আমাদের দৈনন্দিন কাজের সহস্র স্মৃতিজড়িত অতিপরিচিত অফিস-গৃহটি আবির্ভূত হত তা হলে মনের অবস্থা কি হত তা কল্পনা করতে বেগ পেতে হবে না। অথচ আমাদের জীবনে অফিস কত সত্য!

হাজারিবাগ শহরে পৌঁছে আমরা বাস্‌-স্টেশন থেকেই পৃথক হয়ে গেলাম। চাঁদবাবু শেষ পর্যন্ত মাছের দোহাই পাড়লেন, বললেন শহরে এ রকম মাছ দুর্লভ, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমি একখানি রিক্‌শ নিয়ে দ্বিজেনবাবুর বাড়িতে এসে উঠলাম বারোটার কিছু পরে। রোড স্টেশন থেকে শহরে আসবার বাস্‌-পথ চল্লিশ মাইলের কিছু বেশি হবে। এতটা পথ এসেও মনে বা দেহে কোনো ক্লান্তি অনুভব করিনি এটা আমার মতো ক্ষীণজীবীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। আরও একটি ভয় ছিল, ভেবেছিলাম, চার দিন হাজারিবাগ রোডে কাটিয়ে নতুন জায়গার দৃশ্যে মনের ক্ষুধা যে পরিমাণে নিবৃত্ত হয়েছিল, পাকস্থলীর ক্ষুধা সেই পরিমাণে বেড়ে যাওয়াতে শহরে এসে বিপদে পড়ব, হয় তো অতিথি হিসাবে আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারব না, শেষ পর্যন্ত একটি বেদনাময় স্মৃতি নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল দেহের সম্মানজ্ঞান মনের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। শহরে এসে কি এক অজ্ঞাত কারণে পাকস্থলী অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতে লাগল, কলকাতা থাকতে যেমন, এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি, সে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করেই খুশি হল। সঙ্গীদের কাছে পরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে জানতে পারি, তাদের অবস্থাও ঠিক আমারই মতো। শহরে এসে তাদেরও আহারের পরিমাণ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়েছিল!

দ্বিজেনবাবু কিছুকাল পূর্বে অসুখে ভুগেছিলেন, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি, গিয়ে দেখলাম শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়ে আছেন। অতিথিবৎসলকে এ ভাবে দেখে বড় দুঃখ হল। তাঁর কন্যা শ্রীমতী মায়া 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে "বিহারের লোক-সঙ্গীত" লিখছিল। সেইগুলো পড়ে বিহারের পল্লীজীবনের প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভেবেছিলাম এই উপলক্ষে হাজারিবাগ থেকে ওদের পল্লীজীবনের সঙ্গে কিছু পরিচয় স্থাপন করব, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। দ্বিজেনবাবু অসুস্থ ছিলেন, তদুপরি আমাদের সময় ছিল অত্যন্ত কম। ওখানে গিয়ে বোঝা গেল বেশ কিছুকাল ওখানে না থাকলে দূর পল্লীতে গিয়ে পল্লীজীবনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ঐ গানগুলোর ভিতর দিয়ে বিহারের জলমাটির কাছাকাছি যে মানুষ বংশপরম্পরায় বাস ক'রে এসেছে, তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার একটি অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের পল্লীবাসীদের সঙ্গে ওদের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। ওদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের এমন সরল সহজ মধুর গান যে সব অজ্ঞাত অখ্যাত কবি রচনা করেছেন, তাঁদের কথা ভাবলে বিস্ময় জাগে।

হাজারিবাগ শহরে দেখবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। শহরের ভিতরে একটি বড় মন্দির ছিল, নাম তেলীমন্দির। লেকের ধারে গিয়েছিলাম এক দিন, কিন্তু তার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সেইখানে সরু বাঁশের এক একটা ঝাড় পর পর অনেকগুলো ছিল—দেখতে বেশ লাগল। ১৯ তারিখের সকালে এসেছিলাম এদিকে। সেই দিনই আমরা হাজারিবাগ ছাড়ব এই রকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। হাজারিবাগ শহরে এসে এখান থেকে কি ভাবে কোথায় যাব তা আগে কিছুই ঠিক করা সম্ভব হয় নি। অনেক সময় গল্প বা উপন্যাস আরম্ভের সময় কি ভাবে তা শেষ হবে লেখকের তা জানা থাকে না, লিখতে লিখতে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তার পর একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ঠেলে নেওয়া যায়। আমাদের এই ভ্রমণও অনেকটা সেই রকম। হাজারিবাগ শহর পর্যন্ত এসে, এখান থেকে নানা সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা ক'রে ঠিক হল আমরা রামগড় হয়ে কলকাতা যাব। নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ জন্য যে উদারতা

দেখালেন তার জন্যই আমাদের এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করতে পারল। পূর্বদিন সন্ধ্যায় ঠিক হয়ে গেল আমার সঙ্গী বন্ধুরা বেলা বারোটায় আমাকে তুলে নিয়ে যাবে দ্বিজেনবাবুর বাড়ি থেকে।

এলাহাবাদের কংগ্রেস-কর্মী ভূতপূর্ব কাকোরীবন্দী মন্মথ গুপ্ত সম্প্রতি জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন হাজারিবাগে দ্বিজেন বাবুর বাড়িতে। হিন্দি ভাষায় উপন্যাস এবং গল্প লেখক হিসেবে ইনি খ্যাত। উর্দু জানেন, বাংলাও ভাল জানেন। ইনি বাংলা ছোট গল্প অনেক অনুবাদ করেছেন হিন্দি সাময়িক পত্রিকার জন্য। আমাদের অনেকের গল্পই হিন্দিতে অনুবাদ হয়ে বহু হিন্দি মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না। প্রকাশকেরা সেজন্য ঋণ পরিশোধ অথবা ঋণ স্বীকার দূরের কথা, মূল লেখককে এক সংখ্যা কাগজও পাঠানো দরকার মনে করেন না, এটা বড়ই বিস্ময়কর মনে হল। মন্মথ বাবুর কাছ থেকে এই সংবাদটি পাবার পর আমার মনে হয়েছে বাঙালী লেখকদের তরফ থেকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখা যাঁদের পেশা, তাঁদের লেখার কপিরাইট অগ্রাহ্য ক'রে হিন্দি সাহিত্যের ব্যবসায়ী দু'পয়সা ক'রে নিচ্ছেন, ঠকছেন বাঙালী লেখকেরা। বাঙালী লেখককে না জানিয়ে তাঁদের অনূদিত গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে কি না কে জানে!

২০ এপ্রিল তারিখে বেলা একটায় হাজারিবাগ থেকে নীরদ বাবুর গাড়িতে আমরা চার জন রামগড় রওনা হলাম। এ পথের দৃশ্য আরও চমৎকার। একেবারে শালবনের ভিতর দিয়ে পাহাড়িয়া পথ। একবার উপরের দিকে উঠছি, একবার নিচের দিকে নামছি। ঢেউ-খেলানো আঁকাবাঁকা পথ পাহাড় কেটে কেটে তৈরি হয়েছে। এই রকম ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে আমরা পৌছে গেলাম রামগড়ের দামোদর-সেতুর উপরে। এখানে নদী বেশ প্রশস্ত, কিন্তু তখন জল খুব বেশি ছিল না। শুকনো নদীর প্রস্তরশয্যা বেরিয়ে পড়েছে দুপাশে। সেতুর অপর পারে বন্দুকধারী প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে।

কংগ্রেস অধিবেশনে বিখ্যাত রামগড় যুদ্ধ উপলক্ষে সেনানিবাসে পরিণত হয়েছে। নদী পার হয়ে দেখি সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। রামগড় যেন একটি

প্রকাণ্ড শহর। অতি প্রশস্ত পালিশ করা পথ। পথে অবিরাম মিলিটারি লরি যাতায়াত করছে। ব্রিটিশ সৈন্যরা চলাফেরা করছে। রাস্তার ধারে কত রকম দোকান, হেয়ার-কাটিং সেলুন, রেডিও যন্ত্র মেরামতের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি। পথের বাঁ পাশে পুরনো রামগড়, ডান পাশে নতুন রামগড়।

আমাদের গাড়ি বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ের দিকের একটি পথে গিয়ে নীরদ বাবুর কাঠের গোলায় গিয়ে হাজির হল। নীরদ বাবু আমাদের জন্য শুধু গাড়িই দেন নি, রামগড়ে থাকবার জায়গা এবং খাবার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমরা তাঁদের অফিস-ঘরে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সোজা রওনা হলাম রাজরপ্পার অভিমুখে। সেইখানকার বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির নাকি দেখবার মতো জিনিস। রামগড় থেকে জায়গাটা ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু পথ সব জায়গায় ভাল নয়। এক এক জায়গায় বহু নিচে নেমে প্রায় খাড়া উপরে উঠতে হয়। তিন চার জায়গায় এই রকম সব খাল পার হতে হয়। তা ছাড়া সে পথে আর কোনো অসুবিধা নেই। পথের দু-ধারের দৃশ্য নতুন ক'রে বর্ণনা করব না। পথে অনেকগুলো বিয়ের শোভাযাত্রা চলছিল। প্রত্যেকটি যাত্রীর পরনে হলুদ রঙের জামা ও ধুতি। এ রকম দশ-বারোটা দল দেখা গেল।

গোলাবাজার নামক একটি জনবহুল জায়গার ভিতর দিয়ে আমাদের যেতে হল। বেলা তখন চারটে হবে। সেখানে হাট বসে গেছে। বহু লোকের ভিড়।

গোলাবাজার ছাড়িয়ে খুব বেশিদূর যেতে হল না। কিন্তু সেই মহুয়া-বনের ভিতর দিয়ে যেতে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অনেক সাঁওতাল মেয়ে বোঝা মাথায় হাটের পথে আসছিল, কিন্তু মোটর গাড়ি দেখে বহু দূর থেকে তারা সবাই প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। যে পথে আমরা যাচ্ছিলাম, সে পথ মোটর গাড়ি যাবারই পথ, বহুকাল ধরে অনেকেই সে পথে মোটর গাড়িতে যাতায়াত করেছে এবং সাঁওতাল মেয়েরাও সেখানকার নতুন লোক নয়। তবে কেন এ রকম হল। ভেবে একমাত্র উত্তরই মনে আসে। যুদ্ধের সময় হয় তো সৈন্যদের বা সামরিক বিভাগের

লোকদের হাতে এরা এমন উৎপীড়িত হয়েছে যার ফলে মোটর গাড়ি এদের কাছে এখন বিভীষিকা। রামগড়েও এ রকম অত্যাচার হয়েছে পরে শুনেছি। সেখানকার পুরনো বাজারের প্রবেশপথে সৈন্তদের প্রবেশ নিষেধ সাইন দেওয়া আছে দেখলাম। সেটা নিরর্থক নয়।

ছিন্নমস্তা মন্দির দামোদর নদীর গর্জ-এর উপর অবস্থিত। আর একটি নদী এসে পড়েছে দামোদরের এই খাদে মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে। সে নদীটি এখন ক্ষীণ ধারা মাত্র কিন্তু তার প্রশস্ত বক্ষের উপর স্রোতে পালিশ-করা প্রকাণ্ড এক এক খণ্ড পাথর পাশাপাশি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে। ক্ষীণ স্রোত এঁকে-বেঁকে তার ভিতর দিয়ে গিয়ে দামোদরে পড়ছে। এক জায়গায় এই জলধারা প্রচণ্ড বেগে জলপ্রপাতের আকারে গিয়ে ঢেলে পড়ছে গর্জ-এর মধ্যে। আমরা খুব সাবধানে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে পার হয়ে যাচ্ছিলাম। পা ফস্কালে মাথা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এইখানকার দৃশ্য সব দিকেই অতি চমৎকার।

মন্দিরের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাচীন মন্দির, কিন্তু তার সিঁড়ি ও সম্মুখ ভাগের সমস্তটা গাঁথুনিই আধুনিক কালের। মন্দিরের পাশে যাত্রীদের থাকবার মতো একখানি ঘর আছে। মন্দিরের পূজারী বাঙালী।

আমরা সেখানে আধ ঘণ্টা থাকবার পরেই আকাশে বৃষ্টির মেঘ জমে এলো, কাজেই তখনই ফিরে আসতে হল ওখানকার সব কিছু ভাল ক'রে না দেখেই। ক'দিন ধরেই হাজারিবাগে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, হাওয়াও সেজন্য বেশ ঠাণ্ডা ছিল। রাত্রে খাবার জন্য আমাদের কিছু ভাবতে হয় নি—যাঁদের উপর সে চিন্তার ভার ছিল, তাঁদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণ ক'রে আমরা চার জনেই এক দিন পরে আবার হাজারিবাগ রোডের মাত্রায় আহার করলাম। সমস্ত দিনে প্রায় আশী মাইল মোটর ভ্রমণ ক'রে এবং রাত্রে অতিমাত্রায় ভোজন ক'রে ভেবেছিলাম রাত্রে খুব ঘুম হবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত হল। আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হল। বিষয়গুলো কিছু নতুন নয়—তবু তাতে যা উত্তেজনা সৃষ্টি হল তা নিদ্রার পরিপন্থী। এর প্রধান উদ্যোক্তা কিরণ এবং আমি। রবি বিষয়টি অর্থনীতির দিকে টানতে লাগল এবং সুধাংশু বিজ্ঞানের

দিকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুধাংশুর নাক ডাকতে লাগল, তাতে তর্কটা এক-চতুর্থাংশ মাত্র সরল হল। যে তিন-চতুর্থাংশ জটিলতা অবশিষ্ট রইল তাতেই রাত্রি শেষ হয়ে এলো।

রাজরপ্পা যাবার পথে রামগড় থেকে মাইলদেড়েক দূরে চমৎকার একটি শিবমন্দির দেখেছিলাম। সকালে বেরিয়ে গিয়ে তার ছবি নিতে হবে ঠিক করলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। এই মন্দিরটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে বড় রাস্তা থেকে সামান্য একটু দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ছোট ছোট প্রাচীন মন্দির অনেক আছে। পূজারী সবই বাঙালী এবং জানা গেল এই উপলক্ষে এই খানে এক-শ' ঘরের বেশি বাঙালী ব্রাহ্মণ এখন স্থায়ী ভাবে বাস করছে। মন্দিরসংখ্যা তিন-শ' থেকে চার-শ'। সে রকম ছোট ছোট মন্দির অনেকগুলো দেখলাম, কিন্তু এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে হল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম।আগে। বিগ্রহের সম্মুখে ফাঁকা উঠান এবং চারিদিকে পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ। চারদিকেই ঘুরে ঘুরে বহু দূরের দৃশ্য দেখা যায়। নিচের তলাতেও অনেকগুলো কুঠরি। মন্দির পুরনো হয়ে এসেছে। নিয়মিত পূজো হয় না। কোনো ভক্ত মাঝে মাঝে এসে হয় তো কিছু নিবেদন ক'রে যায়। মন্দিরের বাইরে সবটাই চাষের জমি। জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান বুনবে বলে দু-এক খণ্ড জমি চাষ করা হচ্ছিল তখন।

রামগড়ের প্রকাণ্ড হাট বসছিল তখন থেকেই। চারদিক থেকে বহু গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে জিনিসপত্র আসছিল। বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। এরই মধ্যে দেখি হাটের জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। আমরা বারোটার মধ্যেই ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। সেই দিনই অপরাহ্ণে কলকাতা ফেরবার ট্রেন বি এন আর লাইনের। ওখানে ই আই আর লাইনেরও স্টেশন আছে, কিন্তু বি এন আর বেশি সুবিধাজনক মনে হওয়াতে এই পথেই আসা ঠিক হল।

হাজারিবাগ গিয়েছিলাম ই আই আর-এর মধ্যম শ্রেণীতে, ফিরলাম বি এন আর-এর তৃতীয় শ্রেণীতে। রামগড় স্টেশনে খুবই ভিড় ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের

মধ্যেই ভিড় :কমে গেল, আমরা বাঙ্কের উপর বিছানা পেতে রাখলাম। এই পথের দৃশ্যও অতি চমৎকার, বিশেষ ক'রে মুরি জংশনের পর থেকে বড় বড় পাহাড়ের দৃশ্য ছবিতে ধরে রাখবার মতো। এই পাহাড়গুলোর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এতে গাছপালার চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে এই পাহাড়ের দৃশ্য ঠিক ছবিতে দেখা বিলিতি ল্যাণ্ডস্কেপের দৃশ্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে দেখি রবি আমাদের এক ভ্রমণ-সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। সে এখানকার আদিবাসী। তাদের একদল মেয়েপুরুষ তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বহুদিন পরে দেশে ফিরে চলেছে। এই লোকটি বাংলা ভাষাতেই কথা বলছিল, অবশ্য তার নিজস্ব উচ্চারণে। নাম তার বনমালী। দেশে তার বাড়ি আছে, দু-এক খণ্ড জমি আছে—তারই 'মায়াজালে' সে আবদ্ধ। তার মুখে তার অতি সরল উচ্চারণে এই 'মায়াজাল' কথাটিতে চমকিত হলাম। যে সংস্কৃতির পরিচয়, যে জীবন-দর্শনের সহজ সরল রূপ আমরা আমাদের দেশের অশিক্ষিত পল্লী-কবির গানে শুনি—যা সরল পল্লীবাসীর সমস্ত জীবনের অঙ্গ—তারই একটি প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠল বনমালীর ঐ কথাটির ভিতর দিয়ে। অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত সেই রূপ। মনে হল হাজারিবাগ ভ্রমণ সম্পূর্ণ সার্থক হল। মাটির মায়াজালই তো এ জীবনে সত্য বলে জেনেছি, এর বাইরে আর কিছু সত্য আছে কি?

(১৯৪৬)

ডুয়ার্সের পথে

ডুয়ার্সের জঙ্গলে বাঘের ফোটোগ্রাফ তোলা কি ভাবে সম্ভব এই নিয়ে ডুয়ার্সের সঙ্গে পরিচিত শিকারপ্রিয় অশোকের সঙ্গে আমার অনেক দিন আগে কথা হয়। ডুয়ার্সের জঙ্গল শিকারী মাত্রেরই কাছে একটি তীর্থস্থান বিশেষ। অনেকে এখানে বাঘ মেরেছেন, কিন্তু জংলী বাঘের ফোটোগ্রাফ নেওয়া সম্পর্কে কোনো বাঙালী শিকারীর কখনও কোনো আগ্রহ হয়েছে বলে জানা নেই। শিকার করা এবং শিকারের ছবি তোলা একই সঙ্গে একা লোকের পক্ষে অবশ্য সব সময় সম্ভব হয় না, অথচ বন্দুক নিয়ে শিকার করা আর ক্যামেরা নিয়ে শিকার ধরা এ দুটি কাজই যে-কোনো অভিজ্ঞাত শিকারীর পক্ষে সমান লোভনীয়।

অশোকের কাছে শুনলাম ইউরোপীয়ান ছাড়া এ দেশে সে রকম সফল চেষ্টা কেউ করেন নি। (এবারে একটি ফরেস্ট অফিসে গিয়ে আমি কয়েকখানা বাঘের ছবি দেখে চমৎকৃত হয়েছি। সেগুলো সবই ফ্ল্যাশ আলোতে তোলা এবং প্রত্যেকখানাই অতি সুন্দর।)

এ রকম ছবি তোলা অসম্ভব একটা কিছু নয়, সবই পূর্ব আয়োজন সাপেক্ষ। খরচও বিশেষ কিছু নয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ধৈর্যের। যে-কোনো বুদ্ধিমান ফোটোগ্রাফার এ কাজ অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে নিরুৎসাহকর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ রকম ছবির চাহিদা এ দেশে সে রকম নেই। কাজেই এ দেশের শিকারী বাঘ মেরে তার উপর একখানা পা তুলে দিয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে যে জঘন্য ছবি তোলান তাইতেই তিনি ও সে-ছবির দর্শকেরা তৃপ্ত।

যুদ্ধের পরে, গত বৎসর অশোক জঙ্গলে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাইথন (ময়াল) শিকার করেছিল; তার ছবিখানা এবারে আমাকে দেখাল, এবং পুরাতন

প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন ক'রে বলল, তুমি শিকারের ছবি তুলতে রাজি থাক তো এবারে চল।

কিন্তু শিকারের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে অন্তত একবার পরিচয় না ঘটলে কথা দেওয়া শক্ত।

শিকারের ফোটোগ্রাফ আমাদের দেশে যে তোলা একান্ত প্রয়োজন সে কথা অশোক গভীর ভাবে চিন্তা করেছে। এ জন্য আমার খুব আনন্দই হল। সত্যিই কোনো ফোটোগ্রাফার যদি একান্ত ভাবে শিকারের ছবি নেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন তা হলে তাঁর ছবিগুলো বিদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে পারে। তবে তাঁকে আর সব ভুলে একমাত্র ক্যামেরা নিয়েই থাকতে হবে। আমাদের মতো ছুটির দিনের শৌখিন ফোটোগ্রাফার হলে চলবে না।

আমি বললাম ক্যামেরা নিয়ে বেরলে অবশ্য অনেক কিছুই কাজ হতে পারে। বাঘের ছবি না তুললেও অন্তত হরিণের ছবি তোলা যেতে পারে।

অশোক বলল, তার চেয়েও ভাল জিনিস আছে। এবারে হাতী-খেদায় হাতী ধরা দেখার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তুমি যদি যাও তা হলে একটা নতুন জিনিসের ছবি নিতে পারবে।

তবে কি আসাম যেতে হবে?

অশোক বলল, এই বাংলাদেশেই হাতী ধরা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভুটানের পায়ের কাছে যে গভীর জঙ্গল আছে সেইখানে হাতী ধরা হয়। জায়গাটা আসামের খুবই কাছাকাছি এবং নামে বাংলাদেশ হলেও পরিচিত বাংলাদেশের কোনো চিহ্নই সেখানে নেই।

বলা বাহুল্য, এ রকম নিরাপদ প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্বাস্থ্য কিছু খারাপ ছিল, সেজন্য স্বভাবতই দুর্গম স্থানে ভ্রমণ আমার পক্ষে একটু দুঃসাহসিকতার ব্যাপার ছিল, কিন্তু তবু এ সুযোগ ছাড়ায় মন রাজি হল না। তা ছাড়া ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজে পড়লাম দক্ষিণ মেরু

অভিযানের জন্ম ইউরোপ-আমেরিকা থেকে তোড়জোড় চলছে।—কল্পনা ক'রে নিজের সাহস বেড়ে গেল।

কিন্তু কথাটা বন্ধুমহলে প্রচার ক'রে হল মুশকিল।

তারা বলতে লাগল ডুয়ার্সে এমন ভীষণ ম্যালেরিয়া যে সেখানে কেউ একবার গেলে সুস্থ দেহে ফিরে আসে না। আর সে না কি সবই প্রায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। বিশেষ ক'রে যারা বাইরে থেকে ওখানে নতুন যাচ্ছে তাদের ভয় সব চেয়ে বেশি। তাদের মৃত্যু প্রায় অনিবার্য।

দু-তিন দিন ধরে এই ধরনের সব কথা শুনে শুনে মনে বেশ ভয় জেগে উঠল, এবং সর্বশেষ যাঁর সঙ্গে দেখা হল, তিনি বক্তৃতা দিয়ে রক্ত জমিয়ে দিলেন।

ভূষণকে আরও কয়েকবার বক্তৃতা দিতে দেখেছি। দাঙ্গার সময়, শহরের লোকের তখন মাথার ঠিক নেই, সেই সময় তাঁর বক্তৃতার অদ্ভুত ক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলাম। পাড়া রক্ষা করা যায় কি ভাবে এই বিষয়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন, আসবার সময় বেশ উৎসাহ দেখেছি তাঁদের মনে, কিন্তু ভূষণের কাছে এসে তাঁরা একটি কথা বলবারও সুযোগ পান নি, চুপ ক'রে শুনেছেন তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা এবং শোনবার পরে তাঁরা আধমরা হয়ে ফিরে গেছেন। অনিবার্য ধ্বংসের বিভীষিকাপূর্ণ চেহারা তাঁদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। অবসন্ন মনে, কম্পিত চরণে, তাঁরা ঘরে ফিরে গিয়ে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

২৩ নবেম্বর ১৯৪৬। সন্ধ্যায় আমার পুরাতন ভ্রমণসঙ্গী সুধাংশুপ্রকাশ এবং আমি রওনা হব আয়োজন করছি, এমন সময় হঠাৎ ভূষণ এসে হাজির।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

ডুয়ার্সে।

বলেন কি ? উদ্দেশ্য ?

দেহটা ভাল নেই, দিন পনেরো একটু বাইরে কাটাব।

তাতে আত্মার সদগতি হতে পারে, দেহটার নয়।

কি রকম ?

সেটাকে ওখানেই রেখে আসতে হবে, আগেই বলে দিচ্ছি।

ভয়ের কারণ আর এমন কি থাকতে পারে, মানুষ তো সেখানে থাকে ?

রেখে দিন মানুষ। আমি বলছি যাবেন না।

মনে পড়ল গত বারে অশোকের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। কিন্তু তবু সে এবারেও যাচ্ছে সেই ডুয়ার্সেই। তাই বললাম, যিনি আমাদের ডাকছেন তিনি মারাত্মক কিছু আশঙ্কা করলে নিজেও যেতেন না। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া যখন কলকাতাতেও হয়, তখন ভয় ক'রে লাভ কি ? তিনি অনেক বার ওখানে শিকার করতে গিয়েছেন।

তিনি তো তা হলে বাঘের মুখে যাচ্ছেন—মশার মুখে যেতে তাঁর তো ভয় থাকবার কথা নয়। কিন্তু আপনি কেন যাবেন ? বিশ্বাস করুন, আমি ডুয়ার্সে থেকে জানি। এখন হাজার টাকা দিলেও দ্বিতীয় বার আর যাব না।

এ কথার পরে আমাদের ভয় যে বেড়ে গেল তা বলা বাহুল্য। তখনই ছুটলাম ডাক্তারের কাছে। বললাম সাবধানের যখন মার নেই, তখন আগেই কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে নিলে হয় না ?

ডাক্তার বললেন, দরকার নেই, রোজ একটা ক'রে মেপাক্রিন খেলেই চলবে। ভয় কমে গেল. এবং এই ব্যবস্থামতে চলে কোনো বিপদেই পড়ি নি। (তা ছাড়া আরও একটি কথা আগে থাকতেই বলে রাখি যে জলপাইগুড়ি শহরে দু চারটে মশার দেখা পেলেও ডুয়ার্সের অরণ্যে যত দিন ছিলাম একটি মশার চেহারাও দেখি নি।)

সন্ধ্যা সাতটায় দার্জিলিং মেল। নবেম্বরের শেষে যাচ্ছি, কাজেই জলপাইগুড়িতে নিশ্চয় প্রবল শীত, এই আশঙ্কা ক'রে আগে থাকতেই প্রায় দার্জিলিং যাবার পোষাক পরে নিয়েছিলাম। জানতাম গাড়িতে ভিড়ের মধ্যে আর মাঝপথে গরম জামা পরার সুবিধা হবে না, কারণ আমরা তৃতীয় শ্রেণীতে

যাচ্ছিলাম। গাড়ি ছাড়বার সময় হচ্ছে ৬-৫০, কিন্তু আমরা সাড়ে পাঁচটায় গিয়েও কোনো রকমে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। তারপর থেকে ভিড় বাড়তে লাগল এবং গাড়িও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করেও কেন যে ছাড়তে অকারণ দেরি করতে লাগল জানি না, কিন্তু আমরা মুশকিলে পড়লাম গরম পোষাকে। দার্জিলিং মেলই যে দার্জিলিং নয়, এ কথাটা ভবিষ্যৎ শীতকে অগ্রাহ্য করেও আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

দার্জিলিং মেল দার্জিলিং নয়, কিন্তু আমরা যে গাড়িখানায় বসেছিলাম তাকে ভারতবর্ষ বলতে কারও আপত্তি হবে না। একেবারে অখণ্ড ভারতবর্ষ। মানুষকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা ভারতবর্ষীয় রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করবেন। দেখবেন মুমূর্ষু রোগী থেকে শুরু ক'রে বিশালদেহ পালোয়ান সবাই এসে ভিড় করেছে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, ওড়িয়া, আসামী, বিহারী, পঞ্জাবী, নেপালী, ভুটিয়া, মাদ্রাজী সবাই আছে। মালপত্র এক এক জায়গায় পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। ভিড়ের চাপে প্রত্যেকে নিষ্পেষিত, কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই, মনকে পারিপার্শ্বিক থেকে মুক্ত রাখবার অভাবনীয় কৌশল এদের জানা আছে। একই কামরায় তিন-চারটি প্রদেশের তিন-চার জন লোক বিভিন্ন সুরে গান ধরেছে—অথচ কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। ম্যালেরিয়ার রোগী জ্বরে আর্তনাদ করছে, মেয়েদের কোলের কোনো কোনো শিশু-সন্তান তারস্বরে চিৎকার করছে, আর একজন রোগী ক্রমাগত কাসতে কাসতে মরবার উপক্রম হচ্ছে, কিন্তু কারও দিকে কারও চেয়ে দেখবার দরকার নেই। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরকাল ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পথের সকল রকম দুর্দশা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেও দেখা যাবে সেই একই ভারতীয় জীবন-দর্শনের প্রতিচ্ছবি।

এর জন্য রেল কম্পানিকে ধন্যবাদ। যারাই টিকিট কিনতে গিয়েছে তাদেরই কাছে টিকিট বিক্রি করেছে, এবং যত চেয়েছে তত দিয়েছে। আসনের হিসেব নেই, সুখ-সুবিধার প্রশ্ন নেই, হিসেব চলছে শুধু বুকিং অফিসে।

সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যদি কেউ তোমার ঘাড়ের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, তবে সেই যাত্রীর কোনো অপরাধ নেই। ঐ কামরায় যে তোমাকে উঠতে দিয়েছে, তাকেও সেই উঠতে দিয়েছে। তোমারও যেমন যাওয়া দরকার, তারও তেমনি যাওয়া দরকার। সুতরাং বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নাও, এবং যদি মনের অবস্থা অনুকূল থাকে তা হলে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপটি প্রত্যক্ষ করবার পুরো সুযোগ গ্রহণ কর চতুর্দিকের মানবিক চাপের মধ্যে বসে।

২৪ নবেম্বর ভোর ছটায় গিয়ে নামলাম জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় বসে হিমালয়ের কাছাকাছি যে শীতের আশঙ্কা করেছিলাম, এখানে এসে দেখি সে রকম কিছুই নয়। আমরা স্টেশন থেকে চা খেয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম দশ মিনিটের মধ্যে। সাইকেল-রিকশ এখানকার প্রধান বাহন। শহরের পথও বেশ চমৎকার। আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অশোক আমাদের টেনে নিয়ে গেল তেতলার ছাতে। বলল একটা দৃশ্য দেখবে চল। ছাতে উঠেই দেখি নির্মল নীল আকাশের বুকে স্বর্ণবর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘার অনাবৃত অপরূপ মূর্তি। ইতিপূর্বে দার্জিলিঙের পথে জলপাইগুড়ি থেকেই এ দৃশ্য বার বার দেখেছি, কিন্তু এত ভালভাবে দেখবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু সব সময়েই এ দৃশ্য কেন জানি না, সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হয়। হয় তো আমি যত বার দেখেছি তত বারই একভাবে বহুক্ষণ ধরে দেখতে পারি নি। সে দিনও দেখতে দেখতে নিচের মেঘ ধীরে ধীরে উপরে উঠে সমস্তটা দৃশ্য ঢেকে ফেলল। ভোরে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘার আবির্ভাব না দেখলে এর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ দেখা হয় না। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সূর্যোদয়ের কয়েক মুহূর্ত আগে সর্বোচ্চ চূড়াটি প্রথম আলোর স্পর্শে একটুখানি দৃশ্য হয়। মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য হাতের তুলির স্পর্শে ঐ জায়গাটায় প্রথম রং লাগল। তারপর তুলি চলতে লাগল ধীরে ধীরে। অনেকগুলো চূড়ার উপরের লাইনটি আঁকা হয়ে গেল। উপরে নিচে কিছুই নেই—আকাশের গায়ে শুধু পূব-পশ্চিম ব্যাপী একটি স্বর্ণবর্ণ তরঙ্গায়িত রেখা। তারপর ধীরে ধীরে নিচের দিকেও রঙীন হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তবু এ দৃশ্য

একমাত্র আঁকা ছবির সঙ্গেই তুলনীয়। এমন জীবন্ত প্রকাশ, এবং পরিচিত সকল বস্তুসীমার এত উর্ধ্বে অবস্থিত এবং এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল যে এ দৃশ্যকে অবাস্তব না ভেবে পারা যায় না।

অবাস্তবকে উড়িয়ে দিয়ে এবারে বাস্তবে আসা যাক। এখানকার খাওয়ার কথাটা দীর্ঘকাল র‍্যাশন এলাকাবাসী কাঁকরভোগীর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুগন্ধ সরু চাল এখানে সব সময়েই মেলে। এখানকার মাছও বেশ সুখাদ্য। মিষ্টান্নও অতি উপাদেয়। সন্দেশ বা রসগোল্লায় এমন একটা কোমল মাধুর্য আছে যা কলকাতার শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্নের চেয়েও স্বতন্ত্র। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো মহিমময় দৃশ্যের পাশে বসে ভাতের সঙ্গে হিমালয়ের পাথর চর্বণ নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকত, যদিও সেইটেই স্বাভাবিক বলে আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের নিতান্তই অনুকূল। এখানে এসে হিমালয়কে আর উদরে পুরতে হল না।

প্রত্যূষের প্রথম দৃশ্যে মন ভরে উঠেছিল, দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলপাইগুড়ি জেলা অত্যন্ত ভাল লাগতে লাগল। বিকালে বেড়াতে গেলাম তিস্তা নদীর দিকে। এখানে এই নদীটি বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। বহু-প্রশস্ত নদী, কিন্তু এখন জল শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে নদীর মাঝখানে অনেকগুলো চর জেগে ওঠাতে দৃশ্য নতুনতর হয়ে উঠেছে, এক নদী, বহু চর বুকে নিয়ে বহু নদীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের পায়ের কাছের নদীর অংশটি খুবই সঙ্কীর্ণ। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সম্মুখের প্রকাণ্ড চরের আর এক প্রান্ত থেকে মধুর গান গেয়ে এক রাখাল তিনটি বাছুর নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। তিনটি বাছুর ও রাখালের চলমান মূর্তি শাদা বালির উপর বহু দূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে অল্পক্ষণ আগে। ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। তার পর তিনটি বাছুর ও তাদের রাখাল জলে নামল। জল অগভীর এবং স্বচ্ছ। ওরা যখন মৃদু স্রোত ঠেলে আমাদের খুব কাছে এসে পড়ল তখন সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি রাখাল রাখাল-বালক নয়, বাঙালী গৃহস্থ বালিকা। বয়স বছর দশেক হবে। ফ্রক পরে

হাতে ছোট লাঠি নিয়ে ওপারে বাছুর আনতে গিয়েছিল। তার গানের সুর তখনও থামে নি। গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না, মনে হল কথা তার কাছে অবান্তর। আমাদের কাছেও। কিন্তু সেই গোধূলির অন্ধকারে, দিগন্ত-বিস্তৃত বালুচরের উপর সেই ছবি, সেই সুর, মনকে একটি অপরূপ আনন্দে ভরে তুলল।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে শোনা গেল আমাদের অরণ্য-পথে যাওয়ার আরও দু-এক দিন দেরি হবে, গাড়ি তেল ইত্যাদির যোগাযোগ ঠিকমতো ঘটে উঠছে না। তা ছাড়া যে সব পথে সোজা যাওয়া যায়, সে সব পথের সব জায়গায় এখনও বড় গাড়ি চলবে না। বড় গাড়ি মানে ট্রাক। ট্রাক ভিন্ন অন্য কোনো গাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ সঙ্গে অনেক মালপত্র। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু দমলাম না। যদি জলপাইগুড়িতে দু-এক দিন থাকতেই হয় তা হলে এখানকার পল্লী অঞ্চলের কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা যাবে এই ভেবে কিছু উৎসাহ বোধ করলাম।

২৫ নবেম্বর। শহরের প্রান্তে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছি। বেলা নটা। ক্ষেতের পারে বহু দূর দিগন্তে গাছপালার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ধান পাকতে শুরু হয়েছে কিন্তু এখনও কাটা শুরু হয় নি। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এই রকম সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত দেখা যায়। এর দিকে চাইলে কল্পনা করা শক্ত যে এ দেশে লোকে ভাতের অভাবে মারা যেতে পারে। অথচ এ দেশে ধানের প্রাচুর্যও যেমন সত্য, দুর্ভিক্ষও তেমনি সত্য। আমরা ভাঙাচোরা উঁচুনিচু পথে এগিয়ে চলেছি। ধানক্ষেতের এপারে চাষী পল্লী। ওদের সবই ছোট ছোট খড়ের ঘর। বাড়ির জমির সঙ্গে অনেকগুলো ক'রে কলা গাছ। সমস্তটা মিলে বেশ একখানি ছবির মতো মনে হচ্ছে। আমরা যে পথে চলেছি সে পথে বহু যাত্রী চলেছে নদীর দিকে। একটু পরেই তিস্তার ধারে এসে পড়লাম। চার-পাঁচ জন ডাক হরকরা বড় বড় চিঠির থলে মাথায় নিয়ে হন হন করে চলেছে। তারা নদী পেরিয়ে যাবে রেল-স্টেশনের দিকে।

দিনের প্রখর আলোয় তিস্তার রূপ ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া

গেল। নদীর অগভীর জল ঠেলে পিঁপড়ের সারের মতো মানুষের সার নদী পারাপার করছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে নদীর পাড়, কিন্তু জল বহু দূরে। হিমালয় পর্বতশ্রেণী দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। এই বিস্তীর্ণ নদীর বুকে অগভীর জলে এক বৃদ্ধা একটা ছোট ধামা কাঁখে নিয়ে লাঠি হাতে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাছ ধরা বলে মনে হল না। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা সেখানে ছিলাম, তার খোঁজা তখনও শেষ হয় নি। তাকে দেখে পরশ-পাথর-খোঁজা ক্ষ্যাপার ছবিটি মনে জাগছিল।

তিস্তা নদীর ধারে বেড়ানো এমনি ভাল লাগল যে বিকেলে আমরা আবার এলাম সেখানে। নদীর ধারে এই রকম খোলা স্বাস্থ্যকর জায়গায় শহরের কাউকে বেড়াতে দেখলাম না। বেড়ানোর মতো এমন মূল্যবান জায়গা, অথচ একেবারে নির্জন, কেবল যারা পার হয়ে যাচ্ছে তারা ভিন্ন আর লোক নেই।

সন্ধ্যায় যখন ফিরছি তখন মুসলিম লীগের বাইরে-থেকে আসা কয়েকজন লোক নাকি একটি সভা বসিয়েছিল, তার আভাস পাওয়া গেল পথে। বহু উৎসাহী যুবকের ছুটোছুটি এবং ব্যস্ততা দেখলাম। পূর্বদিন ওদের একটা শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল শহরে। শহরে উত্তেজনা স্থষ্টির নাকি চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু স্থানীয় নেতারা হিন্দু-মুসলিম প্রীতি নষ্ট করবার বিরোধী, তাই বাইরের লোকের বিশেষ কোনো সুবিধা হয় নি।

বিদ্যুতের আলোতে পথের উপর একটি চমৎকার বিজ্ঞাপন দেখলাম। পাঁউরুটির বিজ্ঞাপন। স্বভাবতই আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু হওয়া গেল না। দেখে মনে হল রুটি প্রস্তুতকারক রুটির ক্রেতাকে স্তম্ভিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনটি ফরাসী ভাষায় প্রচার করতে চেয়েছেন। তাই বড় বড় বাংলা হরফে সাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে, "দ্যা লোফ আঁ"। দেশী রুটিতে এই জাতীয় বাংলা ফরাসী স্বাদ মিশ্রিত হয়ে কি দাঁড়িয়েছে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন।

২৬ নবেম্বর। আজ দুপুরের একটু পরেই যাওয়া গেল জলপাইগুড়ির উত্তরে একটি পল্লীগ্রামের হাট দেখতে। হাটটির নাম গৌরীর হাট, কেউ কেউ রাজার

হাটও বলে। দন্তচিকিৎসক কিরণ বাবুর গাড়িতে গিয়েছিলাম। আমরা যখন হাটের কাছে এলাম তখন হাট সবে বসতে শুরু করেছে, তাই তখনই সেখানে না থেমে ঐ পথে আরও আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে বসলাম ঘণ্টাখানেকের জন্য। আমরা যে পথে এলাম সে হচ্ছে শিলিগুড়ি রোড। শিলিগুড়ি আরও উনত্রিশ মাইল দূরে। উঁচু জায়গাটা থেকে চারদিক বেশ দেখা যাচ্ছিল। এর পিছনেই মাঝারি আকারের একটা দীঘি। চারদিক দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গ্রামে যাবার বহু পথের চিহ্ন। নানা গ্রাম থেকে হাটের পথে বেরিয়ে আসছে নানাজাতীয় স্ত্রীপুরুষ। হিন্দু মুসলমান সবাই চলেছে। কেউ বা চলেছে গোরুর গাড়িতে। এখানকার প্রাচীন বাসিন্দারা রাজবংশী। এদের মেয়েরা একখানা লুঙি জাতীয় বস্ত্র বুকের মাঝামাঝি জায়গায় এঁটে পরে। সে কাপড়ে আর কোনো বাহুল্য নেই, দেহটাকে শুধু ঘিরে রাখে মাত্র। এই অদ্ভুত শাড়ীর নাম হচ্ছে পোতা।

আমরা চারটের পর এলাম হাটে। বেশ বড় হাট। তরিতরকারী, কমলালেবু, কলা, চাল, পান, সুপারি, চুন, খেলনা এবং কলকাতা থেকে আমদানী নানা রকম শস্তা মনোহারী জিনিষ। পোতা শাড়ী এবং গামছা ইত্যাদিও অনেক এসেছে। তা ছাড়া স্থানীয় রাজবংশী মালাকরদের শোলার উপর চিত্র-বিচিত্র আঁকা দেবদেবীর মূর্তি। হাটে সাঁওতাল মেয়েপুরুষও অনেক এসেছে। হিন্দু মুসলমান সবাই আছে। তারা সবাই গ্রামবাসী। স্বাস্থ্য তাদের কারোই বিশেষ ভাল দেখলাম না। অত্যন্ত নিরীহ, চাষবাস ক'রে কিংবা তরিতরকারি বেচে খায়। জলপাইগুড়িতে বহিরাগত লীগনেতার আগমনে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য জেগেছে কিনা লক্ষ্য করছিলাম। দেখে মনে হল এরা বহু পুরুষ ধরে যেভাবে এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস ক'রে আসছে তার ছাপ প্রত্যেকের মুখে লেগে আছে। এরা খেতে পায় না, দরিদ্র, স্বাস্থ্যহীন, ঠিক এইখানকার হিন্দু গ্রামবাসীদের মতোই। তাই এদের মধ্যে কোনো আত্মঘাতী প্রবৃত্তি জাগে নি। হিন্দু মুসলমান দুই গরিব প্রতিবেশী—দুজনের

সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, আজ হঠাৎ এরা পরস্পর মারামারি করবে কেন তা এরা জানে না।

হাটের পাশেই একটি মন্দির আছে—মদনমোহন বিগ্রহের মন্দির। বিগ্রহ বহুদিনের, কিন্তু মন্দিরটি অল্পদিন হল জলপাইগুড়ির রাজার টাকায় তৈরি হয়েছে শুনলাম। মন্দিরের সংলগ্ন জমিতে সুপুরি গাছের বাগান। বাগানকে ঘিরে রেখেছে দুর্ভেদ্য বাঁশবন। এত লম্বা লম্বা বাঁশ এর আগে দেখি নি। এর পাতাগুলো একটু বেশি সরু বলে মনে হল। এই বাঁশবনের ছায়ার ঘেরা সুপুরি গাছগুলোর প্রত্যেকটিতে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে পানের গাছ। সুপুরী গাছ যত উঁচু পানের লতাও ততখানি উঁচু হয়ে উঠেছে। একে বলে গাছ পান। পান গাছ ও সুপুরি গাছের এই অদ্ভুত মিলন বেশ মজার মনে হল।

আমাদের সঙ্গে স্থানীয় সরোজবাবু ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সকলের পরিচিত। এঁর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আমরা বেশ খাতির পেলাম। পূজারী আমাদের চা খাইয়ে অভ্যর্থনা করল।

আমরা বসে থাকতে থাকতে এক ভিখারী রোগী এলো ঐ মন্দিরে। সে পূজারীর কাছ থেকে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছে। জ্বরে কাঁপছিল। ম্যালেরিয়া কিংবা কালাজ্বর হবে। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় ক'রে দেওয়া হল। এইখান থেকে আবার আমরা হাটে এলাম। হাটের ভিতরে ধান চালের আমদানী হয়েছিল অনেক। খুব সরু চাল টাকায় সওয়া সের এবং মোটা লাল আমন চাল আড়াই সের ক'রে বিক্রি হচ্ছিল। আমরা মালাকরদের শোলার উপর আঁকা ছবিগুলোর দিকে আকৃষ্ট হলাম। মনসা দেবী, কালী ও পূজারিণীদের ছবি তুলি ও রঙের সাহায্যে আঁকা। কালীর মূর্তিতে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। পূজারিণীদের ছবি সবই এক রকম। কিন্তু অনেকগুলো পর পর আঁকলে অতি চমৎকার একটি প্যাটার্ন হয়। আমরা ইচ্ছে করলে এই প্যাটার্ন বইয়ের মলাটে বা অন্যত্র ব্যবহার করতে পারি। কালী ও পূজারিণীদের মূর্তি এঁকে এরা যে জিনিষ তৈরি করেছে তা ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা যায়—অথবা ল্যাম্পের শেড হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ল্যাম্পে

লাগিয়ে দেখা গেছে ভারি সুন্দর দেখায়। আলোক নিয়ন্ত্রণের সময় যে রকম শেড ব্যবহার করা হত এগুলোও সেই ধরনে তৈরি। মনসা মূর্তি আঁকা ডিজাইনটি দু ফুট লম্বা। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা যায়।

২৭ নবেম্বর। রওনা হবার জন্য দুঃসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু তবু সব ঠিকমতো যোগাযোগ ঘটছে না। সেজন্য আজ আর কোথায়ও যাওয়া হল না। সন্ধ্যায় স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক এলেন এবং নানা রকম গল্প শোনা গেল তাঁদের কাছ থেকে। সবই প্রায় শিকারের গল্প। এ অঞ্চলের অরণ্যে যাঁদের ঘোরা-ফেরা করতে হয় তাঁদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা বাঘ মারা। বাঘ মারার চেষ্টা অনেকেই করেন, কিন্তু বাঘ পাওয়া নিতান্তই দৈবের উপর নির্ভর করে। অনেকে আবার সামনে পাওয়া সত্ত্বেও মারতে পারেন না। সরোজবাবু বললেন শিকারী দলের সঙ্গে যে দিন তিনি প্রথম হাতীর পিঠে বাঘ শিকারে হাতে খড়ি দিতে যান সে দিন তিনি সুযোগও পেয়েছিলেন, লক্ষ্যও ঠিক করেছিলেন এবং গুলি করতেও ভোলেন নি, কিন্তু তবু বাঘ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে তাঁকেই পাকা শিকারীদের বাক্য-গুলির লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারা গেল, সবই রুটিন মতো করেছিলেন, কেবল বাঘ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুকে টোটা পুরতে ভুল হয়েছিল! অত্যন্ত ভয়ে তাঁর তখন জ্ঞান ছিল না, যন্ত্রচালিতবৎ কি করেছিলেন খেয়াল করতে পারেন নি। দাসুবাবু বললেন এক আনাড়ি দল এক চা বাগানে মাচা বেঁধে বাঘের অপেক্ষায় বসে আছে, এমন সময় একজন ভয়ে বা-বা করে চেঁচাতে লাগলেন এবং সবাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সমবেত ভাবে গুলি চালালেন কালো অর্ধ-দৃশ্য জন্তুটার উপর। অব্যর্থ গুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জন্তুটি কোন্ এক সাহেবের একটি পোষা কুকুর। মহা সমস্যা। অতঃপর আত্মরক্ষার পাকা বন্দোবস্ত করলেন অন্য একটি কুকুর মেরে—এবং নিহত পোষা কুকুটিকে সরিয়ে ফেলে।

২৮ নবেম্বর। আজ রওনা হওয়া যাবেই এই রকম বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে হল না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। সকালে উঠেই বিছানাপত্র বাঁধা হয়েছিল, এমন অবস্থায় না যাওয়া অস্বস্তিকর। শেষ

পর্যন্ত জলপাইগুড়ির জনারণ্যকেই আশ্রয় করলাম আজকের দিনের মতো। দুপুরের পরেই আমরা তিন জনে গেলাম এখানকার আর একটি হাটে। নাম নতুনহাট, বেশি দূরে নয়, রিকশতেই যাওয়া সম্ভব হল। হাটটি গৌরীর হাটের তুলনায় খুবই ছোট, কিন্তু চেহারা একই। এখানে অতিরিক্ত আমদানী দেখলাম বাঁশের নানা রকম ঝুড়ি কুলো ইত্যাদি। বহু রকম ডিজাইনের তৈরি। এখানেও মালাকরদের শোলার উপর আঁকা দেবদেবীর ছবি বিক্রি হচ্ছে। আরও কিছু কিনলাম এখানে থেকে। বহুকাল ধরে এরা একই ধরনের ছবি এঁকে আসছে, ছবির অর্থও এরা ভাল ক'রে জানে না, কিন্তু হাত এদের পাকা। বংশানুক্রমিকভাবে একই ভঙ্গিতে এঁকে এদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আঁকবার সময় একটুও ভাবতে হয় না—অভ্যস্ত হাত দ্রুত চালিয়ে যেতে পারে। হাটে বসে বসেই কতকগুলো অর্ধসমাপ্ত ছবি শেষ করছিল দেখলাম।

২৯ নবেম্বর। বিছানা রাত্রে একটুখানি খুলে তারই উপর শুয়ে মধ্যপথে জরুরি অবস্থায় রাত কাটানোর মতো রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম। পাঁচটি রাত্রি এখানে কাটানো গেল, কিন্তু একদিনও মশারি ব্যবহার করতে হয় নি। শোবার সময় 'ইন্‌সেক্ট রিপেলেণ্ট' নামক এক দুর্গন্ধ মার্কিন তেল মুখে ও হাতে মেখে শুতাম। মশা খুব অল্পই ছিল, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় সেই তেলকে অগ্রাহ্য ক'রে কোনো মশা আমাদের রক্ত পান করেছে কিনা জানি না। যাই হোক ভোরে উঠে বিছানা ভাল করে বেঁধে নিয়ে চা খেয়েই গিয়ে উঠলাম ট্রাকে। মার্কিন যুদ্ধকালীন ট্রাক—অতি চমৎকার—কলকব্জা অতি মজবুত, পথ চলতে কিছুমাত্র ঝাঁকানি লাগে না। আমরা খোলা ট্রাকের উপর ডেক-চেয়ারে এবং প্যাকিং বাক্সের উপর গদি বিছিয়ে খুব আরামে যেতে লাগলাম। মোটর যন্ত্রের পাকা শিল্পী সুশীল পোদ্দার গাড়ি চালিয়ে চললেন। অশোকের এক মাসের রসদ সঙ্গে, তা ছাড়া বন্দুক গুলি ইত্যাদি।

আমাদের পার হতে হবে মণ্ডলঘাট ফেরি। জলপাইগুড়ির সম্মুখে পার হয়ে বার্নেস ঘাটে যাওয়ার পথ তখনও খোলা হয় নি। মণ্ডলঘাট শহর থেকে

কয়েক মাইল দক্ষিণে। অনেকখানি পথ তিস্তানদীর পাড়ের উপর দিয়ে আসতে হল। সে পথ অত্যন্ত খারাপ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। ট্রাক চালনার এক মুহূর্তের ভুলে সবসুদ্ধ নদীর মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। পথ সব জায়গাতেই উঁচুনিচু এবং ভাঙা, চলবার সময় মনে হচ্ছিল বাঁয়ের দিকের চাকা নদীতে পা বাড়িয়েই আছে।

মণ্ডলঘাট পার হতে বেশ খানিকটা দেরি হল। নদীর মাঝখানে প্রকাণ্ড চর। তাতে নদী দুই ভাগ হয়ে দুটো নদীতে পরিণত হয়েছে, কাজেই দুবার পার হতে হল একই নদী। দু-খানা খেয়ানৌকো একসঙ্গে জোড়া। তার উপর ট্রাক গিয়ে দাঁড়াতে পারে এজন্য চওড়া তক্তা পেতে দেওয়া আছে। আমরা দেড়ঘণ্টা ধরে দুটি জায়গা পার হয়ে ওপারে এসে উঠলাম ঘন কাশবনের (এলিফ্যাণ্ট গ্র্যাস) মধ্যে। এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে গাঁয়ের পথ। এ পথের দৃশ্য খুবই ভাল লাগল, কিন্তু ট্রাক দ্রুত চালিয়ে নেবার মতো ভাল পথ নয়। ময়নাগুড়ি পর্যন্ত কোনো রকমে এসে ভাল পথ পাওয়া গেল। আমরা বেলা একটার সময় দলগাঁওতে পৌছলাম। এইখানে কিছুক্ষণ থেমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। সঙ্গেই খাবার ছিল। এখানে কয়েকটা বড় দোকান আছে। পথ চলতি যা-কিছু দরকার প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখান থেকে ফালাকাটার পথ আরও বেশি ভাল লাগল। দুধারে অবিচ্ছিন্ন চায়ের বাগান। বাগানে কুলি মেয়ে-পুরুষেরা ছুরি চালিয়ে চা গাছ ছাঁটাই করছে—দুটি হাত সমানে চালিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন সবুজের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।

আমরা কখনও কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পিছনে ফেলে চলেছি, কখনও তার দিকেই এগিয়ে চলেছি, কখনও বা হিমালয়ের সমান্তরাল চলেছি। চলতে চলতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এ দিকটায় প্রথম আসছি, তাই গ্রামগুলোর চেহারা পরিচিত লাগলেও সমস্ত মিলে, বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পটভূমিতে সবই অভিনব মনে হচ্ছিল। তা ছাড়া ছোট ছোট নদী যে কত আছে তার সংখ্যা নেই। মনে হচ্ছিল যেন পাঁচ-দশ

মিনিট পর পরই একটি ক'রে সেতু পার হয়ে চলেছি। এ পথে 'জলঢাকা' নদীটিই সবচেয়ে প্রশস্ত। গ্রামে অধিকাংশই দোচালা ছোট ছোট খড়ের ঘর। দুতিনখানা ঘর মিলিয়ে এক একটা বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে কয়েকটি কলাগাছ। সম্মুখে বা পাশে একটুখানি তরিতরকারীর বাগান। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের ঘরগুলো টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি এবং জমি থেকে অনেকটা উঁচু। এ অঞ্চলে অনেক বাড়িই এই রকম উঁচু ভিতের তৈরি। এ দেশের বর্ষা খুব ভীষণ—অবিরাম বৃষ্টিতে সব ভিজে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, তাই ঘরের নিচে ফাঁকা রাখতে হয়, অবশ্য যারা পারে তারাই রাখে। ঠিক যেন দোতলা বাড়ি, নিচের তলাটা শুধু শূন্য। ঘরগুলো দেখতে খুব সুন্দর।

আমরা এগিয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এলাম, সেখান থেকে একটা পথ উত্তরের দিকে গেছে আর একটা পথ দক্ষিণের দিকে গেছে। দক্ষিণ দিকের পথটি কুচবিহারের দিকে গেছে।
ঐখানে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হলে উত্তরের পথটিই ধরতে হবে। কিন্তু সে পথটি ছিল খুব খারাপ, ভাঙাচোরা, এবং উপরে বেশ বড় বড় পাথরখণ্ড এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। একটু দূর এগিয়ে যাবার পর মথুরা নামক জায়গায় এসে আবার পথ জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া গেল। একটা চা-বাগানের শেষ প্রান্ত থেকে বাঁয়ের দিকে ঘুরতেই পথ অনেকটা ভাল মনে হল। আমরা বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ চিলাপাতা ফরেস্ট অফিসের সম্মুখে গিয়ে একটুখানি থামলাম এবং ওখান থেকে আবার পথের খবর জেনে নিয়ে এগিয়ে চললাম।

মিনিট পাঁচেক এগিয়ে যাবার পরই জঙ্গল শুরু হল। জঙ্গল ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর। বাঘ ভালুকের রাজত্বে প্রবেশ করছি। পথের পাশে তখনও দু-একটি লোকের দেখা মিলল। তারপর অরণ্য সম্পূর্ণ জনহীন। আমরা যে পথে চলেছি সে পথ নামমাত্র, আসলে তা অরণ্যেরই অংশ। গাড়ি চলতে পারে সহজেই, কিন্তু কোনো পথচারী একা মানুষ সে পথে যায় কিনা সন্দেহ।

লোকালয়ের চিহ্ন নেই। চারদিক থমথম করছে। কোথায়ও কোনো শব্দ নেই। ট্রাকের ইঞ্জিনের ঘড় ঘড় শব্দ সমস্ত অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যত এগিয়ে চলেছি ততই বেশি ঠাণ্ডা। হাত যেন জমে যাচ্ছে। কোনো হিংস্র জন্তু আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে পালাবার কোনো পথ নেই! প্রকাণ্ড এক একটা শালগাছ, তার সঙ্গে আরও কত রকম গাছ লতা গুল্ম। গাড়ি চলার সরু পথের দুধারে অজস্র হাল্কা সবুজ রঙের ফার্ন গাছ। ট্রাকের শব্দে গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে পালাচ্ছে। গাড়ির সামনে দিয়ে একটা ছোট বানর এক পাশ থেকে আর এক পাশে লাফিয়ে গেল। বাইরের কড়া রোদ থেকে ক্রমে অন্ধকার রাজত্বে চলেছি। সব আলো যেন হঠাৎ নিবে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে গায়ে। অশোক জঙ্গলের অন্ধকার ভেদ ক'রে তার সতর্ক দৃষ্টি চালনা করছে চারদিকে। চাপা গলায় বলছে ক্যামরা তৈরি রাখ।

কেন?

যে-কোনো অবস্থার জন্য তৈরি থাকা ভাল। আচমকা সুযোগ আসতে পারে।

বুঝলাম হরিণ কিংবা বাঘ অথবা ভালুক হঠাৎ সামনে এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। ক্যামেরা আমার খোলাই ছিল। চলতে চলতে একটা বাঁক ঘুরতেই মনে হল যেন আগুন জ্বলে উঠছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। হঠাৎ আমরা ছোট দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছি। সূর্যের আলো তার প্রবল স্রোতকে এমন ঝলকিত ক'রে তুলেছে যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নদীর দুই পাড়ে শত শত কাশফুল। আলো-উত্তাপহীন প্রাচীন অরণ্যের বুকে ঐ একটুখানি যেন ছুটির আনন্দ হাসি। মনে হল এইখানে একটু থামি, কিন্তু মনে হতে হতেই গাড়ি বহুদূর এগিয়ে চলে গেছে। এর পর থেকে ঐ নদীর ফাঁকা পথের দেখা কিছুক্ষণ পর পরই পেতে লাগলাম। তারপর আবার সব অন্ধকার। পুরো এক ঘণ্টা এই রোমাঞ্চকর অরণ্যবক্ষে বাস ক'রে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাশের নিচে। এলাম আর এক অভিনব অরণ্যে। দুধারে শুধু কাশবন। প্রত্যেকটি

গাছ পনেরো-ষোল হাত উঁচু এবং প্রত্যেকটি গাছ থেকে এক একটা শিষ আকাশের দিকে বেরিয়ে গেছে। যে সব কাশফুল তাতে ছিল তা অল্প দিন হল শুকিয়েছে তবু বেশ লাগছিল।

এর পর আবার অরণ্যপথ শুরু হল। তবে এ অরণ্য ভয়ঙ্কর নয়, এখানে মানুষের বসতি আছে। আরও কিছুদুর এগিয়ে আসার পর একটা নতুন জিনিষ দেখলাম। শালবনের ভিতর আধুনিক ধরনে তৈরি সব বাড়িঘর—কংক্রীটের দেয়াল ও অ্যাসবেসটসের চাল। প্রথমে দু একখানা ঘর, ক্রমে যত এগিয়ে চলেছি ততই ঘরের সংখ্যা বাড়ছে। একটি মানুষের চিহ্ন নেই, শুধু ঘর। তারপর জঙ্গল ছেড়ে খোলা জায়গায় এসে দেখি সেখানে ঘরের সংখ্যা আরও বেশি। সব মিলে একটা ছোটখাট শহর। সিনেমাঘর, জলকল, সবই আছে, কেবল মানুষ নেই।

শুনলাম যুদ্ধের শেষ দিকে এখানে এইভাবে সেনানিবাস তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সৈন্যেরা এ সব বাড়ি সম্পূর্ণ দখল করার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাই কোনো কাজে লাগে নি। এ রকম টাটকা নতুন শহর অথচ সম্পূর্ণ শূন্য—দেখলে মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

২

আমরা সন্ধ্যার একটুখানি আগে এসে পৌছলাম নীলপাড়া সোদামিনী টী এস্টেটের বাংলোয়। এইখানে আসবার একটা আকর্ষণ, এখানে একটু দূরেই গণ্ডারের রাজত্ব। কিন্তু সকালে গণ্ডার দেখতে যাওয়া হবে এই প্রস্তাবে যতখানি আশান্বিত হয়ে উঠলাম, নিরুৎসাহও বোধ করলাম ততখানি। এখান থেকে জঙ্গল পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, যেতে হবে হাতীর পিঠে চড়ে। কিন্তু গেলেই যে গণ্ডার দেখা যাবে তার কোনো স্থিরতা নেই, তাই ভাবছিলাম। কিন্তু যেতে হবেই, যদি দৈবাৎ একটি বা একটি দলসুদ্ধ ক্যামেরায় ধরা পড়ে তা হলে ক্যামেরা ধন্য হবে।

এসেছি চা-বাগানের বাংলোয়, অতএব আসার পর থেকে ঘণ্টা তিনেকের

মধ্যে তিন বার চা খাওয়া হল। বাগানের ম্যানেজার বিশ্বাস মশাই আমাদের সুখসুবিধা বিধানের জন্য অতি তৎপর হয়ে উঠলেন।

বাংলোর বাড়িটি ছবির মতো। মোটা মোটা শালকাঠের খুঁটি বা থামের উপরে টিনের চাল এবং চালের নিচে আগাগোড়া কাঠের আস্তরণ। উঁচু দোতলা বাড়ি, প্রকাণ্ড কাঠের সিঁড়ি। দামী আসবাবপত্রে ঘরগুলো সাজানো। জানালাগুলো সব কাঁচের। সব ঘরেই বিদ্যুতের আলো। দোতলাতেই স্নানের ঘর, শোবার ঘরের সঙ্গে লাগানো। স্নানের ঘরের মেঝে সিমেণ্টের। দুই প্রান্তে দুখানি শোবার ঘর, প্রত্যেক ঘরে দুখানি ক'রে খাট পাতা। বারান্দাটাও অতি চমৎকার। সব সময় সেখানে বসে হিমালয়ের শোভা দেখা যায়। পাহাড়ের সঙ্গে সব সময়েই প্রায় মেঘ লেগে আছে। পাহাড়ের গাঢ় নীল রং ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে সন্ধ্যাবেলা। শুধু এক-একটা জায়গা তখনও উজ্জ্বল সাদা দেখাচ্ছে। পাহাড়ের সেই সেই অংশ প্রবল বৃষ্টিতে ধ্বসে গিয়ে শাদা পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এখানে সমস্ত দিনের পর রাত্রে খাওয়া হল উৎকৃষ্ট সুগন্ধ চালের ভাত ও মাংসের ঝোল। ঘুম হল গভীর।

৩০ নবেম্বর। সকালে হিমালয়ের এ কি অপূর্ব রূপ, এ এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য। সমস্ত পর্বতশ্রেণী উজ্জ্বল বেগুনি রঙে টকটকে হয়ে উঠেছে। ঘষা বেগুনি কাঁচের ফাঁপা পর্বতমালার অভ্যন্তরে যেন হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রঙে লালের আভাই বেশি। যেন আকাশের বুকের উপর শিল্পী এই মাত্র তুলির টানে এই পর্বত শ্রেণী আঁকলেন, রং তখনও কাঁচাই আছে —রঙের মধ্যে এক অবর্ণনীয় আর্দ্র উজ্জ্বলতা। এ রকম দৃশ্য কখনো দেখি নি—কখনো হতে পারে এ রকম কল্পনাও করা যায় নি। এই অভাবনীয় দৃশ্যে আমাদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। এবং এ রং মিলিয়ে যেতে না যেতে আর এক উত্তেজনা। বাইরে চেয়ে দেখি আমাদের জন্য হাতী এসে গেছে।

প্রকাণ্ড উঁচু হাতী। পোষা হাতীদের প্রত্যেকেরই একটি ক'রে নাম থাকে। এটির নাম হচ্ছে ধরমপিয়ারী। "ধুই" শ্রেণীর। ওদের শ্রেণী পরিচয় হচ্ছে এই—

ধুই—প্রৌঢ়া হস্তিনী। কুনকী—স্ত্রী হাতীর সাধারণ নাম।

শারীন—তরুণী হস্তিনী।

মাকনা—পুরুষ হাতী, কিন্তু দাঁতহীন।

দাঁতাল—দাঁতযুক্ত পুরুষ হাতী, 'টাস্কার'।

গণেশ—এক দাঁতের পুরুষ হাতী। এই হাতী সৌভাগ্য-সূচক।

ধরমপিয়ারীকে দেখে বেশ একটা সম্ভ্রম জাগে। প্রকাণ্ড উঁচু হাতী, চোখ দুটিতে একটা সহানুভূতিপূর্ণ অতি সহৃদয় ভাব। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে এমন ভাবে আমাদের দিকে চাইতে লাগল যেন এখন তাকে যা যা করতে হবে সবই সে জানে।

আমি ক্যামেরা তৈরি ক'রে নিতে ঘরে এলাম, তার জন্য দুচার মিনিট দেরি হচ্ছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ দেখি সুশীল পোদ্দার ঘরের মধ্যে ছুটে এসে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ক্রমাগত হাসছেন।

ঘরে এসে গোপনে হাসবার কি কারণ ঘটল, জিজ্ঞাসা করলাম।

সুশীল বাবু কোনো রকমে বললেন, বাইরে হাসলে বেয়াদপি হত—কিন্তু আপনি গিয়ে দেখুন কি ব্যাপার!

গিয়ে দেখি অশোক আগেই হাতীর পিঠে বসেছে। হাতীর ঘাড়ের উপর মাহুত অশোকের বন্দুক হাতে বসে আছে। হাতীটি হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে নিচু হয়ে সুধাংশুকে পিঠে নেবার চেষ্টা করছে। সুধাংশু তার পিঠের দড়ি ধরে ঝুলে দুখানা পা হাতীর পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে পর্বতচূড়ায় ওঠার মতো দুঃসাহসিক কাজে রত। তার দুখানা পা ক্রমাগত ফস্‌কে যাচ্ছে এবং তার ফলে সেও ঘেমে উঠেছে, হাতীও খুব লজ্জা পাচ্ছে।

মিনিট তিনেক এই ভাবে সংগ্রামের পর সুধাংশুকে পিঠে পেয়ে হাতী মস্ত বড় একটা দায় থেকে উদ্ধার পেল। আমি এ দৃশ্য দেখে হাসতে পারলাম না, কেননা এইবার আমার পালা। আমি এগিয়ে যেতেই মাহুতের ইঙ্গিতে ধরমপিয়ারী আমার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে পিঠটা নামিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল। ওজনে হাল্কা হলেও পা ফস্‌কানোর বেলায় আমার অবস্থাও যে একই রকমের হাস্যকর হয়ে উঠেছিল সে কথা আমি প্রতি পদপাতেই বুঝতে পারছিলাম। এ ভাবে হাতীতে ওঠা জীবনে এই প্রথম, এবং যেমন সেদিন মনে হয়েছিল, আজও তেমনি মনে হচ্ছে, এই শেষ। আর যাই হোক, জীবনে হাতীতে ওঠার আর প্রয়োজন হবে না।

হাতী আমাদের নিয়ে গজগমনে এগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু সেই উঁচু হাতীর অরক্ষিত পিঠের অল্প পরিসর জায়গায় তিন জনের (মাহুত সমতে চার জন) ঠেলাঠেলি ক'রে দড়ি ধরে বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। তদুপরি শীতের পোষাকে সবাই আরও মোটা হয়েছি, উপরন্তু আমার এবং সুধাংশুর গলায় একটি ক'রে ক্যামেরা। আমরা সামান্য কিছু দূর যাবার পরই বুঝতে পারলাম এ অবস্থায় ক্যামেরা ব্যবহার করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ দুই হাতে হাতীর পিঠের দড়ি শক্ত ক'রে ধরে থাকতে হবে আত্মরক্ষার জন্য, এবং ক্যামেরাটি গলায় লকেটের মত দুলবে—এতে আমি অন্তত কোনোমতেই আরাম বোধ করব না, তাই অবিলম্বে স্থির করলাম আমি যাব না। কিন্তু সবার সম্মুখে তখনি নামলে সবাই হৈ হৈ ক'রে ছুটে এসে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকবে, তাই একটু দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে সঙ্গীদের কাছে সব বললাম এবং তাদের অনুমতি নিয়ে নেমে পড়লাম এবং ফিরে এসেই বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে জুটে চায়ের কারখানা-ঘরে প্রবেশ ক'রে সব দেখতে লাগলাম।

পূর্ব দিন তাঁকে সব বলা ছিল। তিনি সঙ্গে থেকে থেকে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমে গেলাম বাগান থেকে চা পাতা তুলে এনে আগে যেখানে শুকোতে দেওয়া হয় সেই ঘরে। তারের জালের তাক একটির পর একটি সাজানো, তার উপর কাঁচা সবুজ পাতা লাইন ক'রে ক'রে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটুখানি শুকিয়ে নরম হয়ে এলে কলের সাহায্যে পাতাগুলোকে জড়ানো হয়। সেই কলটির নাম টুইস্‌টিং মেশীন বা পাক-দেওয়া যন্ত্র। দেখতে প্রায় পাকযন্ত্রের মতোই। উপরের একটা তলা থেকে একটা

ছোট ছেলে বসে মুঠো মুঠো পাতা চওড়া নলের মধ্য দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কলের মধ্যে এসে পাক খাচ্ছে। ঠিক যেন গমভাঙা যাঁতা। চা-পাতা পাক খেয়ে খেয়ে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

এর পরের প্রক্রিয়া হচ্ছে এগুলোকে ঐ ঘরের রৌদ্রহীন মেঝেয় ছড়িয়ে দেওয়া। এই অবস্থায় আপনা থেকেই সবুজ পাতা ক্রমে শুকোতে থাকে ও হাওয়ার অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে কালো রং ধরে। তারপর আরও ভাল ক'রে শুকোনোর জন্য গরম ঘরে রাখতে হয়। এর পর বাছাইয়ের কাজ। এই সময়ে গোটা ও গুঁড়ো চা পৃথক হয়।

এখান থেকে বেরিয়ে ওখানকার এক কর্মচারীর সঙ্গে গেলাম চায়ের বাগানে। এঁদেরই বাগান। পাঁচ-সাত শ' একর পরিমিত জায়গা জুড়ে সবুজের সমুদ্র। চা গাছকে ছায়ায় রাখবার জন্য বাগানের ভিতর এক রকম বড় বড় গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এগুলোকে শেড ট্রী বলে। বাংলা নাম কেউ কেউ বলে কড়ুই। এই গাছগুলো ভারি সুন্দর। দশ-বারো হাত বা বেশি দূরে দূরে এক একটি গাছ—ছবির মতো দেখাচ্ছে। বাগানের সমস্ত চা-গাছ ছেঁটে বুক সমান উঁচু করা হয়েছে। এই ভাবে ছেঁটে দিলে অনেক নতুন ডাল গজায় এবং তা থেকে চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। প্রত্যেক ডাল থেকে যে সব নতুন পাতা গজায় তার মাথাগুলো ছিঁড়ে নিতে হয়। মাথার দিকে থাকে দুটি কচি পাতা এবং তার মধ্যেকার অঙ্কুর—এই হচ্ছে চা। সবশেষ প্রান্তের ঐ শীষটুকু ছাড়া অন্য কোনো পাতায় চা হবে না।

বাগানে লাইন বেঁধে কুলিরা আসছে। পুরুষ মেয়ে—নানা জাতীয়। সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে। প্রত্যেকের পিঠে একটি ক'রে ঝুড়ি, কপালের সঙ্গে ফিতে দিয়ে বাঁধা। তারা এসেই চা তোলার কাজে লাগল। তারা এ কাজে এমনই পাকা যে দেখে মনে হয় তাদের আঙুলগুলো চলছে বিদ্যুৎগতিতে। দু হাত এদের সমান চলে। অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু মুখে লাবণ্যের অভাব। মেয়ে-কুলিদের কেউ কেউ তার শিশু সন্তানদের পিঠের থলের পুরে চা তুলছে। শিশুরা নির্জীব অবস্থায় নীরবে ঝুলছে

সেই থলেয়। ওরা বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়বার আগে দু-একটা ছবি নিলাম এবং পাতা তোলার সময়েও নিলাম। এই সময়ে অন্তত এদের মুখে হাসি ফুটেছিল।

চায়ের ফুলগুলো দেখতে বেশ। শাদা ফুল, মাঝখানে হলদে রেণুওয়ালা সরু সরু শোঁয়া। এখানে অনেকে চায়ের ফুল ভেজে খায়—আমরা যেমন কুমড়োফুল বা বকফুল ভেজে খাই।

চায়ের গাছ সাধারণতঃ পনেরো-ষোল হাত লম্বা। খুব দৃঢ় এবং তেজী গাছ। চায়ের গাছে বেশ মজবুত লাঠি হয়। কিন্তু গাছ এত বড় থাকলে তা থেকে চা সংগ্রহ করা যায় না, তাই কেটে-ছেঁটে বুক সমান উঁচু ক'রে দিলে নতুন অনেক ডালও গজায়, সুতরাং চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ করা যায়। চা গাছের বলিষ্ঠ বৃদ্ধি দেখে কচুরিপানার বৃদ্ধির কথা মনে পড়ে।

এই বাগানে চা তোলা দেখা শেষ হলে আমরা ফিরে এসে বিপরীত দিকের আর একটি বাগানে গেলাম। এইখানে বড় বড় চা গাছের বনে কেবল ছাঁটাই কাজ শুরু হয়েছে। যুদ্ধের দরুন মজুর কমে যাওয়াতে ডুয়ার্স অঞ্চলের অনেক বাগানে অনেক দিন কোনো কাজ হতে পারে নি—কাজেই সে সব বাগান জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বড় বড় ধারালো ছুরি দিয়ে কুলিরা চায়ের গাছ কাটছে। তাদের অনেকেরই গা খালি। হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। এদের স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এদের উপার্জন মাসে কুড়ি থেকে সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা। যে যত পরিশ্রম করতে পারে তার উপর উপার্জনের কম বেশি নির্ভর করে। বাগানের তরফ থেকে ওদের র‍্যাশন শস্তায় দেওয়া হয়, কেনা দামের চেয়ে কম দামে। কিন্তু চা-বাগানে অনেকের লাবণ্যহীন রোগা চেহারা দেখে বাইরে থেকে অনুমান করা কঠিন যে এরা সব বিষয়ে ন্যূনতম সুখ-সুবিধা ভোগ করে। করা সম্ভবও নয়। দেশী চা-বাগানে তবু নাকি এরা ইউরোপীয়দের বাগানের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পায়। ইউরোপীয়দের কুলিপ্রীতি তো সর্বজনবিদিত। তাদের পিলে বড় হওয়াও যেমন ছিল অপরাধ এবং তা ইউরোপীয় বুটকে যে অকারণ আকর্ষণ করত সেও ছিল

তেমনি অপরাধ। কিছু দিন পূর্বে এ অঞ্চলের ইউরোপীয় বাগানে কুলিদের বিদ্রোহের ফলে হয় তো অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে।

আমরা ফিরে এলাম প্রায় এগারোটায়। এখানে শীত এখনও খুব বেশি নয়, রাত্রে বাইরে গেলে শীত বেশি লাগে, কিংবা দিনে গাড়িতে ছুটে চললে। খুব মনোরম আবহাওয়া এবং দৃশ্য। তাই বসে উপভোগ করছি আর ডাক্তার অনাদি মিত্রের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করছি—বেলা একটা বেজে গেছে—এমন সময় দূরে ধরম-পিয়ারীর মূর্তি দেখা গেল।

অশোক সুধাংশু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। গণ্ডার দেখা যায় নি। এ সময় দেখায় নাকি অসুবিধাও আছে। যে পথে তাদের চলাফেরা সেখানে কাশবনের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে এখন। তার উচ্চতা হাতীকে ছাড়িয়ে যায়। তা ছাড়া একটা বড় বিপদের হাত থেকে ওরা বেঁচে গেছে। জঙ্গলের ভিতর একটা চোরা গর্ত ছিল, হাতী সেই গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আরোহীরাও যে তার পিঠ থেকে পড়ে যায় নি এটা সৌভাগ্য বলতে হবে। এ রকম দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে, কারণ হাতী চলাফেরায় অত্যন্ত সতর্ক। গর্তের অস্তিত্ব জানতে পারলে এ রকম হত না।

১ ডিসেম্বর। আজ সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম রাজাভাতখাওয়ার পথে। কিন্তু তার আগে কতকটা উল্টো পথে এগিয়ে দলসিংপাড়া স্টেশনটি দেখে আবার ঘুরে চললাম প্রায় রেলপথের পাশ দিয়ে। পথে কালচিনি নামক একটি বড় জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। পথের দৃশ্য আগাগোড়াই খুব চমৎকার। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় এসে পৌছলাম রাজাভাতখাওয়া। এখানকার অ্যাসিস্টাণ্ট ফরেস্ট অফিসার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় অশোকের পরিচিত। গাড়ি থামিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি সুখবর দিলেন, বললেন, খেদায় হাতী তাড়ানো শুরু হয়েছে শুনেছেন, তবে ধরা পড়েছে কিনা এখনও খবর পান নি। সুতরাং আমাদের জইন্তীতে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল হবে। আমরা তখনি উঠলাম সেখান থেকে।

এইবার পথ ক্রমশই উঁচু মনে হচ্ছে, অরণ্যও ক্রমশ গভীর হয়ে আসছে।

দার্জিলিং যাবার পথে ট্রেন-শুকনা ষ্টেশন ছাড়লে অরণ্য এবং উঁচু পথের যে অভিজ্ঞতা হয়, এখানেও ঠিক সেই রকমই মনে হচ্ছিল। ঘোরা-ফেরা পথে আমরা ক্রমেই একটু একটু ক'রে উঁচুতে উঠছি। একটা জায়গা এমন উঁচু যে ট্রাক সেখানে উঠতে খুব বেগ পেয়েছিল। এইবার আমরা আসল হিমালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করছি এই রকম মনে হতে লাগল। এখানকার শাল, সেগুন, শিশুগাছগুলো খুব বড় বড়। অরণ্য কোথায়ও ঝোপে অন্ধকার, কোথায়ও ঝোপশূন্য পরিষ্কার। রাজাভাতখাওয়া থেকে জইন্তী পর্যন্ত যে রেলপথ আছে মোটর পথও প্রায় তার পাশাপাশি। কখনও রেলপথ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, কখনও অত্যন্ত কাছে এসে পড়ছি। সকাল থেকে আমরা দু'জায়গায় মাত্র চা খেয়েছি, সুতরাং আরও একবার গাড়ি থামিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়ার দরকার বোধ করলাম। জনহীন অরণ্য-পথে একটি জায়গায় দেখা গেল খুব বিস্তৃতভাবে কাঠ কাটার কাজ চলছে—সেইখানেই থামলাম। সঙ্গে কিছু রুটি জেলি ছিল, কাঁচা ডিমও ছিল। কিন্তু ডিম খাবার উপায় ছিল না। সুশীলবাবু গাড়ির ইঞ্জিনের গরম বাষ্পে একটি ডিম সিদ্ধ ক'রে খেলেন, কিন্তু এইভাবে একটি একটি ক'রে ডিম সিদ্ধ করতে গেলে সন্ধ্যা হয়ে যাবে আশঙ্কায় আমরা আর অপেক্ষা করা পছন্দ করলাম না। সোজা গিয়ে উঠলাম জইন্তী ডাকবাংলোয়।

জইন্তীর দৃশ্য অবর্ণনীয়রূপে সুন্দর। বাংলোর নিচেই জইন্তী নদী—নদীর পারেই হিমালয়। নদীতে এখন জল বেশি নেই, তার সাদা নুড়ি-বিছানো বুক ধপ্ ধপ্ করছে, বাংলোর দিকের পাড়ের নিচে সঙ্কীর্ণ ঘন নীল নদী তীব্র বেগে পশ্চিম থেকে পূব দিকে বয়ে চলেছে। তার স্রোতের শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যায়। পাহাড়ের চূড়াগুলোর মাথার সঙ্গে মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ আকারে সংলগ্ন হয়ে আছে। রৌদ্র-ছায়ার খেলা চলছে শালবন-আবৃত সুদীর্ঘ পর্বত-শ্রেণীর উপর। প্রবল বর্ষায় ধ্বসে পড়া জায়গাগুলো ছাড়া সমস্ত পর্বতশ্রেণী অরণ্যে ঢাকা। চূড়ার উপরেও বড় বড় গাছের সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গাছগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও দূর থেকে সবই ছোট ছোট গাছের ঝোপ

বলে মনে হয়। প্রথম দেখায় সবই সবুজ বলে ভ্রম হবে, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে অরণ্যের বিচিত্র বর্ণে অবাক হয়ে যেতে হয়। লাল, নীল, হলুদ সব রংই আছে বিভিন্ন ঝোপগুলোতে। পূবদিকে অনেকগুলো চূড়া একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে—সেগুলোর রং গভীর নীল, সেখানে মেঘগুলো একেবারে পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই সমস্ত দিনের পর পরম উপাদেয় খিচুড়ি খেয়ে সুন্দর জায়গায় আসার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। আমরা আড্ডা জমিয়ে বসতে না বসতেই স্থানীয় রেলওয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর অফ ওয়্যার্কস্ শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত শীল খবর পেয়ে আমাদের কাছে এলেন। ইনি অশোকের পূর্ব পরিচিত। খেদায় হাতী ধরা পড়েছে কিনা ইনিও ঠিক জানেন না। খেদার অবস্থান কোথায় তা আমরা বীরেনবাবুর কাছ থেকে জেনে এসেছিলাম। কাজেই হাতী ধরা পড়ুক বা না পড়ুক আমাদের সেইখানে গিয়েই ক্যাম্প করতে হবে এটা প্রায় ঠিকই ছিল। কারণ হাতী ধরা পড়া একটা দৈব-ঘটনা মাত্র, দেখতে হলে খেদার কাছাকাছি জায়গায় থাকাই ভাল। যে খেদায় আমরা এখন যাচ্ছি সে হচ্ছে এখান থেকে একুশ মাইল দূরে আসাম-ভুটান সীমান্তের খুব কাছে। মাঝখানে রায়ডাক নামক একটি প্রশস্ত নদী পার হতে হবে। এ পথটি বরাবর হাতীপোতা হয়ে পূবদিকে গেছে, নদী পার হয়েও পূবদিকে যেতে হবে প্রায় কুমারগ্রাম বা নিউ ল্যাণ্ড পর্যন্ত, সেখান থেকে যেতে হবে সোজা উত্তরে গভীর অরণ্যের দিকে। সেই জায়গার নাম হচ্ছে খুরুল ঝোরা।

কিন্তু আমরা যেখানেই ক্যাম্প করি, হাতী খেদার হাতীর কাছে বা অন্যত্র বাঘের কাছে, তিনি সব জায়গাতেই ঘর তৈরিতে সাহায্য করায় প্রস্তুত। যখন যে ভাবে যে সাহায্য দরকার তাঁকে বললেই তিনি লোকজন, মজুর ইত্যাদি দিতে পারবেন।

অশোক বলল এখন এইখানে চুপচাপ বসে থাকা ভাল লাগছে না, একবার শিকারের সন্ধানে গেলে হয় না? শীল মহাশয় তৎক্ষণাৎ বললেন, সে তো খুব ভাল কথা, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি।

আমি তো ভেবেই পেলাম না কি ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন এত রাত্রে। তিনি বললেন যাবেন তো বলুন।

অশোক মহা উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয় যাব, এবং তখনই শক্তিশালী টর্চ লাইটগুলো ঠিক করতে লেগে গেল। শুনলাম শীল মহাশয় ট্রলিতে ক'রে ডিমার জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবেন অশোককে। সুধাংশুও যাবে বলে প্রস্তুত হতে লাগল। আমার কল্পনায় দিনের আলোয় দেখা সেই অন্ধকার অরণ্য অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় দশটা। কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ ক'রে বলতে হল না, ওরা এক রকম ধরেই নিয়েছিল আমি যাব না, তাই অশোক আমার সম্মান রক্ষার জন্য আগে থাকতেই বলল, তুমি আর এই ঠাণ্ডায় আমাদের সঙ্গে যেয়ো না।

ওরা দশটার সময় বেরিয়ে গেল বাংলো থেকে। ওদের সঙ্গে সুশীল বাবুও গেলেন। আমি একা বসে বসে ডায়ারি লিখছি। এমন সময় একটি লোক এসে (বীরেনবাবুর কাছ থেকে) এক জরুরি খবর বিলি ক'রে গেল। চিঠিখানা অশোকের নামে, ইংরেজীতে লেখা। তিনি খবর দিয়েছেন পাঁচটি হাতী ধরা পড়েছে, অতএব আগামী কাল অতি প্রত্যূষে খুরুল ঝোরায় রওনা হওয়া চাই। পথের নির্দেশও নতুন ক'রে দেওয়া আছে। রায়ডাক নদী পর্যন্ত ট্রাক পার হবার বন্দোবস্ত নেই, সুতরাং সেটি এপারে রেখে খেয়া পার হয়ে যেমন ক'রে হোক, ধার ক'রে ভিক্ষে ক'রে অথবা চুরি ক'রে ওপার থেকে কোনো গাড়ি সংগ্রহ করতে হবে।

চিঠির শেষে লেখা আছে Mr Goswami is really lucky—he has got this opportunity immediately on his arrival.

বীরেনবাবু জানতেন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফোটো নেওয়া, কিন্তু খেদা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা না থাকলেও তখনও আমার মনে একটা সন্দেহের ভাব থেকে গেল।

আমাদের ভ্রমণে একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল এই যে, সুশীলবাবু সঙ্গে একটি ব্যাটারি সেট এনেছিলেন, কাজেই অরণ্য পথে দিন কাটলেও দৈনন্দিন

শেষ খবর রোজই শুনতে পেতাম। এতক্ষণ নানা উত্তেজনায় সন্ধ্যায় অথবা রাত দশটায় খবর শোনা হয় নি—সে কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল। তখন অবশিষ্ট ছিল মাত্র বি বি সি খবর, তাই একা একা বসে শুনতে লাগলাম। নানা প্রোগ্রামে রাত এগারোটা পর্যন্ত বেশ কেটে গেল, কিন্তু তারপর? শিকারীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় অনির্দিষ্টকাল বসে কাটানো যায় না। তারা যাবার সময়েই বলে গিয়েছিল ফিরতে অনেক রাত হবে। তাই বিছানায় আশ্রয় নেবার আগে ডায়ারিটা আরও কিছু এগিয়ে রাখলাম।

শিকারীরা ফিরে এলো রাত প্রায় দু'টোয়। ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম কিছু মেলে নি। খুবই স্বাভাবিক, কারণ শিকার কখন মিলবে তা কেউ আগে বলতে পারে না। এই অনির্দিষ্টতাই যে শিকারের একটি প্রধান আকর্ষণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ডুয়ার্স অঞ্চলে অনেককেই হিংস্র জন্তুর সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে হয়, তবে এ অঞ্চলের বাঘ মানুষকে নাকি আক্রমণ করে না। তবু এদের সংখ্যাধিক্যে এ অঞ্চলে শিকারীদের আনাগোনা বেশি। টাইগারের সংখ্যা নাকি খুব বেড়ে গেছে এখন। শীল মহাশয় বললেন, একদিন রেল-লাইনের উপর দু'টো টাইগার শুয়ে ছিল, রেলগাড়ির ইঞ্জিন তাদের সম্মুখে থেমে হুইস্‌ল বাজাতে লাগল, কিন্তু ওরা তা সত্ত্বেও নড়ল না। তারপর এক সাহসী ড্রাইভার কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের রেল-লাইনের উপরকার অনধিকার অবস্থানের বিষয়ে চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হল। আর এক দিন কয়েকজন লোকের সামনেই বাঘ একটা গোরুকে ধরে নিয়ে গেছে।

এ দিককার জঙ্গলে হাতী, বাঘ, ভালুক, বাইসন, হরিণ, শূয়োর এবং সাপ আছে। তা ছাড়া ময়ূর এবং মুরগীও আছে। আসবার সময় বন্য মুরগী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নি। জঙ্গলের মধ্যে এখানকার লোকেরা বাঘের চেয়েও হাতীকে ভয় করে বেশি। কারণ মানুষের শব্দ পেয়ে বাঘ সর্বদাই প্রায় গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু হাতীর শব্দ পেলে মানুষ পালাবার পথ খুঁজে

পায় না, বিশেষ ক'রে যূথভ্রষ্ট পাগলা হাতী যদি হয়। পাগলা হাতীর সম্মুখে পড়লে কারো আর বাঁচবার আশা থাকে না।

২ ডিসেম্বর। ভোরে উঠে চা খেয়েই আমরা খুরুল ঝোরার দিকে রওনা হলাম ট্রাকে ক'রে। হিমালয়শ্রেণীর সমান্তরালভাবে পূবদিকে ষোল মাইল যাবার পর রায়ডাক নদী। হিমালয়ের কাছে এত বড় নদী এদিকে এই প্রথম দেখলাম। নদীর মাঝখানে চর, দু'দিকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এক দিকে পায়ে হেঁটে পার হবার মতো সেতু, তারপর চর পার হয়ে খেয়া-নৌকো। নদীর চরে নুড়ির অবর্ণনীয় শোভা। রোদের আলোয় সমস্ত চরে যেন সাদা আগুন জ্বলে উঠেছে। তারই উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা উঠলাম খেয়া নৌকোয়। ট্রাক এ পারে রেখে যেতে হল। নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে দেখা গেল আমাদের পিছনে একখানা মোটর গাড়ি এ পারে আসছে। ছোট গাড়ির পক্ষে নৌকোয় পার হয়ে আসার কোনো অসুবিধা ছিল না। গাড়ির মালিককে অশোক দূর থেকেই চিনতে পারল। সে দাঁড়িয়ে গেল নদীর পাড়ে, আমাদের বলল এগিয়ে যেতে। শীল মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর ছিল গাড়ির ক্লীনার লালু। আমরা চার জন হেঁটে যেতে লাগলাম নিউ ল্যাণ্ডের প্রশস্ত পথে। পথের দু'ধারে চায়ের বাগান। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সেই গাড়িখানা এসে পড়ল, অশোকও এসেছে সেই গাড়িতে। সে বলল আপাতত আর একজন যেতে পারে সে গাড়িতে, খুরুল ঝোরায় গিয়ে গাড়ি আবার ফিরে আসবে, তখন আর সবাই যাবে। সুধাংশুকেই আগে ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা কাছেই একটা বাংলোয় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

গাড়ি ফিরে এলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। গাড়ির মালিকও এসেছেন। তিনি শুধু গাড়ির মালিক নন, হাতীখেদার মালিকও তিনি। মালিক অর্থাৎ ইজারাদার। নাম রায় সাহেব অন্নদানাথ রায়। নীলপাড়া স্যাংচুয়ারির গেম ওয়ার্ডেন ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। ইনি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় শিকারী। পঁচিশটি টাইগার ইনি নিজে গুলি ক'রে মেরেছেন এবং অন্তত পাচ-শ শিকার পার্টির নেতৃত্ব করেছেন। পাকা শিকারী হিসাবে ইউরোপীয়ান

শিকারীর কাছে বিশেষ মাননীয়। বাঘের মতোই তেজী লোক এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ইনি তাঁর গাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন খুরুল ঝোরায়। ঐখান থেকে খুরুল ঝোরা পাঁচ মাইল। গভীর অরণ্য-পথ। পথ সব জায়গাতেই কাঁচা এবং খাড়া উঁচু এবং নিচু। গাড়ির পথ সে নয়।

আমরা খেদার ধারে গিয়ে নামলাম। চারদিকে জঙ্গল, পায়ের নিচে বালি আর ভাঙা পাথর। দু-এক পা এগিয়ে যেতেই অন্নদা বাবু সেই বালির উপর বাঘের সন্ত আঁকা পদচিহ্নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমরা তো দেখে অবাক। একটা থাবার দাগ ছোটখাটো একটা হাতীর পায়ের দাগের মতো। রাত্রে বড় বাঘ এ পথে গেছে, পায়ের চিহ্ন তখনও টাটকা আছে। আমাদের চোখে এ চিহ্ন ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু শিকারীদের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ।

হাতীর দলকে জঙ্গল থেকে তাড়াতে তাড়াতে যে ফাঁদের পথে নিয়ে আসা হয় সে পথের দু'ধার জঙ্গল থেকে সন্ত কাটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। হাতী পাছে এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে তাই সেই বেড়াকে ডালপালা এবং পাতা দিয়ে এমন ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে ওটা যেন জঙ্গলেরই একটা অংশ। এই পথে হাতীর দল এসে যেখানটায় আটকা পড়ে তাকে বলে গড়। এই গড় এবং গড়ে আসবার পথ ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে নাম হচ্ছে খেদা। আমরা কাঞ্চন পাতা দিয়ে 'কামুফ্লাজ'-করা এই দীর্ঘ পথের পাশ দিয়ে গড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। পথের পাশে দু-একটা গাছে অনেক উপরের দিকে মাচা বাঁধা রয়েছে দেখলাম। হাতী আসবার সময় ঐখানে পাহারা বসেছিল। বহুদূর থেকে তাড়া খেয়ে হাতীর দল ফাঁদে ঢুকতে বাধ্য হয়। চার দিকে বহু লোক হল্লা করে, বোমার আওয়াজ করে এবং হাতীরা ভয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? এমন ভাবে তাড়ানো হয় (একে beat করা বলে) যাতে খেদাপথে না এসে আর তাদের উপায় থাকে না। এই পথের শেষে গড়। গড়ের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এই গেটের কাছে যে সব লোক থাকে সে সময় তাদের সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়।

আমরা গড়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখি চার দিকে বেশ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। তখনই অনেক লোক এসেছে দেখতে।

পথে অন্নদা বাবুর সঙ্গে দর্শকদের এই ভিড় সম্পর্কেই আলাপ হয়েছিল। তিনি বলছিলেন এত লোক আসে যে তাদের জায়গা করা শক্ত হয় এবং তাতে কাজেরও অনেক সময় অসুবিধা হয়। কিন্তু বৎসরান্তে বুনো হাতী ধরার দৃশ্য এ অঞ্চলের লোকেদের জীবনে হয় তো একমাত্র উত্তেজনা এবং আনন্দ। তাই দূর দূরান্তর থেকে কাজ ফেলেও বহু স্ত্রী-পুরুষ খেদায় এসে ভিড় করে। আমরা যখন গেলাম তখন বেলা এগারোটা। সে সময় লোকের ভিড় বেশি হয় নি —হয়েছিল ঘণ্টা দুই পর থেকে।

গড়ে আবদ্ধ হাতীদের দেখবার জন্য মোটামুটি ভাল বন্দোবস্তই করা হয়েছে দেখলাম। গেটের দুই পাশে দুটি মাচা ও বিপরীত দিকে আর একটি মাচা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একএকটা মাচায় বারো-তেরো জন লোক কষ্ট ক'রে দাঁড়াতে পারে। আমরা গেটের ডান ধারের মাচায় গিয়ে উঠলাম। সরু সরু গাছ কেটে মাচায় ওঠার জন্য মৈ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাঁশের সিঁড়িও আছে। আমরা মাচায় উঠে দেখলাম বাঁ দিকের মাচায় অশোক ও সুধাংশু দাঁড়িয়ে।

গড়ের ব্যাস পঁচিশ-ত্রিশ হাত। চার দিক সরু সরু গাছ কেটে তাই দিয়ে গোল ক'রে ঘেরা। গাছের বাকলের আঁশ সব জায়গাতেই বাঁধার কাজে দড়ির মতো ক'রে ব্যবহার করা হয়েছে। মাচার বাঁধনগুলো টেনে দেখলাম, তা পাটের চেয়ে ঢের বেশি শক্ত।

মাচায় উঠে দেখলাম পাঁচটি বন্দী হাতীর মূর্তি। ওদের মধ্যে তিনটি বড় ও দুটি ছোট। বাচ্চা ছোট হাতী দুটোর একটি দাঁতওয়ালা। বড় হাতীদের একটিকে বৃদ্ধা বলে মনে হ'ল। গড়ের মধ্যে ওরা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বন্দী অবস্থাটা ওদের মোটেই ভাল লাগছে না। এক এক সময় মরীয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বেড়ার উপর—বেড়া ভেঙে বেরিয়ে যাবে বলে। কিন্তু তখুনি বাইরের পাহারাদারের শড়কির খোঁচা খেয়ে ফিরে আসছে। এই ব্যবস্থা

না থাকলে ওদের পক্ষে সেই কয়েদখানা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন নয় বলেই মনে হ'ল এবং এ রকম সম্ভাবনা আছে বলেই চার দিকে এবং উপরে মাচার উপর সতর্ক প্রহরী খাড়া আছে। শেষ পর্যন্ত বন্দুকের ব্যবহারও হতে পারে বলে সে ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে।

আমি যে মাচার উপর দাঁড়িয়ে ওদের ছবি নিচ্ছিলাম সেই মাচা গড়ের গেট এবং বেড়ার সঙ্গে সংলগ্ন। হাতীর আক্রমণে তা বার বার কেঁপে উঠছিল। একবার একটা হাতী শুঁড় তুলে হাঁ ক'রে ছুটে এসে আমার পায়ের নিচেই মারল খুব জোর এক ধাক্কা। সে ধাক্কায় একেবারে গড়ের ভিতরেই আমি পড়ে যেতাম, কারণ আমার দুখানা হাতই ছিল ক্যামেরায় আবদ্ধ। সুশীল বাবু আমাকে ধরে ফেললেন। চেয়ে দেখি আমার পাশে গেটের উপর থেকে একটি ছেলে শড়কির খোঁচা মেরে হাতীকে হটিয়ে দিল। তখন সে গিয়ে চুপচাপ অন্য হাতীদের সঙ্গে অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। কিছুক্ষণ পরেই ঐ হাতীটি নিজেদের দলের বাচ্চা দাঁতওয়ালা হাতীটির উপর হামলা চালাতে লাগল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওরা দল বেঁধে গড়ের মধ্যে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পিঠে ওদের রোদ লাগছিল, ওরা জঙ্গলে থাকে, এতক্ষণ ধ'রে বোধ হয় কখনও রোদে থাকে নি, তাই ওদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশলটিও বেশ অদ্ভুত লাগল। মাঝে মাঝে সম্মুখের একখানা পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে গুঁড়ে ক'রে সেই মাটি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে একদল সাহেব মেম এসে উঠল বাঁয়ের দিকের মাচায়। ওদের দু'জনের হাতে ক্যামেরা।

বড় হাতীটি অতঃপর পাঁচ-সাত মিনিট পর পরই আক্রমণ চালাতে লাগল। এরা জঙ্গলে যখন থেকে তাড়া খাচ্ছে তখন থেকে অবশ্য ভাল ক'রে খেতে পারে নি। যে পথে এসে এরা গড়ের মধ্যে ঢুকতে বাধ্য হয় সেই পথে কলাগাছ কেটে কেটে পর পর ফেলে রাখা হয়, যাতে অন্ততঃ সেই পথে আসার একটা লোভ জাগে। গড়ে আটকা পড়বার পর থেকে আর বিশেষ কিছু খেতে দেওয়া হয় না,

কারণ এদের গলায় ফাঁস পরানোর কাজটি এমনই কষ্টসাধ্য যে তার আগে এরা অনেকখানি দুর্বল হয়ে না পড়লে চলে না। বন্য হাতী, বন্দী হয়ে একেবারে ঘাবড়ে গেছে। এরা রাগে ক্ষোভে খিদেয় অস্থির হয়ে এক এক সময় মেঘের মতো গর্জন করছে, কখনও বা কান্নার মতো শব্দ করছে।

শুনলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফাঁস পরানোর কাজ শুরু হবে। আমি ইতিমধ্যেই নেমে পড়ে গড়ের চার পাশের অবস্থা ভাল ক'রে দেখতে লাগলাম। বাইরের নানা গ্রাম থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। ঘুরে ঘুরে কয়েকটা বাইরের ছবি নিলাম। রাত্রে গড়ের পাশে আগুন জ্বালানো হয়েছিল দু'তিন জায়গায়। মোটা মোটা কাঠের আগুন, তখনও নেবে নি, তারই পাশে তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট উঁচু চালা বাঁধা। তার মধ্যে বসে লোকেরা গড় পাহারা দিয়েছে সমস্ত রাত ধরে। আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য শীতের জন্যও বটে, রাত্রে ঐ রকম অরক্ষিত জায়গায় বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তুকে দূরে রাখবার জন্যও বটে।

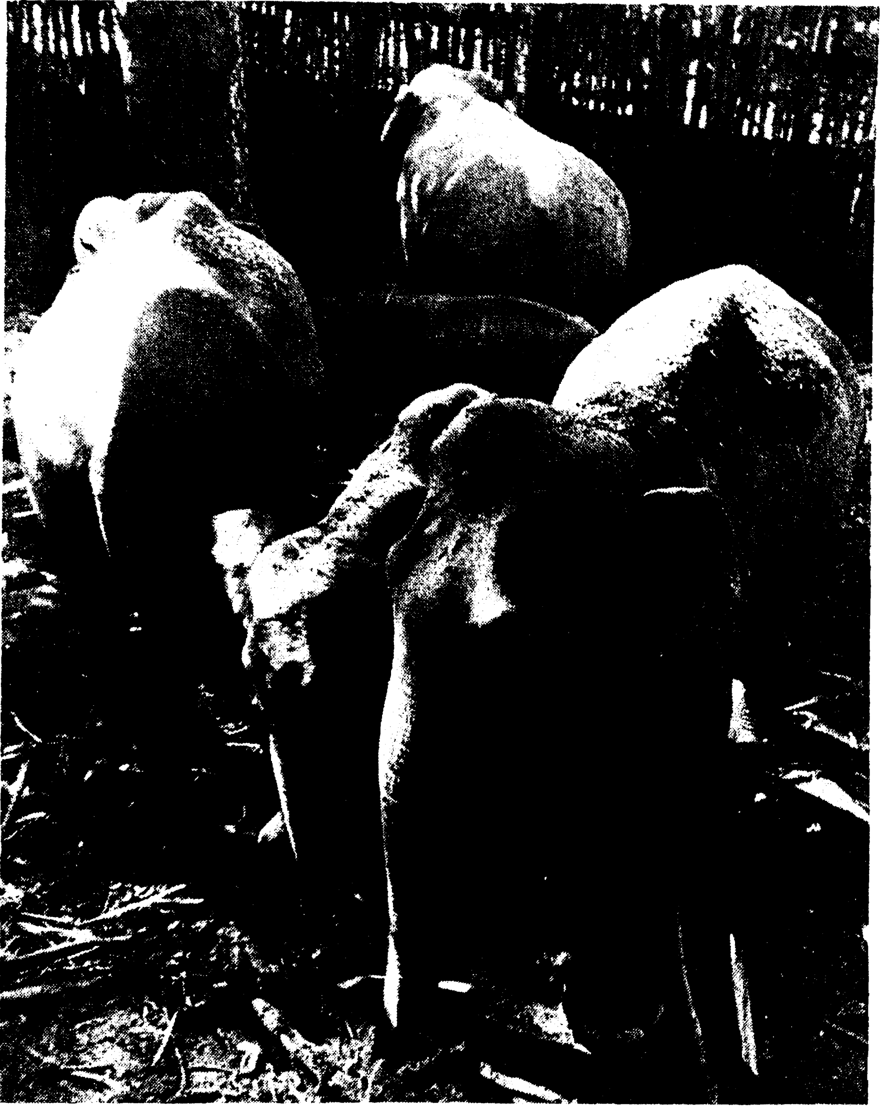
৩

অন্নদাবাবু ইতিমধ্যে খেদা থেকে একটু দূরে অবস্থিত তাঁর ক্যাম্পে গিয়েছিলেন, অশোকও সেখানে গিয়েছিল। ওরা ফিরে এলো প্রায় দুটোর সময়। অন্নদাবাবুর কাছ থেকে জানা গেল এইবার বুনো হাতীর গলায় ফাঁস পরানোর কাজ আরম্ভ হবে, সুতরাং ফোটোগ্রাফ তোলার জন্য আগে থাকতেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। তিনি তৃতীয় মাচাটি দেখিয়ে বললেন এইখানে উঠুন। কিন্তু সে মাচায় তখন এত লোক যে সেখানে ওঠা অসম্ভব। অন্নদাবাবু তা দেখে সেখান থেকে তাদের নামিয়ে দিলেন। আমি উপরে উঠেই বুঝতে পারলাম অন্নদাবাবু ঠিকই বলেছেন, কারণ একমাত্র এইখানে দাঁড়ালেই সূর্য প্রায় পিছনে থাকে। অন্য দুটি মাচায় দাঁড়ালে সূর্য পড়ে যায় চোখের উপর, সুতরাং ক্যামেরার লেন্সেরও উপর। তবে এখানেও একটি অসুবিধা আছে। গড়ের বেড়ার গাছ-গুলোর কয়েকটা একটু বেশি উঁচু—ক্যামেরাকে বাধা দেয়।

আমি মাচাটি যে সম্পূর্ণ একা পেলাম তা নয়, একজন ভদ্রলোক ওখানে গড়ের মধ্যে কলাগাছের এক একটা টুকরো মাঝে মাঝে ফেলছিলেন বুনো হাতীদের মধ্যে। তিনি রইলেন, তা ছাড়া আরো অনেকে উঠে এলো একটু পরেই। ইতিমধ্যে দূর দূরান্তর থেকে বহু দর্শক এসে পড়েছে, তারমধ্যে বাঙালী মেয়েও আছে অনেক। ইউরোপীয় ভদ্রলোক দু'জনও ক্যামেরা নিয়ে আমার ডান ধারের মাচা থেকে আমার পাশে উঠে এলেন। কিন্তু যত লোক এসেছে তাদের সবার জায়গা তিনটি মাত্র মাচার উপর হতে পারে না, তারা গড়ের বেড়া বেয়ে উপরে উঠে অথবা নিচে দাঁড়িয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল।

আমার ঠিক বিপরীত দিকেই গড়ের দরজা, সেও সরু সরু গাছ কেটে তৈরি। পোষা হাতীর দল এই দরজা দিয়েই এসে ঢুকবে গড়ের মধ্যে, তাদের প্রত্যেকের পিঠে থাকবে একজন করে মাহুত, বুনো হাতীর গলায় ফাঁস পরাবার জন্য।

পোষা হাতী আসবার সময় হয়ে গেছে। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে, তবু কেন যেন দেরি হচ্ছে। নিচে কত দেশের লোককে দেখা যাচ্ছে। নেপালী, ভুটিয়া, হিন্দুস্থানী, শিখ, বাঙালী সব জাতীয় মেয়ে-পুরুষ। আমি ক্যামেরা প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে আছি। এমন বিপজ্জনক জায়গা যে একটু অন্যমনস্ক হলে গড়ের ভিতরে পড়ে যাব। অথবা ডানধারে এক ইঞ্চি পা ফস্‌কালে বাইরে পড়ব। দু'দিকেই বিপদ। একদিকে বুনো হাতী, আর একদিকে খোঁচা খোঁচা বাঁশ ও কাঠের প্রান্ত। মাচাটি টুকরো বাঁশ পাশাপাশি বেঁধে তৈরি, চেরা বাঁশ নয়, আস্ত গোল গোল। ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, প্রত্যেক দুটি বাঁশের মাঝখানে একটু করে ফাঁক আছে। সমস্ত মাচাটা চার সাড়ে চার হাত লম্বা-চওড়া। তার উপরে তখন আমরা অন্ততঃ ছ'জন লোক আছি, আমার পিছনে আমাদের ট্রাক চালকের সহকারী লালু নামক একটি ছেলে। আমার রক্ষক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে সে—যদি হঠাৎ পা ফস্‌কে যায় সে আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাকেই দু'বার পড়ে যাওয়ার হাত থেকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম।

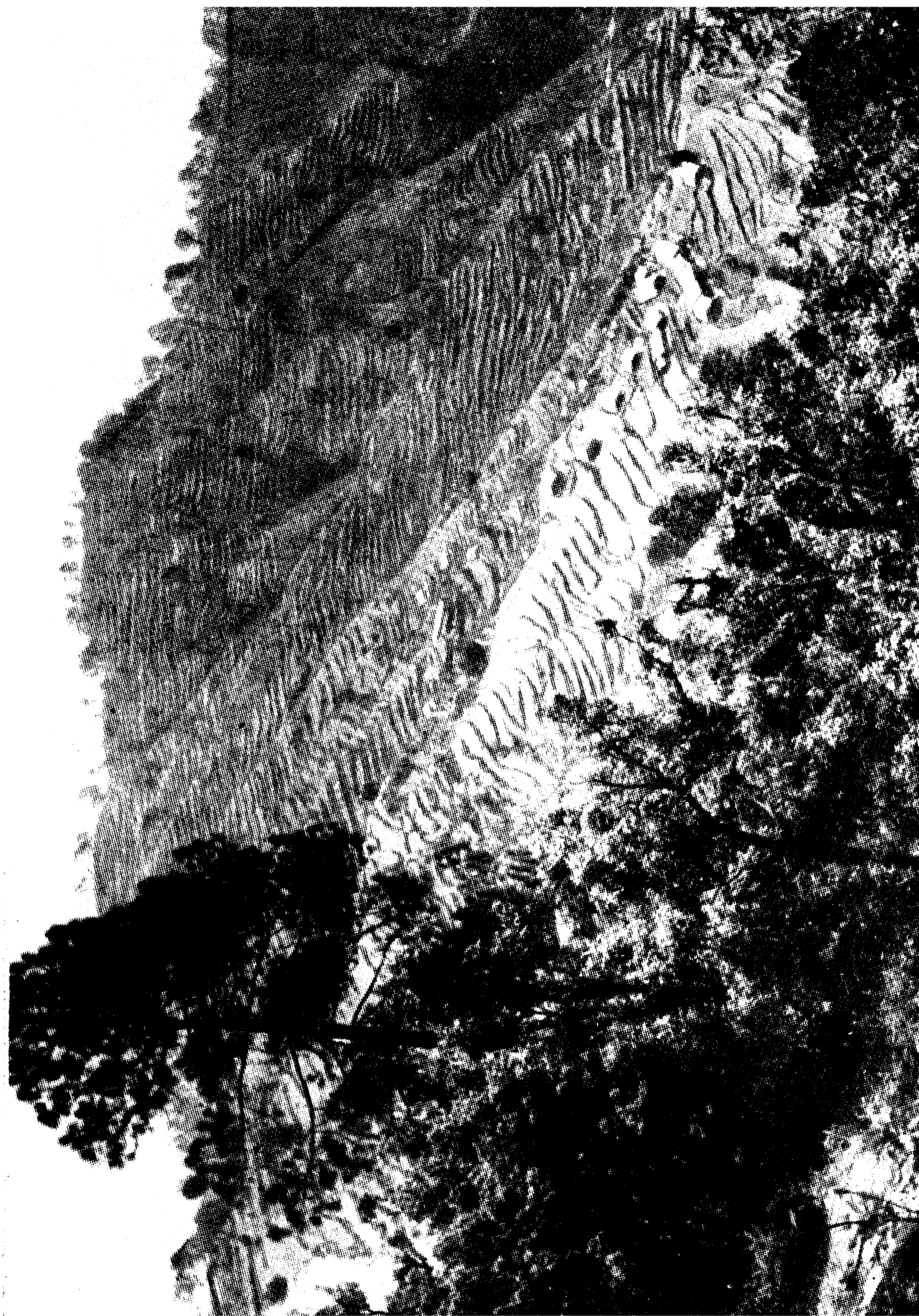


খেদায় বন্দী হাতীরা

('দুয়ারের পথে' দ্রষ্টব্য।)

বিপরীত পৃষ্ঠায় ল্যান্সডাউনের

ধান চাষ। ('পশ্চিম হিমালয়ের পথে' দ্রষ্টব্য)



গড় পনেরো-ষোল হাত উঁচু এবং ভিতরের গোল আঙিনার ব্যাস হবে প্রায় পঁচিশ হাত। বাইরের দিকে মোটামোটা কাঠ দিয়ে কয়েক হাত পর পর গড়ের বেড়াকে ঠেলে রাখা হয়েছে গড়কে বেশি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। গড়ের ঠিক মাঝখানে একটি আধ-মোটা গাছ।

এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা অবশ হয়ে আসছে, মাঝে মাঝে উপর থেকে ঝুলে-পড়া সরু একখানা ডাল ধরে বিশ্রাম করছি। সেও খুব নির্ভরযোগ্য নয়, সুতোর মতো সরু এবং শুকনো। এমন সময় পোষা হাতীর পিঠে মাহুতদের মাথা দেখা গেল গড়ের দরজার বাইরে পাতাঘেরা পথে। তারা দরজার কাছে এগিয়ে আসামাত্র মুহূর্তে কি এক কাণ্ড ঘটে গেল। তাদের সাড়া পেয়েই গড়ের ভিতরের বুনো হাতীরা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। এ রকম সদলবলে গড়ে অনধিকার-প্রবেশকারীদের উপর হঠাৎ আক্রমণ দেখে বোঝা গেল ওদের বেরোবার পথ থাকলে কত সহজে শত্রুদের বাধা চূর্ণ করে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ওদের এই আক্রমণ এখন সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

গেটের সঙ্গে সংলগ্ন যে মাচাটি ছিল ইতিপূর্বে সেই মাচাটিতেই আমি ছিলাম। হাতীর আক্রমণে তা বার বার কেঁপে উঠছিল। কিন্তু এখন যে মাচায় আছি তা গড়ের বেড়া থেকে তিন-চার ইঞ্চি তফাতে, তাই ছবি নেওয়ার পক্ষে সে দিক দিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত। কিন্তু বন্য হাতীকে প্রথম ফাঁস লাগিয়ে বাঁধার কাজ যে এমন আশ্চর্যরকমের একটি জটিল ব্যাপার সে বিষয়ে আমার কোনোই ধারণা ছিল না। এর মধ্যে বিস্ময়কর কৌশল, দৈহিক শক্তি, খেলার ওস্তাদি এবং চরমতম নিষ্ঠুরতার যে সব ভয়ঙ্কর উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য দেখলাম তাতে ছবি তুলব, না সেই খেলা দেখব, তা ঠিক করাই হল বিষম সমস্যা। এ কথা সত্য যে আগে যদি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা থাকত তা হলে আরও অনেক রকম অবস্থার ছবি নেওয়া যেত।

প্রথমে ছ'টি হাতী ঢুকল গড়ের মধ্যে, তিনটি বাইরে রইল। ওরা ঢুকেই বুনো হাতীগুলোকে অতি প্রবল বেগে আক্রমণ করতেই বুনো হাতীগুলো হঠাৎ

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ওরাও ফিরে আক্রমণ করার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পোষা হাতীদের অতি হিংস্র আক্রমণের মুখে ওদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হতে লাগল, ওরা বুনোদের মুখ ফেরাতেই দিল না।

এই পোষা হাতীগুলো এদের চেয়ে আকারে অনেক বড় এবং ওদের মধ্যে মাকনা এবং কুনকী দুইই আছে। দাঁতাল হাতীর দু-একটার দাঁত সম্মুখের দিকে করাত দিয়ে কাটা। ওরা মাথা দিয়ে এবং দাঁত দিয়ে ওদের পিছন থেকে চার্জ করতে লাগল। তিনটি অনভিজ্ঞ হাতীর পিছনে (ছোট দুটিকে তো দেখাই যাচ্ছে না)—অতগুলো ওস্তাদ হাতী। মাহুত পোষা হাতীর মাথায় ক্রমাগত শড়কির খোঁচা মারছে আর মুখে একরকম শব্দ করছে—খোঁচার ঘায়ে ওদের মাথা দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে রক্ত ঝরছে আর ক্ষেপে গিয়ে বুনো হাতীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবে আক্রমণ চালাতে চালাতে ওরা বুনোদের গড়ের এক পাশে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল। বাচ্চা দুটো হাতী বড় তিনটির মধ্যে সর্বদা লুকিয়ে আছে, মাঝে মাঝে তাদের পা দেখা যাচ্ছে। ওরা কোণঠাসা হয়ে আছে আর পিছনের হাতীরা ওদের দাঁত দিয়ে, মাথা দিয়ে, এবং শুঁড় দিয়ে এমন চেপে রেখেছে যে কয়েক মিনিট সবাই যেন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকা যায় না। পিছনের হাতীগুলোর চাপ একটু কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এক বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সমস্ত গড় একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। এমন উত্তেজনাপূর্ণ খেলা ইতিপূর্বে আর দেখি নি।

মাহুতদের পিঠে নিয়ে আক্রমণকারী হাতীগুলো উন্মাদের মতো বুনো হাতী-গুলোর গায়ে যেখানে-সেখানে আঘাত হানতে লাগল। নিচের ধুলো-বালি উড়ে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ধোঁয়াটে হয়ে গেল। মাহুতরা ঘেমে উঠল। তারা তাদের হাতীদের মাথায় ক্রমাগত শড়কির খোঁচা মেরে উত্তেজিত হিংস্র হাতীগুলোকে আরও হিংস্র করে তুলতে লাগল। মাহুতরা তাদের পা হাতীর গলায় জড়ানো জালের মধ্যে দু'পাশ থেকে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে, নইলে এ রকম অবস্থায় তারা যত ওস্তাদই হোক নিচে পড়ে যেত।

আমার ডান দিকের মাচায় অন্নদা বাবু এক কোণে বসে খেলার মাঠের দর্শক যেমন নিজের দলকে চিৎকার ক'রে উৎসাহ দেয় তেমনি ভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন মাহুতদের। সুধাংশুর ক্যামেরার লেন্সে সোজা সূর্যের আলো লাগছে, অতএব ক্যামেরা ছেড়ে হাতীর লড়াই দেখছে। অশোকও খুব উত্তেজিতভাবে তার পাশে দাঁড়িয়ে। সম্মুখের মাচায় সুনীল বাবু ও শীতলা বাবু এবং আরও দশ বারো জন দর্শক। গড়ের বেড়া বেয়ে বহু লোক উপরে মাথা বের ক'রে লড়াই দেখছে। নিচে তো দাঁড়াবারই জায়গা নেই।

বুনো হাতীগুলো একে তো ক'দিন অর্ধাহারে দুর্বল, তার উপর এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ—এ যেন আর সহ্য করতে পারছে না। ওদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাচ্চাগুলোকে এই বিপর্যয়ের অবস্থাতেও চেপে আড়াল ক'রে রাখছে। ওরা হাঁপাচ্ছে—কিন্তু তবু হয় তো আশা করছে এর পরেও ওরা পালাবার পথ পাবে, তাই ওরা প্রাণপণ শক্তিতে বিদ্রোহ ক'রে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

পোষা হাতীদের এই স্বজাতিবিদ্বেষ কেমন অদ্ভুত লাগে। মনে হয় যেন এক দিন ধরা পড়ে ওরা যে অত্যাচার নিজেরা সহ্য করেছে, আজ ঠিক সেই অত্যাচারই চালাচ্ছে ওরা নতুন-ধরা হাতীদের উপর।

মাহুতদের হাতে মোটা দড়ির ফাঁস। এইবার তারা ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগল কোন্ ফাঁকে তা ওদের গলায় পরাবে। কিন্তু অবস্থা যা দেখা গেল তাতে কাজটি মোটেই সহজ নয়। বুনো হাতীরা সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার না করলে ফাঁস পরানো প্রায় অসম্ভব।

এইবার গড়ের মাঝখানের গাছটি ঘিরে ওদের লড়াই চলতে লাগল। বুনো হাতীদের উপর শুধু পোষা হাতীর আক্রমণ নয়, মাহুতরাও তাদের শড়কি দিয়ে ওদের মাথায় খোঁচা মারতে লাগল।

শুধু বুনো হাতীরাই যখন গড়ের মধ্যে ছিল তখন তাদের শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এখন দেখছি তারাই ক্রমে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ছে পোষা হাতীদের আক্রমণে। ফাঁস হাতে ক'রে মাহুতরা তাদের হাতীগুলোকে যখন

বুনো হাতীদের উপর নিয়ে ফেলল তখন ওদের আর এক ইঞ্চিও নড়বার উপায় রইল না। বুনো হাতীগুলো গড়ের বেড়ার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে পরস্পর গায়ে গায়ে কঠিনভাবে এঁটে দাঁড়িয়ে আছে—পোষা হাতীরা রয়েছে তাদের পিছনে। এ অবস্থায় বুনোদের গলা অনেক দূরে থাকায় ফাঁস পরানো সম্ভব হল না। ফাঁস পরাতে হলে দুটো পোষা হাতীর সাহায্যে দু'দিক থেকে একটা বুনো হাতীকে চেপে ধরা দরকার, কিন্তু সে আর কিছুতেই হয়ে উঠছে না। বুনো হাতীরা আত্মরক্ষার জন্ত মরীয়া হয়ে উঠেছে। পোষা হাতীরা গোড়া থেকেই প্রয়োগ করছে পশুশক্তি, কিন্তু বুনো হাতীদের আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই, তাই তারা পাণ্টা প্রয়োগ করছে শুধু তাদের বুদ্ধিকৌশল। ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে যে শত্রুপক্ষ তার শেষ অস্ত্র হেনে ওদের বন্দী করবে—তাই ওরা অদ্ভুত চাতুর্যের সঙ্গে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কিন্তু ওরা হয় তো এখনও জানে না যে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত প্রবল শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

পূর্বোক্ত অচল অবস্থা দু'তিন মিনিট স্থায়ী হল। তার পরেই আরম্ভ হল নতুন আর একটা যুদ্ধ। এবারেও ঠিক আগের মতোই সমস্ত আঙিনায় ধুলো উড়িয়ে ওরা সমস্তটুকু জায়গায় পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। মিনিট পাঁচেক লড়াইয়ের পর হঠাৎ সুযোগ পাওয়া গেল ছোট্ট দাঁতাল হাতীটার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবার। তখন খেলার মাঠে এক পক্ষে গোল হলে বিজয়ী দলের সমর্থকেরা যেমন উল্লাস প্রকাশ করে তেমনি একটা জয়ধ্বনি শোনা গেল খেদার লোকদের মুখ থেকে। হঠাৎ আমার ডান ধারের মাচার দিকে চেয়ে দেখি অশোক এবং সুধাংশু সেখানে নেই—তাদের জায়গায় বহু বাঙালী মহিলা। তাঁরাই যে ক্রমশঃ ওদের স্থানচ্যুত করেছেন তাতে আর সন্দেহ রইল না। কোণে শোলা হ্যাটের নিচে অন্নদাবাবুর মুখখানা দেখা যাচ্ছে—তিনি একটি হাতী বাঁধা পড়াতে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন।

ফাঁস লাগিয়ে বাচ্চা হাতীটাকে পোষা হাতীর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর তাকে বাইরে নিয়ে যাবার পালা। কিন্তু এই বাইরে নিয়ে যাওয়া দেখলাম একটা মস্ত বড় সমস্তা। বাচ্চা হাতী বেঁকে দাঁড়াল, সে কিছুতেই যাবে

না। সে এমন শক্ত ভাবে দাঁড়িয়েছে যে তাকে স্থানচ্যুত করে কার সাধ্য! প্রকাণ্ড পোষা হাতী তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও হিমসিম খেয়ে গেল। একখানা স্টীমার নদীর চড়ায় আটকে গেলে অন্য স্টীমার তাকে দড়ি বেঁধে টানতে থাকে কিন্তু নড়াতে পারে না, সেই ছবিটিই মনে পড়ল এই টানাটানির দৃশ্য দেখে। এদের মাঝখানে অতিরিক্ত শুধু একটি গাছের বাধা। পোষা হাতী এক দিকে প্রাণপণ টানছে, বাচ্চা হাতী গড়-মধ্যস্থ সেই গাছের সঙ্গে দড়ি বাধিয়ে আর এক দিক থেকে টানছে—ফলে কেউ কোনো দিকে সরছে না।

এ দিকে অন্যগুলোর উপর আবার পোষা হাতীর আক্রমণ শুরু হল। ঐ অল্প পরিসর জায়গার মধ্যে সেই আক্রমণের ধাক্কা এসে লাগল ছোট হাতীটার উপর, এবং তার ফলে সে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হল, আর ঠিক সেই সুযোগে বড় হাতীটা ওকে এমন জোরে টান মারল যে সে তার বেগ সামলাতে না পেরে একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে হাঁ ক'রে ফেলল। গলার ফাঁস কঠিন হয়ে এঁটে গেছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য! তাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে বেশ কিছু সময় লাগল।

ইতিমধ্যে আক্রমণ চলতে চলতে বড় আর একটার গলায় ফাঁস পরানো দেখলাম। স্টীমার-বাঁধা দড়ির মতো মোটা দড়ির ফাঁস মাহুতরা সর্বক্ষণ হাতে ক'রে লড়াই চালায়, এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র বুনো হাতীর মাথার উপর তা ফেলে দেয়, কিন্তু যত বার ফেলে তত বার সে শুঁড় দিয়ে সেটাকে নামিয়ে দেয়। নামানোর সময় শড়কির খোঁচা পড়ে মাথায়—কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। এইভাবে বহু বারের ব্যর্থ চেষ্টার পরে তবে সফল হওয়া যায়।

ফাঁস ঠিক মতো পরানো হলে তা টেনে গলার সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়, এবং পরে বন্দী হাতীর দুই পাশে দুটি পোষা হাতীর সঙ্গে তাকে এমন শক্ত ক'রে বেঁধে দেওয়া হয় যে তখন আর তার পালাবার বা বাধা দেবার কোনো উপায় থাকে না।—এ রকম দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য টিকিট বিক্রি ক'রে দেখালেও দর্শকের

ভিড় কমবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সমস্ত দেখে-শুনে কেবলই মনে হতে লাগল হাতী ধরার এই প্রাচীন নিষ্ঠুর প্রথার কি কোনো পরিবর্তন করা যায় না? এ সমস্ত কাজই কি যন্ত্রের সাহায্যে হতে পারে না?

আমি মাচার উপর একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি—ভিড়ের চাপে আমার অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এবং এমন অবস্থা হয়েছে যে একটা ফিল্ম শেষ ক'রে ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম পরানো সে অবস্থায় একেবারে অসম্ভব। নিচে নামলেও আর ওঠবার উপায় নেই, কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ ছবিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

শুনলাম দুটি হাতী বাঁধাতেই আজকের মতো খেলা শেষ। তখন নিচে নেমে এসে সবাই কিছু খেয়ে নিলাম। অশোক ও সুধাংশু নিচে নেমে এসেছিল অনেক আগেই, মেয়েদের ভিড়ে। সমস্ত দিন ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছি যে এতক্ষণ কি ক'রে যে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা ভেবে পেলাম না। খেলার উত্তেজনাই বোধ হয় এতক্ষণ আমাকে খাড়া রেখেছিল। অতঃপর বাঁধা হাতী কোথায় নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে গিয়ে নিচে থেকে আরও ছবি নেওয়ার দরকার কি না—এ সব কথা ভাববার মতো আর তখন উৎসাহ ছিল না।

এমন সময় শোনা গেল একখানা ট্রাকে কুমারগ্রাম পর্যন্ত যাবার সুবিধা আছে। শোনা মাত্র আমরা উঠে পড়লাম। ট্রাকে তখনই না গেলে অন্নদাবাবুর গাড়িতে দু'বারে দু' দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে। কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি কোনো রকমে যাওয়া যাবে বটে, কিন্তু যাবার সুবিধা যেটুকু পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম তা আর হল না। প্রায় দু' ডজন মহিলা ট্রাক আগেই দখল করেছেন। ড্রাইভারের পাশে এক পঞ্জাবী ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী। আমরা ছয়-সাত জন মাডগার্ড এবং ফুটবোর্ডে অতি বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। কলকাতার বাস্-এ রকম ভিড়ের অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। সেই খাড়া-উঁচু এবং খাড়া-নিচু চড়াই উতরাই-এর পথহীন পথে সে অবস্থা বিপজ্জনক হলেও নূতনত্বের ঝোঁকে খুব উপভোগ্য মনে হচ্ছিল। সমস্তটা

পথেই ঘন জঙ্গল। সঙ্কীর্ণ পথের দু' ধার থেকে বাঁশের কঞ্চি ও গাছের ডাল আমাদের মাথায় আঘাত করবে বলেই যেন দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। ক্রমাগত মাথা নিচু ক'রে ক'রে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছিল। এক জায়গায় খাড়াভাবে নিচে নেমে এলাম এক শুকনো নদীর বুকে। সেখানে নেমে ট্রাক আর উপরে উঠতে চায় না। তখন আমরা অনেকেই নেমে পড়ে তাকে ঠেলে পার করে দিলাম সেই উঁচু পথটুকু।

তিন-চার মাইল এইভাবে চলে পৌঁছলাম এসে দুই সমতল বিপরীত পথের সঙ্গম-স্থলে। ওখানে যাবার সময়েও এই পথেই গিয়েছিলাম। পথের এক দিক গেছে রায়ডাক নদীর দিকে আর এক দিক কুমারগ্রামের দিকে। ট্রাক এই বিপরীত পথে নিউ ল্যাণ্ড ডাকঘর পর্যন্ত যাবে। এইখান থেকে রায়ডাক নদী প্রায় দু' মাইল। আমরা নেমে পড়লাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিলেন নিউ ল্যাণ্ডের পোস্টমাস্টার। তিনি বললেন আপনারা গাড়িতেই থাকুন, এখান থেকে ঘুরে আবার আপনাদের পৌঁছে দেওয়া যাবে। প্রস্তাবটি ভাল মনে হল। ট্রাক গিয়ে থামল ডাকঘরের সম্মুখেই। মেয়েরা সব নেমে গেলেন এখানে। কিন্তু তখুনি ট্রাকে ওঠা গেল না, কারণ পোস্টমাস্টার আমাদের অভ্যর্থনা না ক'রে ছাড়বেন না।

ডাকঘরের সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব ঘর। অন্দর মহলও একটা আছে—কিন্তু তিনি একাই আছেন বাসায়। তরুণ যুবক, নাম নিশীথকৃষ্ণ মুনসী। টেবিলে কয়েক খণ্ড মডার্ন রিভিউ—ডি এল রায়ের নাটক ও অন্যান্য বই। ঘরখানি ঝকঝকে পরিষ্কার। কি উৎসাহ তাঁর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তড়িৎ গতিতে আমাদের জন্য ডিম ভাজা, ফল ও চায়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। আমাদের সমস্ত দিনের ক্লান্তি ঘুচল এইখানে।

আমরা ওখান থেকে ট্রাকে রায়ডাক নদীর পাড়ে এসে পৌঁছলাম। আমাদের ট্রাক অপর পারে অপেক্ষা করছিল। আমরা সন্ধ্যার কিছু আগেই নদী পার হচ্ছি খেয়া-নৌকোয়। রায়ডাক নদী এখান থেকে যে রকম চমৎকার দেখায়, তাতে এ অঞ্চলে নৈসর্গিক দৃশ্য হিসাবে বোধ করি এটি প্রথম শ্রেণীতে

পড়ে। প্রশস্ত নদী—পটভূমিতে সু-উচ্চ হিমালয়। নদীর মাঝখানে চর। চর আগাগোড়া উপলখণ্ডে ঢাকা। রোদের আলোয় সেগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তখন গাঢ় নীল পাহাড়ের সঙ্গে, দুই তীরের সবুজ অরণ্যের সঙ্গে, ধূ ধূ বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত শয্যায়, উপলখণ্ডের ধাক্কায় ধাক্কায় কলগান তুলে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলার দৃশ্য বর্ণনার ভাষা নেই।

এ নদীর জলের ভিতরেও একটি আশ্চর্য শোভা আছে। জল খুব বেশি নয় এবং তা এমনই স্বচ্ছ যে একমাত্র লেন্সের স্বচ্ছ কাচের সঙ্গে তুলনীয়। নদী কোথায়ও দু' হাত, কোথায়ও চার হাত গভীর। উপরের স্তরে স্রোতে এবং হাওয়ায় সূক্ষ্ম গিলের কাজ করা। উপরের স্তর ভেদ ক'রে নিচের দিকে চাইলে মনে হয় যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্যে অগণিত মণিমুক্তা-হীরে-জহরৎপূর্ণ এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করলাম। জলের নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ দেহ তখন যেন সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। চোখের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ বিচিত্র বর্ণের নুড়িগুলোর কি বর্ণমহিমা! কোনোটা সবুজ, কোনোটা নীল, কোনোটা চকোলেট, কোনোটা টকটকে লাল। জলের আবরণ তাদের আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছে। নৌকোয় বসে নিকট দৃষ্টিতে জলের নিচের এই যে অপরূপ শোভা দেখলাম তা কোনো দিন ভুলব না।

এ পারে ট্রাকে এসে উঠলাম সন্ধ্যাবেলা, এবং সমস্ত পথটা সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ মনে নীরবে কেটে গেল। বাংলোয় ফিরে কথা হল, সুশীল বাবু পর দিনই ভোরে রওনা হয়ে যাবেন ট্রাক নিয়ে। সঙ্গে রেডিও-সেটটিও চলে যাবে। সুতরাং পর দিন হতে আমরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃত অরণ্যবাসী হব এই কল্পনা এক দিকে উৎসাহজনক হলেও মাঝে মাঝে খারাপ লাগতে লাগল। এমনি সময় সেই অন্ধকারে, নীরব জইন্তীর বুকে চার ধার থেকে সমস্বরে শেয়াল ডেকে উঠল। বহুকাল ঘরের পাশে শেয়ালের ডাক শোনার সৌভাগ্য হয় নি—তাই এই উপলক্ষে আমরা নিজ নিজ পল্লী-অভিজ্ঞতার স্মৃতিভাণ্ডার উন্মুক্ত করলাম।

কিছুক্ষণ পরে শীতলা বাবু ফিরে এলেন এবং পরদিন আমাদের নিয়ে ডিমা 'কোয়ারি'তে যাবেন প্রস্তাব তুললেন। সেখানে পাথর-কাটার বিরাট আয়োজন নাকি দেখবার মতো।

৩ ডিসেম্বর। আজ সকালে জইন্তী বাংলোর সম্মুখস্থ পাহাড়ের এক আশ্চর্য রূপ দেখা গেল। হিমালয়ের সৌন্দর্য যেন এখানে এসেই আসর জমিয়েছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো ঘিরে কত বিচিত্র আকারের মেঘ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছে। প্রথমে মেঘের লেশও ছিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একখানি শিশুমেঘ দেখা দিল দূরের একটা চূড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকখানা এসে তার পাশে দাঁড়াল। এই ভাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলো খণ্ড মেঘ জমে গেল সেখানে। ওরা ক্রমে সমস্ত চূড়ার গায়ে গায়ে লেগে গেল। কতকগুলো আরও নিচে নেমে আসছে, কতকগুলো অনেক উপরে নিজেদের বিস্তার করে দিচ্ছে। কিন্তু যতই ঘুরেফিরে বেড়াক, চূড়ার আশ্রয় থেকে বেশি দূরে যাচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ পরে মেঘগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলল। সবই সাদা মেঘ—তাদের ফাঁক দিয়ে দিয়ে নীল আকাশ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। আরও একটু পরে সমস্ত মেঘ কুয়াসায় রূপান্তরিত হল, আর সমস্ত দৃশ্য চকিতে সেই কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে চোখের সম্মুখ থেকে মিলিয়ে গেল। ঘন নীল কুয়াসা। নীল রং গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। এ রকম নীল কুয়াসা কোথাও দেখি নি। আমরা কালো মেঘের কালো অন্ধকার দেখেছি, কিন্তু এখানে এখন যে অন্ধকার নেমে আসছে তা বিশুদ্ধ নীল অন্ধকার। মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ মণ চূর্ণনীল সমস্ত আকাশে আর পাহাড়ে স্প্রে ক'রে দেওয়া হচ্ছে।

সকালেই খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে ডিমা কোয়ারি দেখতে রওনা হলাম—সুধাংশুপ্রকাশ ও আমি। শীতলা বাবু আমাদের ট্রলিতে ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। অশোক আজ আর বেরবে না, সে শিকারের সন্ধান করবে।

ট্রলিতে রেলপথে যেতে খুব ভাল লাগছিল। কয়েকজন কুলি ট্রলি ঠেলে

নিয়ে চলেছে, কিন্তু কিছু দূর যাবার পরেই আর ঠেলতে হল না, এখান থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত বক্সা রোড পর্যন্ত জমি ক্রমশ নিচের দিকে এমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে আমাদের গতি ক্রমেই দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল। ত্রিশ মাইল বেগ থেকে অবশেষে ষাট মাইল বেগে ছুটতে লাগলাম পানা নদীর সেতু পর্যন্ত। তার পর বক্সা রোড স্টেশনে গিয়ে ট্রলিকে ধরাধরি ক'রে তুলে ডিমা কোয়ারিতে যাবার লাইনে বসিয়ে দেওয়া হল। এইখান থেকে পথের দু'ধারে গভীর জঙ্গল। রেল লাইনও এখান থেকে ক্রমশ আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, তাই ট্রলির বেগ কম, কারণ এইবার আবার তাকে ঠেলে নিতে হচ্ছে।

জঙ্গলে কত রকম গাছ। শাল, সেগুন, শিশু, রয়না, ময়না, আম, কাঁঠাল আরও কত কি। মাটির সঙ্গে লতিয়ে আছে ফার্ন, আর পথের দু'ধারে ঝোপ সৃষ্টি করেছে আসাম লতা। কোনো কোনো শালগাছের ছাল ফেটে আঠা বেরিয়েছে। সেগুলো শুকিয়ে গেলে ধুনো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমরা যে ধুনোর সঙ্গে পরিচিত তা ঐ শালগাছেরই শুকনো আঠা।

মাইলখানেক যাবার পর ঘন জঙ্গল থেকে মুক্তি। তার পর আরম্ভ হল রেলের দু'ধারে আসাম লতার দুর্ভেদ্য ঝোপ। তার মধ্যে অনেকগুলো বুনো পাতিলেবুর গাছও দেখলাম। সম্মুখে দূরে পাহাড়ের গায়ে বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্প এখান থেকে দেখা যায়। আধ মাইল পরেই ডিমা কোয়ারি। এখানে পাহাড় কেটে কেটে পাথর বের করা হয়, তারপর তাকে নানা আকারে ভেঙে শ্রেণী বিভাগ ক'রে বাইরে চালান দেওয়া হয়। এক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান এই কোয়ারির ইজারা নিয়েছে। এই কোয়ারিতে রেলেরও যেমন আয়, ইজারাদারেরও তেমনি আয়, এবং শুধু এই ডিমা কোয়ারির জন্যই বক্সা রোড স্টেশন থেকে দেড় মাইল অতিরিক্ত রেল-লাইন পাতা হয়েছে।

কিন্তু এইখানে এই প্রশস্ত ডিমা নদীর বুকে এই বিস্তীর্ণ কারখানা অঞ্চলে কুলিদের এবং কোয়ারি সম্পর্কিত অন্যান্য লোকদের স্থায়ীভাবে বাস করা এক রকম অসম্ভব ছিল। তার প্রধান কারণ জলের অভাব। জল যে সময়ে অতি

সুলভ, অর্থাৎ বর্ষাকালে, যখন নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং সে সময় পাথর কাটার কাজও বন্ধ থাকে। তারপর নদী শুকিয়ে গেলে কাজ শুরু হয়। নদী অবশ্য সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় না, মাঝখানে চর জাগে, অথবা দুই পাশে চর বিস্তৃত হয়, তখন নদীর বেগ থাকে না, স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসে, সে সময় বসতি অঞ্চল থেকে বহু দূরে গিয়ে জল টেনে আনতে হয়। কিন্তু এ ভাবে একটা উপনিবেশ চলতে পারে না। কিন্তু তবু এত দিন দারুণ দুর্ভোগ সহ্য ক'রেও তাদের সেখানে বাস করতে হত। এই অসুবিধা অবশেষে দূর করেছেন শীতলাকান্ত শীল। এঁর পরিচয় আগেই দিয়েছি। ইনিই নিজের বুদ্ধিতে পরিকল্পনায় এবং দুঃসাহসে অপরিসীম বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে প্রায় দু'মাইল দূরের এক ছোট্ট পাহাড়ী নদী (মাসানিখোলা) থেকে পাইপের সাহায্যে ডিমা উপনিবেশে স্থায়ীভাবে কলের জলের ব্যবস্থা করেছেন। পাইপ পাততে হয়েছে জনহীন বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে।

আমরা ডিমার ট্রলি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। ট্রলি কোয়ারি লাইনে তোলা হলে আবার তাতে উঠে প্রথমতঃ আমরা কোয়ারির কেন্দ্রে গিয়ে পৌছলাম। সেখানে বিভিন্ন অংশে কি ভাবে কাজ চলছে দেখলাম। কুলিরা মাটি কাটছে, পাহাড় কাটছে, পাথর ভাঙছে, কেউ কেউ রান্না ক'রে খাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখলাম। তারপর আমরা রওনা হলাম শীতলাবাবুর কৃতিত্ব—জলের রিজারভয়ার (জলাধার) দেখতে। সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। আগাগোড়া পথই নদীর বুকের উপর দিয়ে। এই নদীটি এসে মিশেছে ডিমা নদীর সঙ্গে। নদীটি এখন প্রায় শুকিয়ে গেছে—পাহাড়ের এক পাশ দিয়ে পাঁচ-ছ' হাত চওড়া স্রোতের ধারা কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। আমরা ক্রমাগত পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে চলেছি। চলতে চলতে গা ঘেমে যাচ্ছে, পায়ে ব্যথা ধরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে গা থেকে গরম জামা সব খুলে ফেললাম—সেগুলি বয়ে নিয়ে চলল সঙ্গের একটি ছেলে। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই নদীর বুকের প্রশস্ততা কমে আসছে। নদীর বাঁক পার হতে হল কয়েক জায়গায়। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার

হওয়া অতি বিপজ্জনক। সব জায়গায় পা ফেলবার মতো পাথর নেই। সে সব জায়গায় পাথর টেনে এনে পাততে হল। কিন্তু তাতেও সব সময় সুবিধা হল না, শেষ পর্যন্ত একখানা ভাঙা শুকনো গাছের ডাল সংগ্রহ ক'রে তাইতে পায়ের ব্যালান্স রেখে পার হলাম। কিন্তু যত যাই ততই শুনি আরও কিছু দূরে। শেষে ক্রমেই জঙ্গলে প্রবেশ করছি। একটা বাঁকের কাছে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের পাশ এমনভাবে ধ্বসে গেছে যে মনে হচ্ছে সেটি একটি প্রাচীর। কাছে গেলে ভয় হয়—সে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু—তার গায়ে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গেছে। আমরা যেন অতিকায় একটি দুর্গে প্রবেশ করলাম।

ইতিমধ্যে আকাশ মেঘে ছেয়ে আসছে, এবং তার চেহারা নৈরাশ্যজনক, মনে হচ্ছে বৃষ্টি অনিবার্য। তা ছাড়াও ভয়ের কারণ ছিল, অবশ্য সেটা আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত। শীতলাবাবু এই রকম জনহীন অরণ্যপথে অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে চলেছেন এটা আমার খুব ভাল লাগছিল না। সে রকম আবহাওয়ায় আমরা কখনও পড়ি নি, তার যে-কোনো দিকে চাইলেই মন অবসন্ন হয়ে আসে। এক দিকে আকাশে অনিশ্চয়তা, আর এক দিকে মনে আতঙ্ক, এই নিয়ে এগিয়ে চলেছি। এ রকম অবস্থায় অরণ্য পাহাড় নদী আকাশের একটা রহস্যময় অবাস্তব চেহারা ফুটে ওঠে মনশ্চক্ষে।

নদীর বুকে যেখানেই একটু জল এখানে সেখানে জমে আছে, সেখানেই দেখি ছোট ছোট অসংখ্য মাছ খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। একটা জায়গায় হরিণের পায়ের চিহ্ন। যেখানে জল সেইখানেই বাঘ হরিণ প্রভৃতি কাছাকাছি থাকে। চার দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতা—সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে মাসানিখোলা নদীর স্রোতোধ্বনি। এগিয়ে যেতে গা ছমছম করছে, পরিশ্রমও হয়েছে খুব। আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁসে—পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা গাছ, ঘাস, ভাঙা ডাল প্রভৃতির হাত থেকে মাথা বাঁচিয়ে, কখনও বা মাথা নিচু ক'রে, কখনও বা সেগুলো দু'হাতে ঠেলে রেখে কখনও বা সেগুলো টেনে ধরে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছি। এমনিভাবে চলতে চলতে অবশেষে আমাদের গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছলাম।

ঐ একটুখানি মানুষের চিহ্নপূর্ণ জায়গা। নদীস্রোত উজান দিকের দুই পাহাড়ের আড়াল থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে। জলের রিজারভয়ারটি খুব ছোট, বড়র দরকার নেই, এরই মধ্যে কলকল শব্দে স্রোতের জল এসে ঢুকছে এবং জলের পাইপে ঢুকছে। অতিরিক্ত জল পাশের আর একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—পাম্পিঙের দরকার হচ্ছে না, কারণ জল উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো। আকাশ আরও অন্ধকার হয়ে এলো। আমরা ওখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম ক'রেই উঠে পড়লাম। ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—তবু তার মধ্যেই একবার ক্যামেরা খুলতে হল। আমরা ফেরবার সময় পাহাড়ের উপরের পথ ধরলাম। জলের পাইপ এই পথেই ডিমা উপনিবেশে এসেছে। পায়ে হেঁটে ঘন অরণ্যের পথ এই প্রথম। নদীর বুকের উপর দিয়ে হাঁটতেই ভয় হচ্ছিল, এবারে অন্ধকার অরণ্য আর ঝোপ-জঙ্গল। এটাকে পথ বললে ভুল হবে। লতাপাতা কাঁটা গাছ কত রকমের। বাঁশের মতো দেখতে মানুষ সমান উঁচু ঘাস। শেয়াফলের গাছ, বিড়াল-আঁচড়া কাঁটা আর চোরকাঁটার ঝোপ। সেই সব ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসতে সমস্ত কাপড় জামা এবং মাথায় নানারকম কাঁটা জমতে লাগল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু মেঘে আকাশ ঢাকাই রইল। আসতে আসতে দেড় মাইল পার হয়ে আমরা পৌছে গেলাম এক ভুটিয়া পল্লীতে। তারা সব কোয়ারিতে কুলির কাজ করে। এক দল ভুটিয়া ও নেপালী তাস খেলছিল, আমাদের দিকে ফিরেও চাইল না। ছোট ছোট জীর্ণ খড়ের ঘর। তার ভিতরে মাচা—সেই মাচায় ওদের বাস। প্রকৃত জংলী চেহারা। অনেকগুলো ভুটিয়া মেয়ে-পুরুষ এগিয়ে এলো আমাদের দেখতে। ওদের কয়েকজনের ছবি নিলাম, কিন্তু অনেক কষ্টে। তারা বার বার শীতলা বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল টাকা লাগবে না তো? এক ভুটিয়া যুবক হঠাৎ এসে শীতলা বাবুর পা জড়িয়ে ধরল। কারণ কিছুই নয়, ওদের আজ ছুটির দিন, অতএব সবাই একটু বেশি পরিমাণে মাতাল অবস্থায় ছিল।

এখানে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা দেরি হল, যখন চলে আসছি তখন পাশের এক নেপালী বস্তীর মধ্যে হঠাৎ খুব গোলমাল শুনে দেখি ওদের মধ্যে ভীষণ মারামারি শুরু হয়ে গেছে। এই মারামারি অতি হিংস্র, ভোজালির ব্যবহারও হচ্ছিল। বড় অস্বস্তিকর বোধ হওয়াতে সুধাংশু ও আমি সরে এলাম সেখান থেকে। শীতলা বাবু এগিয়ে গিয়ে খুব কৌতূহলের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে লাগলেন।

মাড়োয়ারী ইজারাদারের ডেরায় চা খেয়ে আমরা যখন উঠলাম তখন বেলা চারটে। বক্সা রোডে এসে ট্রলি প্রধান লাইনে তুলতে হয়, সেই উপলক্ষে শীতলা বাবু নেমে স্টেশন-ঘরে গিয়ে জানতে পারলেন একখানা পাথর-টানা মালগাড়ি একটু পরেই সে পথে জইন্তীতে ফিরবে এবং আমরা ইচ্ছে করলে সেই গাড়িতে যেতে পারি। শুনে লাফিয়ে উঠলাম। কারণ ট্রলিতে ফেরা মানে আগাগোড়া পথ প্রাণপণ শক্তিতে ট্রলিকে উপরের দিকে ঠেলে নেওয়া, এবং জইন্তীতে পৌঁছনোয় তাতে অনেক দেরি। দেরির অসুবিধা থেকে আমরা, এবং ট্রেলি ঠেলার দায় থেকে কুলিরা, এই উপলক্ষে মুক্তি পেয়ে গেল।

স্টেশনের এক পাশে অনেকগুলো আলমারী ও লোহার খাট। স্টীলের পাতে ফিতের মতো ছাওয়া খাটগুলো। আরও অনেক রকম টুকরো জিনিস। শুনলাম ডিটেনশন ক্যাম্প ভেঙে দেওয়ার পর তার সম্পত্তিগুলো এখানে আনা হয়েছে। দেশের কত দুর্দান্ত যুবক এই সব লোহার খাটে শুয়ে শুয়ে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছেন. আজ আর তাঁদের উঁচু পাহাড়ের বুকে সতর্ক প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে সাম্রাজ্য নিরাপদ রাখবার দরকার নেই—ব্রিটিশ শাসনেরই ইস্পাতের ফ্রেম আজ ভাঙার মুখে।

বহু বেদনাময় স্মৃতিবিজড়িত ঐ পরিত্যক্ত তুচ্ছ টুকরো জিনিষগুলোর স্তূপের দিকে নীরব বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মালগাড়িখানা এসে পড়ল। পাথরটানা এই গাড়িগুলো অদ্ভুত। প্রত্যেক ওয়াগনের উপরটা ফাঁকা, এবং মাঝখানে একটি ক'রে স্প্রিং-ব্রেক, এবং প্রত্যেক ব্রেকের কাছে একজন ক'রে লোক বসে আছে।

আমরা উঠে পড়লাম একখানা গাড়িতে। ভিতরে বেঞ্চিতে বসার মতো পা ঝুলিয়ে বসা গেল। গাড়িতে পাথর বোঝাই থাকলে ইঞ্জিন যখন পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন প্রায়ই ইঞ্জিনের গতি থেমে যায়। সেই সময় সবসুদ্ধ গড়িয়ে গাড়ি নিচের দিকে নেমে না আসে তারই প্রতিষেধক হিসাবে এই সব স্প্রিং-ব্রেক, দেখতে মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এর চাকার মতো। বিপদ আশঙ্কা করলেই ইঞ্জিন থেকে সাঙ্কেতিক ধ্বনি করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ওয়াগন থেকে ব্রেক কষে দেয়।

আসবার সময় ট্রলিকে নিরাশ্রয় ভাবে ছেড়ে আসা হয় নি—তাকে বেঁধে নেওয়া হয়েছে পিছনের গাড়ির সঙ্গে—এবারে কুলিরা তাতে বসে আরাম ক'রে আসছে।

শীতলাকান্ত শীল জলের কল ক'রে ডিমা উপনিবেশের এবং সেই সঙ্গে রেলওয়ের যে সব সুবিধা ক'রে দিয়েছেন তার কাহিনী আগাগোড়া শুনলাম। আগে ইঞ্জিনের জল নিতে হত আট মাইল দূরে অবস্থিত রাজাভাতখাওয়া স্টেশন থেকে, কারণ ডিমা থেকে জল নেওয়া সম্ভব ছিল না। এখন আর সে অসুবিধা নেই। সব চেয়ে বড় কাজ যা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই জলকলের কৃপায় ডিমা উপনিবেশে মজুরদের এবং অন্য সবার স্থায়ীভাবে বাস করার যে মারাত্মক অসুবিধা ছিল তা দূর হয়েছে। নদীর জল খেয়ে নানাবিধ অসুখ হত, তাতে কুলিরা অনেকে পালিয়ে যেত, কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই। এই জল আনার ব্যবস্থাটি দেখতে সহজ হলেও গড়ে তুলতে যে অমানুষিক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। সমস্ত কাজ যুদ্ধকালে দু' সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হয়েছে এবং যে জঙ্গলপথে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত ধরে পাইপ পাততে হয়েছে সে হচ্ছে বাঘ, হাতী এবং সাপের স্থায়ী বাসভূমি। এখানকার সকল জঙ্গলেই অবশ্য এ সব আছে কিন্তু তবু সমস্ত রাত ধরে অরক্ষিত অবস্থায় এ রকম জায়গায় কাজ করা কতখানি বিপজ্জনক তা সহজেই বোঝা গেল। কাজ করতে করতে বাঘ ও হাতীর দেখাও এঁরা পেয়েছেন।

একজন বাঙালী ওভারসিয়ার এই কাজটি করেছেন দেখে আনন্দলাভ

করলাম। কোনো ইউরোপীয় এঞ্জিনীয়রের হাতে হলে এটা একটা 'glorious achievement' হিসাবে ইতিহাসের পাতায় লেখা পড়ত, এবং তিনি পুরস্কৃতও হতেন। কিন্তু শুনলাম এঁর ভাগ্যে দুটোর কোনোটাই জোটে নি।

ফিরে এসে দেখি অশোক বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু একটু পরেই আর একটি উত্তেজক খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জইন্তী থেকে দু' মাইলের ভিতরে গত কাল সন্ধ্যায় নাকি একটা বুনো হাতী জঙ্গলের এক কুলিকে শুঁড়ে জড়িয়ে পায়ে পিষে মেরে ফেলেছে। দু'জন কুলি আগে পিছে চলছিল, একজন একটু দূরে ছিল। হাতী যখন আক্রমণ করে তখন একজন কোনো মতে ছুটে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে, পিছনের লোকটি আত্মরক্ষা করতে পারে নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলাম আমরা কিন্তু আজকের মতো পেরেছি।

৪

৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬। আজ সকালে কয়েক মিনিট মাত্র রোদ হয়েছিল, তার পরেই পাহাড়ের চূড়া থেকে আবার গাঢ় নীল অন্ধকার নেমে এলো। হাওয়া ভিজে এবং ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছিল সে হাওয়া জামার নিচে প্রবেশ ক'রে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। সে এক অদ্ভুত রকমের অনুভূতি। ভিজে ঠাণ্ডার এ রকম অভিজ্ঞতা একমাত্র দার্জিলিঙে দু-এক বার পেয়েছি। একটু একটু বৃষ্টিও হল, কিন্তু সমস্ত দিন মেঘ কাটল না।

জইন্তীতে প্রথমে এসেই মন ভিজেছিল—আজ গা ভিজল।

অশোক সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেল জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে। সঙ্গে গেল সুধাংশু-প্রকাশ। উদ্দেশ্য, বাঘ মারার জন্য জঙ্গলে কোথায় মাচা বাঁধা সুবিধাজনক তাই দেখা। ঘণ্টা দুই বাদে ওরা ফিরে এলো এক রোমাঞ্চকর খবর নিয়ে। ওরা যেখানে গিয়েছিল তার খুব কাছেই নাকি বাঘের ডাক শুনতে পাওয়া গেছে।

অশোকের মুখের চোখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। মানুষের সাহচর্য আর তার ভাল লাগছে না, মন ছুটে গেছে বাঘের দেশে। ওখানে মাচা বাঁধা থাকলে রাত্রে আর তার ফেরা হত না, তা তার চালচলন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কান সর্বদা পেতে রেখেছে জঙ্গলের দিকে, কোনো ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ যদি শোনা যায়। জঙ্গল থেকে কখন কি শব্দ উঠছে আমরা তা শুনতে পাই না, কিন্তু অশোকের কাছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিবিধ অর্থপূর্ণ। পশুপাখীদের ভাষার 'কোড' তার জানা। "ঐ যে বার্কিং-ডিয়ার ডাকছে!"—হঠাৎ বলে উঠল অশোক। শ্রবণ-যন্ত্রকে যত্নের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সত্যই শুনতে পেলাম সেই ডাক। ওর অর্থ কি জান? অর্থ দূরের কথা, শব্দের সঙ্গেই কখনও পরিচয় ছিল না। অশোক বলল, ও হচ্ছে ধোঁয়া—ওর থেকে বুঝতে হবে পর্বত বহ্নিমান।—বুঝলাম এ বহ্নি ওর অন্তরেও লেগেছে।

শীতলাবাবু আমাকে ক'দিন একটি হ্রদের কথা বলছিলেন। হ্রদটি না কি বেশি দূরে নয়—এবং পাহাড়ের মধ্যে। ঠিক হল পরদিন সকালেই আমরা রওনা হব সে দিকে। তবে অশোককে যে কাল পাওয়া যাবে না সে এক রকম ধরেই নিলাম।

৫ ডিসেম্বর। আজ বেলা দশটায় হ্রদ দেখতে রওনা হলাম। শীতলাবাবু আমাদের নেতৃত্ব করলেন। বাংলো থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চলেছি। প্রথমেই পেলাম নেপালী-হিন্দুস্থানীদের এক পল্লী। একটি নেপালী মেয়ে বারান্দায় বসে লেস বুনছে। পাশের বাড়িতে এক বৃদ্ধা কাঠের ডোঙায় বসে শাক বাছছে, সামনে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ানোতেও তাদের কোনো চাঞ্চল্য দেখলাম না।

শীতলাবাবু ইতিপূর্বে আরও দু'এক বার সেই হ্রদে গেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অরণ্য জগতে পদচিহ্নহীন পুরনো পথ মনে রাখা সহজ নয়। তাই তিনি এক ভুটিয়া কুলিকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে একটা ভাল পথের নির্দেশ দিল, কিন্তু শীতলাবাবুর তা মনঃপূত হল না, তাঁর ইচ্ছা তাঁর পূর্বপরিচিত সোজা পথে যাবেন। নির্দেশিত পথ ফেলে তিনি এক নদীর ঢালু বুকে

নেমে বললেন, আসুন এই পথে। আমরা সেই পথেই এসে নামলাম নদীর 'গর্জ'-এ। সেখানে প্রকাণ্ড এক একটি পাথর। দু'ধারে পাহাড়, মাঝ-খানের পথ অতি সঙ্কীর্ণ এবং তার গতি আঁকা বাঁকা। এক পাথর থেকে আর এক পাথরে অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছি। এ পথ এমনই খারাপ যে আমাদের দুজনেরই রীতিমতো কষ্ট হলেও শীতলাবাবু কিন্তু তাঁর অভ্যস্ত পা বেশ দ্রুত চালাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, আমার পা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় অবসন্ন হয়ে এলো। সোজা পথ হলেই যে সহজ পথ হয় না, এ কথাটা শীতলাবাবুকে বোঝাতে বোঝাতে চলেছি, কিন্তু তিনি সম্প্রতি নিজেই পাথর হয়ে গেছেন, কথা কানে তুলছেন না।

পনেরো মিনিট এই ভাবে চলার পর নদী-পথ ছেড়ে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যে জঙ্গলে কিছু চলাফেরা ক'রে সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। এ দিকের বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না এ কথা সবাই বলেছে, তবু বাঘেদের এলাকার মধ্য দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে চলা সম্ভব নয়। অবস্থা-বিশেষে কত ভদ্রলোক ছোটলোক যায়, একমাত্র বাঘই তার রীতি সব সময় বজায় রেখে চলবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া গোখুরো সাপও এখানে আছে।

তবে আপাতত একটা ভরসা ছিল এই যে আমাদের সঙ্গে শীতলাবাবুর একটি পোষা ভুটিয়া কুকুর ছিল। মিশমিশে কালো, নাক থ্যাবড়া। উঁচু হবে বোধ হয় আট-দশ ইঞ্চি। সে যতক্ষণ নীরব আছে ততক্ষণ আমরাও নিরাপদ। এদের ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র। আশেপাশে কোথায়ও বাঘ থাকলে ডাকবেই। সেটা অবশ্য খুব ভরসার কথা নয়, তবে সে যতক্ষণ না ডাকছে ততক্ষণ অকারণ ভয় পেয়ে লাভ নেই।—কুকুরটির নাম জিমি।

মনুষ্যপদচিহ্নহীন সেই অরণ্যে ছোট ছোট গাছের এমন ঝোপ যে তা ঠেলে ঠেলে চলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া শীতলাবাবুর পক্ষে দিক ঠিক ক'রে চলাও খুব সহজ হচ্ছে না। একটা দিক ধরে কিছু দূরে গিয়ে আবার সেখান থেকে অন্য দিকে ঘুরছি—এইভাবে জঙ্গল ভেদ ক'রে অনেক বার আমরা সেই

নদীর বুকে এসে নামছি—এবং নদীর পথ ধরে অনেক দুর এগিয়ে গিয়ে আবার ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করছি। ঘণ্টাখানেক চলে এক মাইলও এগিয়েছি কি না সন্দেহ। পাহাড়-পথের গ্রেডিয়েণ্ট বা ক্রমোচ্চতা যে খুব বেশি তা নয়, কিন্তু পাথর-পথের দুর্ভোগে আমার দু'খানা পা সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে এলো।

হঠাৎ জিমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার এ রকম মূর্তি এর আগে দেখি নি। কি হল হঠাৎ? সে ছোঁক ছোঁক ক'রে মাটি শুঁকছে আর ছুটছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ নক্ষত্রবেগে বাঁ ধারের জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই জঙ্গল ভেদ ক'রে দশ-বারো হাত আগে (আমরা ততক্ষণ দশ-বারো হাত এগিয়েছি)—আমাদের সম্মুখে বেরিয়ে এসেই দু-তিন পাক ঘুরে আবার ঢুকে গেল ডান ধারের জঙ্গলে। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার বাঁয়ের দিকে ঢুকল। আমরা তো অবাক হয়ে গেলাম ওর এই ব্যবহারে। কিন্তু কোনোমতেই তার গতি নিয়ন্ত্রণ করা গেল না। শীতলাবাবু জিমি জিমি ক'রে ডাকতে লাগলেন। স্বাভাবিক অবস্থা হলে জিমি সে ডাক অগ্রাহ্য করতে পারত না, কিন্তু এখন তার মনোভাব অনেকটা এই যে, মশায়, এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না, এখন আমি নিজের একটি বিশেষ তালে আছি।

জিমির এই রকম ছুটে বেড়ানোর চেহারা দেখে তাঁত চলার সময়কার মাকুর কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার এই ছুটে বেড়ানো ইঙ্গিতপূর্ণ হলেও আমাদের পক্ষে যে সেটা ভয়ের ইঙ্গিত নয় তা বোঝা যাচ্ছিল তার নীরবতায়। হিংস্র জন্তুর গন্ধ পেলে জিমির ব্যবহার অন্য রকম হত। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এবারে সে অতর্কিতে আমাদের বাঁ দিক থেকে ডান দিকের জঙ্গলে ছুটে যেতেই আমাদের অলক্ষ্যে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করতে করতে কয়েকটি বন্য মুরগী প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, জিমিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো বিষণ্ণ মুখে। সমস্তটা ঘটনা নাটকের মধ্যবর্তী একটা হাল্কা দৃশ্যের অভিনয়ের মতো মনে হল, যদিও দৃশ্যটি বিয়োগান্ত হতেও আটক ছিল না।

আমরা ক্রমেই গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করছি। পায়ের শক্তি লুপ্ত, তবু জোর ক'রে চলেছি। কত পরিচিত-অপরিচিত গাছের ঝোপ। কত বাসকের

গাছ, পিপুল-লতা, গাঁদাল, শতমূল, এই বিশাল অরণ্যে আশ্রয় পেয়েছে। আরও যে কত রকম গাছ আছে তার নাম জানি না।

শীতলাবাবুকে বললাম, আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, আর বেশি দূর নয়—এতখানি এসে ফিরে যাওয়া কি উচিত হবে?

সুধাংশুকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি বল?

সে বলল, আমি পারব।

আমার পক্ষে সেখান থেকে ফিরে আসার প্রস্তাব আমার পক্ষেই বেশি দুঃখের, কারণ হ্রদ দেখার উৎসাহ আমারই বেশি ছিল, এবং আমার অনুরোধেই আজকের এই অভিযান। উৎসাহের আরও কারণ ছিল এই যে, পাহাড়িয়া হ্রদে আমার ছবির বৈচিত্র্য বাড়বে; অল্পদিনের জন্য বাইরে এসে সেই উপলক্ষে যতগুলো অভিনব বস্তু দেখা যায় তারও একটা তাগিদ ছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি শক্তি ফুরিয়ে আসছে, এর পর জোর ক'রে হাঁটতে চাইলে হয়তো ফিরে আসাই শক্ত হবে।

শীতলাবাবু বার বার আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমাকে লজ্জা দিতে লাগলেন; বার বার বলতে লাগলেন অত্যন্ত কাছে এসে ফিরে যাওয়াটা কেমন হবে?

আমি আরও একবার সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করলাম, ঠিক ক'রে বলুন তো আর ঠিক কত দূর আছে?

শীতলাবাবু বললেন, এই যে পাহাড়টিতে এখন উঠছি—তখন একটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছি—এই রকম আরও মাত্র তিনটি পাহাড় পার হলেই হ্রদ।—তবে সে তিনটি পাহাড় এর চেয়ে একটু বেশি খাড়া।

মুহূর্তে আমার মন থেকে নবসঞ্চিত সাহস, এবং পা থেকে অবশিষ্ট শক্তি, অন্তর্হিত হল। আমি বললাম, থাক।

তখন পাহাড়টির পিঠে উঠে বসেছি।

শীতলাবাবু বললেন, এখানে কিছু বিশ্রাম ক'রে চলুন। কিন্তু তখন আমার পা কাঁপছে।

এ রকম ক্লান্তি যে হতে পারে তা কল্পনা করি নি। এক দিন পূর্বে হাতী-খেদার মাচায় সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে যে ক্লান্তি অনুভব করেছি, তার পর অন্তত তিনি দিন বিশ্রাম নিলে তবে হয়তো সব ঠিক হয়ে যেত, কিন্তু মাত্র এক দিনের বিশ্রামে সে ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। তদুপরি আজকের পথের বড় বড় পাথরখণ্ড যখন একে একে পার হচ্ছিলাম তখন প্রত্যেকটি পদপাতে একটা ক'রে ডন দেওয়ার পরিশ্রম হয়েছে। উবু হয়ে একটা পাথর ধরে আর একটা পাথরে এগিয়ে যাওয়ার সময় সেই রকমই মনে হচ্ছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম বাড়ি ফিরে দৈনিক দু'শো ডন দেওয়া অভ্যাস ক'রে ভবিষ্যতে আবার আসব এখানে। 'ইয়ারো' এবারে অদেখাই রইল।

যে পাহাড়টায় বসেছি সেটাকে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একটা রেঁায়াওয়ালা আদিম অতিকায় জানোয়ার, তার ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে জঙ্গলে পড়ে আছে।

ইতিপূর্বে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটেছি, কিন্তু এ রকম ভয়াবহ জায়গায় এতক্ষণ বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বসে আছি লোকালয় থেকে বহু—বহু দূরে—প্রাচীন অরণ্যের মাঝখানে।

চারদিক নিস্তব্ধ। চারদিক নীরন্ধ্র। সূর্যের আলো প্রবেশের পথ নেই। দূরে কোথাও উঁচু গাছের ডালে যে এক টুকরো রোদ দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ ক'রে তুলেছে, সেই আলোটুকুতেও যেন একটা ভৌতিক অবাস্তবতা। কি ভীষণ নিস্তব্ধতা! সমস্ত বনভূমি থেকে যেন একটা অপার্থিব অশ্রুত সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এক অদ্ভুত অনুভূতি। মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বে প্রকৃতি হতে এই মাটির বুকে আবির্ভাব ঘটেছে এই অরণ্য জগতের। এখানে কত বিচিত্র প্রাণী যুগযুগান্তর ধরে বাস ক'রে গেছে। আজ তাদের চিহ্ন নেই, কিন্তু তাদের স্পর্শ এসে লাগছে গায়ে।

এক একটা গাছ কি দীর্ঘ। একটুখানি রৌদ্রালোক, একটুখানি হাওয়া, আর আকাশের একটুখানি নীলিমার জন্য পরস্পরের ঊর্ধ্বমুখী প্রতিযোগিতা। এক দল শাখা দেখা দিতে না দিতে তার উপরের স্তরে আর এক দল শাখা বেরিয়েছে। নিচের বঞ্চিত শাখাদল শুকিয়ে গেছে আলোর অভাবে। সেই

উপরের শাখাদলও প্রচুর রোদ পেয়ে পুষ্ট হবার আগে, তাদের উপরে আর এক দল নতুন শাখা বেরিয়ে এসে তাদের বঞ্চিত করেছে। এইভাবে শাখার পর শাখার প্রতিযোগিতা চালিয়ে গাছ হু-হু ক'রে বেড়ে গেছে যতদূর বাড়তে পারে। এখন কেবল উপরের শাখাগুলোই তার সহায়, নিচের শাখারা কোনো মর্যাদা পেল না। তারা মরে ঝরে গেছে। গাছেরা প্রত্যেকেই বাঁচবার অধিকার দাবী করেছে পরস্পরের কাছে। তারা সবাই মাথা তুলেছে বহুদূর আকাশে—সেইখানে তাদের ছুটে চলার প্রান্তসীমায় আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

নিচের ধাপের ছোট গাছগুলো আলো থেকে বঞ্চিত বটে, কিন্তু মাটির রস থেকে নয়। বনস্পতিরাই সূর্যকে আড়াল ক'রে রেখে মাটিকে একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয় নি, ছোট গাছেরা শুধু এই টুকুতেই খুশি হয়ে নিজ নিজ ভাগ্যের সঙ্গে একটা রফা ক'রে নিয়েছে। অরণ্য-সমাজে সবারই স্থান আছে, অথচ কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়—একমাত্র পরগাছা ছাড়া। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখলে মোষের শিঙে বসা মশার মতোই মনে হয়।

আর অরণ্য আশ্রয় দিয়েছে অগণিত জীবজন্তুকে। মানুষও এক দিন অরণ্যেই ছিল, কিন্তু সেখান থেকে সরে এসেছে ধীরে ধীরে। জঙ্গল কেটে খোলা জায়গায় ঘর বাঁধতে শিখেছে,—হিংস্র পশু জঙ্গলেই রয়ে গেছে। তাদের রক্তলোভী হিংস্রতা সত্ত্বেও তারা মানুষকে ভয় করে, যেমন মানুষ ভয় করে তাদের। যে মানুষের মধ্যে আজও জন্তুদের সঙ্গে লড়াইয়ের দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি রয়ে গেছে তাদের পক্ষে অরণ্য এক মহা আকর্ষণ। অরণ্যের মায়ায় তারা আচ্ছন্ন।

অশোকও তাদেরই দলে। সে সন্ধ্যা-সকাল জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে বন্দুক নিয়ে একা বেরিয়ে যাচ্ছে বন্য হাতী বাঘের লীলাভূমিতে। সন্ধ্যা হলে তাকে কোনো মতেই ধরে রাখা যায় না। তখন তার দ্বিতীয় আর একটি সত্তা জেগে ওঠে। মুখ-চোখের চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। সুধাংশু ঠাট্টা ক'রে বলে, বাঘ না পেলে হয় তো আমাদেরই গায়ে ডোরা কেটে গুলি চালাবে।

—এই বাঘের রাজত্বে বসে এই কথাগুলোই বেশি ক'রে মনে পড়ল।

আমাদের সঙ্গে কিছু কমলালেবু ছিল—কোথায়ও বেরতে হলে লেবু সব সময়েই সঙ্গে থাকে—সেগুলো বসে বসে সবাই মিলে খেলাম। আশেপাশে কতকগুলো ভাঙা শুকনো ডাল পড়ে আছে আর সেই সব ডালে একটার পর একটা ব্যাঙের ছাতা লাইন করে সাজানো। সেগুলোও শুকিয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা ছিল বেশ বড়, বাচ্চা হাতীর কানের মতো দেখতে—সেটি আমরা কেটে নিলাম ব্যাঙের ছাতা বিশারদ গোপাল ভট্টাচার্যের জন্য।

আমরা যে পাহাড়টায় বসে আছি তার নিচে দিয়ে সঙ্কীর্ণ একটি নদীর চিহ্ন। এখন সে শুভ্র উপলখণ্ডের শ্বেত পতাকা বুকে নিয়ে অরণ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর ক'রে পড়ে আছে। তার বুক এখন ঝরা-পাতার আশ্রয়। বর্ষার আরম্ভে তার সন্ধিকাল ফুরিয়ে যাবে। তখন নেমে আসবে উন্মত্ত স্রোতের অতি প্রবল ধারা। তখন সে পাহাড় থেকে গাছপালা ভেঙে প্রকাণ্ড এক একটা পাথর-খণ্ডকে ঠেলে ভেঙেচুরে গর্জন করতে করতে নিচে ছুটতে থাকবে। স্রোতের সঙ্গে অন্ধ বেগে ছুটে চলবে গাছপালা আর পাথর। দুই তীরের সমস্ত গাছ ভয়ে কাঁপতে থাকবে। শিহরণ জাগবে মাটি-পাথরের অন্তরে।

গভীর অরণ্যে এই সব শুকনো ছোট ছোট পাহাড়িয়া নদীর একটি অবর্ণনীয় রূপ আছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শুধু শাদা পথ। জল নেই, স্রোত নেই, শুধু শাদা শাদা পাথর। অপরিচিত দুর্গম অরণ্যে সঙ্কীর্ণ নদী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে আছে, তবু এর যোগাযোগ মহাসমুদ্রের সঙ্গে। তাই এখানে বসে এর দিকে চাইলে এর সঙ্গে মন ছুটে যায় এর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বহির্বিশ্বের আলোকিত উন্মুক্ত আকাশের নিচে। বর্ষায় অরণ্যের অন্তরে এসে এর নৃত্যছন্দ দেখবার উপায় নেই। তখন আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ। মানুষের সাধ্য নেই তখন এইখানে প্রবেশ করে। তখন এখানে জোঁকের রাজত্ব।

পাহাড়ে এ রকম কত নদী। বর্ষায় এরা মানুষের পথে যে কি রকম বাধা সৃষ্টি করে তা বোঝা যায় এ অঞ্চলের যাবতীয় পথে। সেখানে এই সব নদীর আপাত শান্ত বুকের উপর অগণিত সুদৃঢ় সেতু বাঁধতে হয়েছে।

আমরা প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রাম করলাম এখানে। মন অনেকটা স্নিগ্ধ হল কিন্তু পায়ের ব্যথা আরও বেড়েছে। কিন্তু শীতলাবাবুর উৎসাহ অদম্য। ভদ্রলোক আমাদের খুশি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। বলেন, আমি যদি এখানে নতুন-আসা বাঙালী ভদ্রলোকদের একটু সাহায্য না করি তা হলে তাঁরা যে নিরুপায়। আশ্চর্য মানুষ। বলেন, এখানে কোনো বাঙালী যদি আসেন আমার সাহায্য সব সময়েই পাবেন। কোনো ব্যবসা উপলক্ষে এলেও তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করব। আমি ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে একবার কথায় কথায় বলেছিলাম এমন চমৎকার পটভূমিতে সিনেমা-ওয়ালারা এলে তাঁদের কাহিনী সহজেই জমিয়ে তুলতে পারেন। শীতলাবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনি প্রস্তাব করুন কোনো সিনেমা কম্পানির কাছে— আমি সব রকমে তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

কিন্তু এত সহৃদয়তা সত্ত্বেও তিনি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছেন না, আমাকে হ্রদে বিসর্জন তিনি দেবেনই। তিনি বার বার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে এত দূরে এসে ফিরে যাওয়া উচিত হচ্ছে না। কিন্তু বিশ্রাম নেবার পরেও যখন আমার মতিগতি ফিরল না তখন অগত্যা তিনি চুপ করলেন।

ওখান থেকে রওনা হয়ে কিছু দূরে এসে চমৎকার একটা পথ পাওয়া গেল। এটা সত্যই পথ এবং সম্পূর্ণ সমতল। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে এসেছে। প্রথম থেকেই যদি এই পথের সন্ধান পেতাম তা হলে আজ হ্রদ দেখা কেউ বন্ধ করতে পারত না। আসবার মুখে ভুটিয়া কুলি এই পথের কথাই বলেছিল, কিন্তু তখন শীতলাবাবু তা গ্রাহ্য করেন নি।

কোনো কষ্টই হচ্ছে না এ পথে ফিরতে। অবশ্য এ পথটুকু হ্রদপথের আরম্ভ মাত্র। এ পথে এলেও চারটি পাহাড়ে ওঠার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত না।

জঙ্গল পার হয়ে পথ অনেকখানি ফাঁকা। একটা পাশে আসাম লতার ঘন ঝোপ। বড় গাছ এ দিকে বেশি নেই। মিনিট পঁচিশ এ পথে চলেই

নদীর কলধ্বনি শোনা গেল। বুঝলাম জইন্তী নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। সন্দেহ রইল না যে আজকের মতো দুর্ভোগের সীমান্তরেখা ভেদ ক'রে বেরিয়ে এসেছি।

আমরা জঙ্গল-পথ পার হয়ে নদীর ধারে রেল-লাইনের কাছাকাছি একটা বস্তীতে আসতেই আট-দশটা দেশী কুকুর বিভিন্ন বাড়ি থেকে আচমকা ছুটে বেরিয়ে এলো হাঁ-হাঁ ক'রে। তারা জিমির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। ব্যাপার বুঝে অনেকগুলো লোক লাঠি নিয়ে ছুটে এসে জিমিকে ওদের নিষিদ্ধ সীমা পার করিয়ে দিল। জিমি কিন্তু এমন ভাবে চলতে লাগল যেন কিছুই হয় নি।

৬ই ডিসেম্বর। আমরা এখানে ক'দিনেই প্রায় জংলী হয়ে উঠেছি—কারণ আমাদের সবার কানের পিঠে এবং মাথায় আঁটুলি ধরে গেছে। সকালে বসে বসে আজ নাপিতের সাহায্যে সেগুলো ছাড়ানো গেল। কাল ঠিক হয়েছিল আমরা সবাই মিলে ভুটান ঘাট দেখতে যাব এবং ঘাট পার হয়ে ভুটানের জমিতে পদার্পণ করব। কি ভাবে সেখানে যাওয়া যায় তাই আলোচনা করছিলাম।

আমরা যে ট্রাকে এসেছিলাম সেখানা তিন তারিখে ফিরে গেছে—সুশীল পোদ্দার এবং লালুও নেই—এখন আমাদের সঙ্গে আছে কেবল বাহাদুর নামক নেপালী পাচক। ট্রাকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়াতে দূরে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভুটানঘাটে না গেলে ভ্রমণ-বৈচিত্র্যে একটা বড় অভাব থেকে যাবে এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। রেডিও-সেট চলে যাওয়ায় বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন, এমন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকা অস্বস্তিকর। তাই কি ক'রে ভুটান-ঘাটে যাওয়া যায় সে এক সমস্যা হয়ে উঠল। কিন্তু ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল। জইন্তীতে একটি বড় চুণের কারখানা আছে। এই কারখানার মালিক বি. কে. রায় মহাশয়ের ট্রাকখানা এক দিনের জন্য পাওয়া যাবে—হঠাৎ এই খবরটি শুনে আমাদের মানসিক বিমর্ষতা দূর হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই।

আজই রওনা হবার দিন—বেলা দশটায়, কিন্তু রওনা হতে বেলা সাড়ে

বারোটা পার হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে দুটি ক্যামেরা ও দুটি বন্দুক—ও যুক্ত খাদ্য-ও-পানীয় কমলা লেবু। খুকলঝোরায় যে পথে গিয়েছিলাম সেই পথেই চলেছি। রায়ডাক নদী পর্যন্ত যেতে হল না, তার কিছু আগে ময়নাপাড়া নামক জায়গা থেকে ভুটান-ঘাটের পথ সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। সে পথ খুবই খারাপ। চষা জমির মাঝখান দিয়ে উঁচুনিচু এবড়ো-খেবড়ো পথ। পাড়াগাঁয়ে বর্ষায় গোরুর গাড়ির চাকা ক্রমাগত কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াতের ফলে যে রকম গর্ত হয়ে যায় এবং বর্ষায় পরে শুকিয়ে শক্ত মাটির দাঁত বেরিয়ে থাকে তেমনি। তার মধ্যেও আবার পাহাড়িয়া জমির চড়াই-উত্‌রাই।

পথের দুধারে সরষে ক্ষেত। হলদে ফুলে মাঠের পর মাঠ ছাওয়া। সুমিষ্ট উগ্র গন্ধ। এই গন্ধে একটা মাদকতা আছে। বাল্যকালে এই গন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—হঠাৎ আজ সেই পুরনো পরিচিত গন্ধে কি আনন্দ যে হল। দু'চোখ ভরে মাঠের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিছনে ঘন নীল পর্বতশ্রেণী, কুয়াসায় প্রায় ঢাকা। নীল আকাশের গায়ে খণ্ড খণ্ড শাদা মেঘ। তারই পটভূমিতে এই সুবিস্তীর্ণ হলুদ সমুদ্র। দুই বিপরীত বর্ণ পাশাপাশি, তাতে দুটি রঙই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সরষে ফুলের উগ্রমধুর গন্ধে মন অবসন্ন হয়ে এলো।

মাঠের মাঝে মাঝে কৃষাণদের দু-একখানা ক'রে চালাঘর। পথের থেকে অপেক্ষাকৃত কাছে, তিনখানা চালাঘরের একটি উপনিবেশ। ঘরগুলো অত্যন্ত জীর্ণ—সব দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরাও নয়। শীতকালেও এই ঘরে লোক বাস করে, আশ্চর্য!

আমরা এই রকম মেঠো পথ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে ভুটান-ঘাটের বাংলোর কাছে গিয়ে থামলাম। বাংলোটি দেখতে খুব চমৎকার। কিন্তু খোলা জায়গায় নয়। তার তিন দিকেই শালবন—একটা দিক মাত্র নদীর দিকে খোলা—কিন্তু তবু বাংলোর উপর তলায় না উঠলে নদী দেখা যায় যায় না। এখানে যে শালবন দেখলাম তার অধিকাংশই নতুন গাছের। ফরেস্ট বিভাগ থেকে অরণ্য-রক্ষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করা হয়। কোন্ জমিতে কোন্ বছরে নতুন গাছ লাগানো হল তা লেখা থাকে জমির সঙ্গেই।

বাংলোয় পৌঁছানোর কিছু আগে ট্রাকে যাবার সময় জঙ্গলের মধ্যে কাশ-ফুলের একটি চমৎকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। জঙ্গল ভেদ ক'রে যত দূর চোখ যায়, কেবল শাদা আর শাদা! আর তার উপর রোদ লেগে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে চোখ ঝলসে যায়। বাংলোয় পৌছে যখন বুঝলাম দৃশ্যটি বেশি দূরে নয়, তখনই মনে হল ফেরবার পথে জঙ্গল ভেদ ক'রে ঐ শ্বেত হ্রদে একবার ডুবতে হবে। ক্যামেরার পক্ষে এ এক অভিনব দৃশ্য।

আমরা ট্রাক থেকে নেমেই উঁচুনিচু পথ পার হয়ে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। খুকলঝোরার পথে যেখানে এই নদী খেয়া-নৌকোয় পার হয়েছিলাম তার তুলনায় এখানকার প্রশস্ততা কিছু কম। তবে এখানে নদীর মাঝখানে কোনো চর নেই। জলের দুধারে অনেকখানি ক'রে বালুকাপূর্ণ তীরভূমি। জলভাগের প্রশস্ততা পঞ্চাশ গজ হবে। ডান দিকে কিছু দূরে নদীবক্ষ খানিকটা ঢালু, তাতে স্রোত সেইখানে গিয়ে নিচের দিকে সশব্দে ভেঙে পড়ছে। ওপারে ভুটানের জমি।

নদীতীরের বালি আর পাথর পার হয়ে হয়ে আমরা খেয়া-ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নৌকো ওপারে ছিল, দেখে মনে হল এপারে আসতে দেরি হবে। নদীর উঁচু পাড়ে যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে নিচু জমিতে বালির চর আরম্ভ হয়েছে সেই সীমান্ত-রেখা বরাবর কাশের ঝোপ। আমরা তার ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম।

বাঁ দিকে দুটি বড় পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নদী বেরিয়ে এসেছে। পাহাড়-গুলোর উপরিভাগ অনেক দূর পর্যন্ত প্রায় একটানা সমান। কাজেই একমাত্র নদীর জন্যই এ দৃশ্য যেটুকু ভাল লাগে। নদীপথে উজান বেয়ে নৌকোয় যাওয়া সম্ভব হলে হয় তো এই আবহাওয়া বেশি উপভোগ করা যেত।

আধঘণ্টা পরে খেয়া-নৌকো ওপার থেকে রওনা হল। তার আগে এপার থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম মাঝি তার ভিতর থেকে জল ছেঁচছে। অর্থাৎ ফুটো নৌকো। তার পর নৌকো যখন এপারে এসে গেল তখন তার চেহারা দেখে বিস্মিত হলাম, ভয়ও হল বেশ। সে এক অদ্ভুত নৌকো, আস্ত একটা শালকাঠ

কুরে কুরে তৈরি। বাংলাদেশে কোনো কোনো জায়গায় তালগাছ কুরে যেমন ডোঙা তৈরি হয় তেমনি। তার মধ্যে 'কিউ' ক'রে গায়ে গায়ে লাগিয়ে জন দশেক লোক দাঁড়াতে পারে। একটু কাত হলেই ডুবে যাবে।

সাহস ক'রে উঠে পড়লাম এতেই। এতগুলো লোকের চাপে নৌকোয় ক্রমাগত জল উঠতে লাগল, আমাদের জুতো ভিজে গেল। নড়াচড়া নিষেধ, তা হলেই নৌকোডুবি—সতর্ক করছিলাম সবাইকে—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক সবাই মাথা ঠিক ক'রে, কিন্তু তবু নৌকো ভীষণ দুলতে লাগল। দেখি আমিই কাঁপছি বেশি।

যা হোক, কোনো রকমে গিয়ে তো ভুটানের সীমানায় পদার্পণ করা গেল। একটা মস্ত বড় দুঃসাহসিক কাজ করার উত্তেজনা জাগল সবার মনে। কারণ নৌকো যদি ওখানে ডুবত, তা হলে স্রোতের টানে আমরা কোথায় যে ভেসে যেতাম তার ঠিক নেই। একটু দূরেই জলপ্রপাতের মতো ঢালু স্রোত খাড়া নিচে গিয়ে ভেঙে পড়ছে—সে দিকে তাকিয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম।

তীরভূমিতে আমাদের প্রধান কাজ হল নানা রঙের পাথর-সংগ্রহ। তা দেখলে নিতে ইচ্ছা হবেই, বহন করা সাধ্য হবে কিনা সে কথা তখন মনে আসবে না। প্রত্যেকেই এত পাথর সংগ্রহ করলাম যে একমাত্র সেগুলোতেই ঐ নৌকোখানা ডুবতে পারে। ফেলে আসতে কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কারণ এমন চমৎকার সব রং আর আকার যে সেগুলো যেন কেউ যত্ন ক'রে ঘষে ঘষে তৈরি ক'রে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত পকেটে যে ক'খণ্ড ধরে, তাই নিয়েই খুশি থাকতে হল।

ছবি নেওয়ার দিক দিয়ে এখানে বিশেষ কিছুই ছিল না, তাই বাংলোয় ফিরে এসেই সুধাংশু ও আমি সেই কাশবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। হাঁটা পথে প্রায় আধ মাইল আসতে হল। কাছে এসে দেখি সেখানে প্রবেশের কোনো পথ নেই। ঘন জঙ্গল ভেদ ক'রে না গেলে কোনো দিক দিয়েই সেখানে যাওয়া যায় না। আমরা পর পর তিনটি জায়গায় চেষ্টা করলাম। সমস্ত পথে দুর্ভেদ্য কাঁটা—আর মাকড়সার কঠিন জাল। কাঁটা এবং জালে আটকা পড়ে তা থেকে মুক্তি

পাওয়াই হল এক বিষম দায়। জাল এমন শক্ত যে সমস্ত গায়ে সাপের মতো জড়িয়ে গেল। যত টানি, রবারের মতো বেড়ে যায় এবং আঠার মত এঁটে ধরে। উপরন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত শোঁয়া-ফলে ভর্তি হয়ে গেছে।

এই ফলগুলোর গায়ে কাঁটা থাকার উদ্দেশ্য যাতে এরা অন্যের আশ্রয়ে নানা জায়গায় বাহিত হয়ে বংশ বিস্তার করতে পারে। প্রকৃতি থেকে ওরা এই বিধান পেয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি থেকে নিয়মিত পশুপাখী বা মানুষ ওদের কাছে সরবরাহ হয় না। মনে হল বহুকাল ওরা নিজেদের বিস্তার করবার সুযোগ পায় নি—তাই দুটি নিরীহ বাঙালী সন্তানকে পেয়ে ওরা অতি উৎসাহে হাজারখানেক ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের গায়ে। এমন অবস্থাতেও আমি ঠেলেঠুলে সেই কাশবনের প্রায় পনেরো হাতের মধ্যে যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু প্রতারিত হলাম। প্রথমত, যত দূর গিয়েছিলাম তার পরেও জঙ্গল ছিল, দ্বিতীয়ত কাশফুলগুলো এত উঁচুতে মাথা তুলেছে যে দূর থেকে ছবি না নিলে তার একটাও ক্যামেরায় ধরা পড়বে না। তৃতীয়ত, কাশবন আর এদিকে এই জঙ্গলের মাঝখানে শুকনো নদীর অতি গভীর এক 'গর্জ'। কাজেই কোনো দিক দিয়েই কোনো সুবিধা হল না। বাধা দুর্লঙ্ঘ্য—অভিযান ব্যর্থ হল।

আমরা পরদিনই কলকাতায় ফিরে যাব এই রকম কথা, তাই অল্প দিনের জন্য প্রবাসে এসে যা-কিছু দেখছি চারদিকে, তাই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করছি। এত অভিনবত্ব, এমন সজীব সুন্দর স্নিগ্ধ দৃশ্যরাজি বাংলার মধ্যেই আছে, অথচ বাংলাদেশে বাস ক'রে এ সব কোনো দিন দেখার সুযোগ হয় না! খাস বাংলা থেকে এ দেশের দৃশ্য কত তফাৎ তা বোঝা যাবে এখানকার একটি নারকেল গাছের ব্যাপারে। আমরা এদিকে এসে শালবন দেখে মুগ্ধ হচ্ছি, কিন্তু এখানকার লোকেরা শীতলাবাবুর বাড়ির অতি যত্নে রোপিত এবং পালিত একটি নারকেল গাছ দেখে মুগ্ধ হয়। কি ক'রে পাহাড় অঞ্চলে নারকেল গাছ জন্মানো যায় সে কথা অনেকেই জানতে আসে।

আমরা সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরে চলেছি। যাবার সময় বিস্তীর্ণ সরষে-ক্ষেতের ধারে দেখলাম এক কৃষক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে।

দারিদ্র্যের চরমতম মূর্তি। গায়ে বহু পুরনো ছেঁড়া নোংরা একটি কোট—পরনে তেমনি নোংরা ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়। এই সুন্দর পটভূমিতে সেই দরিদ্র রুগ্ন কৃষকের বিষণ্ণ মুখখানি বড়ই করুণ হয়ে ফুটে উঠল। এই আমাদের বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ। এই সমস্ত ভারতবর্ষের রূপ। এখানে কোটি কোটি নিরক্ষর নিরীহ চাষী এমনি দুরবস্থায় ভাঙা ঘরে ভাঙা স্বাস্থ্যে বাস ক'রে সমস্ত দেশকে এবং বিদেশকে অন্ন যোগাবার ভার গ্রহণ করেছে।

লোকটি বিস্মিতদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমাদের দিকে। তার চোখে আমরা কত ভাগ্যবান। আমরা গাড়িতে চড়ে মাটির স্পর্শ থেকে সযত্নে নিজেদের রক্ষা ক'রে চলেছি ওদের বুকের উপর দিয়ে। তাই ওরা অবাক হয়ে শুধু আমাদের দেখে, কাছে আসতে সাহস করে না।

কিন্তু ঐ যে দীনহীন মানুষটি মূঢ়ের মতো আমাদের দিকে চেয়ে আছে, ও কি জানে যে ও যাদের কৌশলে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও বঞ্চিত হয়ে জীবনটা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে আমরা তাদেরই সগোত্র? হয়তো জানে না। হয়তো আরও জানে না যে ওর ঐ হতভাগ্য জীবনের বাইরেও খোলা আকাশের নিচে ঐ দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্রটিকে ঘিরে ওর যেটুকু আনন্দ অবশিষ্ট আছে তাকেও আমরা ঈর্ষা করি।

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ঐ করুণ বিষণ্ণ মূর্তিটি। কিছুক্ষণের জন্য মনটা একটু দমে গেল, তারপর ভুলে গেলাম ওকে। মনের মধ্যে কোনো কিছু ধরে রাখবার সময় কোথায়। গাড়ি উঁচু-নিচু পথের উপর যেন লাফাতে লাফাতে চলেছে। সমস্ত সৌন্দর্যের সুর মনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির এই অস্থির গতির সঙ্গে আমাদের জীবনের গতি একসুরে বাঁধা, তাই হয়তো কোনো ছবিই মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ছবি হয়ে ওঠে না।

—কিন্তু যাক সে কথা।

সন্ধ্যায় আমরা জইন্তী বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। একটু পরেই অশোক একটি সাহসী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেল বাঘের সন্ধান নিতে। ক্ষুধিত পাষাণের ডাক—সন্ধ্যা হলে তাকে ঠেকানো দুঃসাধ্য।

ওরা ফিরে এলো ঘণ্টা দুই পরে, এবং এসেই এক উত্তেজক খবর দিল। এক জায়গায় একটা হরিণকে দ্রুত ছুটে যেতে দেখে ওরা দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ওদের পাশ দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে একটা বাঘ বেরিয়ে গেল। সে ঐ হরিণকে অনুসরণ করছিল, মানুষের মধ্যস্থতা তার ভাল লাগে নি, তাই একটু প্রতিবাদ জানিয়ে গেল। ছেলেটি মহা উত্তেজিতভাবে তাদের এই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল এবং এমন চমৎকারভাবে বলছিল যেন আমরা সেই বাঘটিকে সম্মুখে দেখছি।

৭ ডিসেম্বর। আজই আমাদের ফেরবার কথা, কিন্তু অশোকের অনুরোধে যাওয়া স্থগিত রাখতে হল। অশোক এবং সুধাংশু আজ প্রায় শেষরাত্রে জঙ্গলে বেরিয়ে গেছে, এখন সকাল আটটা, এখনও ফেরে নি। আমি বসে এখানকার দৃশ্য উপভোগ করছি। মেঘের সঙ্গে পর্বতচূড়ার খেলা চলছে। নিশ্চল পর্বত মেঘের স্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সময় এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত আরামপ্রদ। আমি দুর্বল দেহ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। তবু তো এখানে বিশ্রামের অবকাশ পাই নি বললেই হয়। এ রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের উপরেও দ্রুত ক্রিয়া করে। আমার মতে বাংলাদেশের বাইরে না গিয়ে যদি কেউ স্বাস্থ্য ও মনের দ্রুত উন্নতি কামনা করেন তা হলে তাঁর এই অঞ্চলে একবার আসা উচিত।

অশোক ও সুধাংশু একটা হরিণ শিকার ক'রে ফিরে এলো সাড়ে আটটায়। এবারে আরও একটি অদ্ভুত খবর শুনলাম ওদের মুখে। বহুদূর জঙ্গলের একটা জায়গায় এক জোড়া জুতো পড়ে আছে, আর তার পাশে এক বাণ্ডিল দড়ি। মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। জুতো জোড়া কোনো পাহাড়ীর পায়ের, সদ্য পরিত্যক্ত নয়। ওরা অনুমান করল অন্তত পনেরো-ষোল দিনের, কারণ জুতোর নিচে উই ধরেছে।

খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। আমরা সবাই মিলে শারলক হোমস্‌-এর রীতিতে একটা সিদ্ধান্তে পৌছনোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

কোনো লোক আজকের দিনের দামী জুতো ইচ্ছে ক'রে ফেলে যায় নি। ভুল ক'রে ফেলে যাওয়া আরও অসম্ভব, কারণ জুতোয়-অভ্যস্ত লোক জুতো ফেলে পাহাড়িয়া পথে খালি পায়ে হাঁটতে যাবে কেন? নিশ্চয় তাকে বাঘে ধরেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তা হলে জুতো জোড়া পাশাপাশি সাজানো অবস্থায় পড়ে থাকবে কেন? বাঘে ধরলে জুতো ওভাবে থাকতে পারে না। হয়তো সে বাঘের সাড়া পেয়ে জুতো খুলে আত্মরক্ষার জন্য গাছে উঠেছিল।—গাছে না উঠে পালিয়ে গেলে জুতো-পায়েই পালিয়ে যেত। গাছে ওঠা যদি ঠিক হয়, তা হলে সে সেখান থেকে গেল কোথায়? বাঘ গাছে উঠে তাকে ধরে নি, কারণ বাঘের পক্ষে গাছে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু লোকটি গাছে উঠে থাকলে গাছ থেকে যে নামে নি এবং নেমে ঘরে ফিরে যায় নি তার প্রমাণ তার জুতো। তা হলে এক এই হতে পারে যে সে গাছে ওঠবার মুখেই ধরা পড়েছে, আর না হয় যখনই সে গাছ থেকে নিচে নামা নিরাপদ মনে করেছে তখনই নেমে প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে জুতোর মায়া ত্যাগ ক'রে। আর এক হতে পারে গাছে ওঠা সত্ত্বেও সে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, কোনো বন্য হাতী শুঁড় দিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে কোথায়ও ছুঁড়ে ফেলেছে। এ রকম ঘটনা যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ ২রা ডিসেম্বরের সেই দুর্ঘটনা—হাতীর হাতে কুলির মৃত্যু।

আমাদের চিন্তাধারা যে সব সূত্র অবলম্বন ক'রে এই সব সিদ্ধান্ত করছিল, তার সমস্তই এর একটা কিংবা অন্যটার অনুকূলে। তার কারণ জুতোর পাশে ক'দিন পূর্বেকার হাতীর পায়ের, এবং কাল কিংবা আজকের বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু যাই হোক এটি যে একটি দুর্ঘটনা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না, এবং জুতোর মালিকের দুর্ভাগ্য স্মরণ ক'রে মনে আতঙ্ক এবং দুঃখ হল।

এখানকার আকাশ বাতাসে এই জাতীয় সব উত্তেজনা। হয়তো এখানে আরও কিছু দিন বাস করলে আমিও বাঘ ভিন্ন অন্য কিছু ধ্যান করতে পারব না, কেননা এ ক'দিনে একটি বাঘ না দেখেও বাঘ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল

বেড়ে গিয়েছিল। আমরা থাকতে অশোক একাগ্রমনে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে বাসা বাঁধতে পারছে না, নইলে এ দিকে বাঘের উপদ্রবের কথা যা শুনছি তাতে শিকারীর পক্ষে এত দিন লোকালয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। আমরা থাকতেই ডিমার দূর জঙ্গলে ক্যাম্প করার একটা প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু ভেবে দেখা গেল তাতে আমাদের জঙ্গল বাসের অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হলেও শিকারীর কোনো লাভ নেই। এ রকম অবস্থায় লাভ যদি কারও হয় তবে সে বাঘ-সমাজের। সুতরাং আমরা চলে যাবার পরই জঙ্গলে মাচা বাঁধা হবে সেই রকম বন্দোবস্ত হল। অশোক একটি বাঘ না মেরে এবার ফিরবে না এই প্রতিজ্ঞা এবং সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষাও করেছে, পরে শুনেছি। (শিকারী ক্লাবের সভ্যদের একটি ক'রে বাঘ মারার অনুমতি আছে)।

জঙ্গলে বসে বাঘের ছবি তোলা সম্পর্কে বোঝা গেল এই যে উপযুক্ত আয়োজন থাকলে এবং ভাগ্যে থাকলে কাজটি কঠিন নয়। উপরন্তু ক্যামেরাধারীর স্বাস্থ্যটি একটু ভাল হওয়া দরকার। শীতকালে রাত কাটাতে হবে মাচায় বসে, বিনা নিদ্রায়, বিনা শব্দে। একাধিক রাত এই ভাবে কাটানোর মতো উৎসাহ থাকা চাই। কারণ কখন যে বাঘের দেখা মিলবে তার স্থিরতা নেই। এতখানি সাহস, ধৈর্য, উৎসাহ এবং নিষ্ঠা থাকলে তবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। তবে আমার পক্ষে যে এই সব সর্তে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তা আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু বাঘের সম্মুখে ক্যামেরা খোলার সুযোগ না পেলেও অরণ্য প্রদেশকে উপভোগ করেছি সমস্ত সত্তা দিয়ে। শহরের একঘেয়ে পাকখাওয়া মনের সমস্ত পাক এখানে খুলে গেছে। এই ক'দিনের স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে।

এই উপলক্ষে এখানকার জীবনযাত্রাও দেখলাম। ঘন বসতি কোথায়ও নেই। প্রত্যেকেই এখানে কোনো না কোনো কাজ উপলক্ষে এসে ঘর বেঁধেছে, কিন্তু বাধ্য হয়েই সবাইকে দূরে দূরে থাকতে হয়। ফরেস্ট অফিসের লোকদের তো প্রায় নির্বাসন বললেই হয়। এখানে সমাজজীবন বলে কিছু নেই, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও নেই, থাকা সম্ভব বলেও মনে হল না।

তবু এই অরণ্যজীবন এক দিক দিয়ে ভাল। চাকরি বা ব্যবসা উপলক্ষে ভিটের মায়া ছেড়ে বাইরে যাওয়ার শিক্ষা সাধারণভাবে বাঙালীর নেই। সেই শিক্ষা বাঙালী পাচ্ছে এই অরণ্যপ্রবাসে।

৮ ডিসেম্বর। আজই বিকেলে আমরা জইন্তী ছেড়ে যাচ্ছি। ছেড়ে যেতে দুঃখ হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। অশোক একা রয়ে গেল এবং তার প্রতি মমত্ব বশতই তাকে বাঘের মুখে রেখে আমরা দুজনে পূর্বদিনের ভুক্তাবশিষ্ট ঝলসানো হরিণমাংসের প্রকাণ্ড এক বোঝা নিয়ে জইন্তী থেকে বিদায় নিলাম।

(১৯৪৬)

পশ্চিম হিমালয়ের পথে

যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের লোকেরা বাংলাদেশ থেকে বহু টাকা উপার্জন ক'রে নিয়ে যায়, কিন্তু বাঙালীরা তাদের দেশ থেকে কিছুই আনতে পারে না, এই ক্ষতি কি ভাবে পূরণ করা যায় সে ভাবনা হয় তো বাঙালী মাত্রেরই মনে আছে। আমার মনেও ছিল, এবং একটু উগ্র ভাবেই ছিল। হঠাৎ মনে হল আমার পক্ষে একটিমাত্র উপায় আছে। আমি ওদের দেশে গিয়ে ওদের সম্পর্কে আমার ধারণা নিয়ে ফিরে আসব। পশ্চিম অঞ্চল থেকে এই একটি জিনিসও যদি নিয়ে আসতে পারি তা হলেও হয় তো কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। আটলাণ্টিক পারের এক লেখক ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিক্রি করেছিলেন আমেরিকায়, আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব বলে স্থির করলাম।

উক্ত লেখকের ভাষায় এই ধারণা হচ্ছে ইম্প্রেশন। ভেবে দেখা গেল কথাটি তুচ্ছ নয়। চকিতে চোখে দেখা রৌদ্রঝলকিত জিনিস মনের পাকস্থলীতে হজম হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা, তাকে ইম্প্রেশন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই ইম্প্রেশনই ইউরোপীয় চিত্রশিল্পজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছিল। শিল্পী মোনে, মানে, দেগা, র'নোয়া প্রভৃতি ইম্প্রেশনিস্টের ইঙ্গিতে উত্তর-ইম্প্রেশনিস্ট দেখা দিলেন আরও মারাত্মক আকারে। গগ, গোগ্যাঁ, সেজান প্রভৃতি এই বিপ্লবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন, শিল্পজগতে এঁদের আসন স্থায়ী হল। চিন্তাপথে সাহিত্যের সঙ্গে ইম্প্রেশনিজমের কথা মনে এলো। প্রসঙ্গত সে কথাটাও বলে নিই। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথকে এদিক দিয়ে ইম্প্রেশনিস্ট বলা চলে। ইম্প্রেশনিস্টদের মতে একটা দৃশ্য বিশেষ একটা মুহূর্তে যে ভাবে আলোকিত হল, সেই বিশেষ আলোকি মুহূর্তটিকেই বিশেষ রঙে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই দৃশ্য আসলে কেমন সে প্রশ্ন তাঁরা তোলেন না, সেই দৃশ্য, বিশেষ আলোকপাতে কি রূপ ধরল সেটাই তাঁদের কাছে বড়। চিত্রকরের সঙ্গে

কবির পার্থক্য এই যে, কবির দৃষ্টি বাইরের চোখের নয়, মনের চোখের চকিত দৃষ্টি।

সবই অবশ্য আংশিক সত্য। তাই আংশিক সত্যই আমাদের পক্ষে পরম সত্য, পূর্ণ সত্য কি তা একমাত্র ভগবানই জানেন। যাঁরা মনে করেন পূর্ণ সত্যের সঙ্গে কারবার চালাচ্ছেন তাঁরা বিভ্রান্ত। সুতরাং পনেরো দিন ধরে আমি যদি আড়াই হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ ক'রে এসে আমার ধারণাসমূহ বিবৃত করি তা হলে তার মধ্যে পাঠকেরা কিছু পান বা না পান আমার এই সান্ত্বনা থাকবে যে আমি ইম্প্রেশনিস্টদের কেউ না হলেও একজন উত্তর-ইম্প্রেশনিস্ট তো বটেই। তা না হলে ঘোর গ্রীষ্মে—১৫ই জুন ১৯৪৯—যখন পশ্চিম অঞ্চলের উত্তাপ ১১২ ডিগ্রীর উপরে সে সময় কেউ ইউ পি বা পঞ্জাব ভ্রমণে যায় না।

শিল্পীবন্ধু কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে যাত্রা, সুতরাং এর মধ্যে যে একটু অনিশ্চয়তার অংশ ছিল সে কেবল তার জন্যই। তার প্রমাণ, প্রথম যেদিন যাবার তারিখ ঠিক করা গেল সে তারিখটি তারই হাতে উল্টে গেল। পরবর্তী তারিখে একেবারে টিকিট কিনে তাকে খবর দেওয়া হল।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ল্যান্সডাউন। কিন্তু সেখানে যেতে হলে ডেরাডুনের পথে নজিবাবাদ স্টেশনে নামতে হয়। হাওড়া থেকে ডুন এক্সপ্রেস ছাড়ে ৭টায়। কথা হল কালীকিঙ্কর সন্ধ্যা ৫টায় আমাদের বাড়িতে আসবে, আমরা একসঙ্গে হাওড়া যাব। কিন্তু ৫টা বেজে গেল, ক্রমে ৫॥টা বাজল, তখনও তার দেখা নেই। হঠাৎ পৌনে ছটায় অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কালীকিঙ্কর এসে নিশ্চিন্ত সুরে বলল, আজই যাবেন?

আমি তখন সব বেঁধেছেঁদে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। কালীকিঙ্কর বলল, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল এক জায়গা থেকে ফিরতে, হঠাৎ শুনলাম প্রিন্সিপ্যাল (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী) এসেছেন, তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

বললাম এখুনি বাড়ি গিয়ে স্টেশনে রওনা হও, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। অগত্যা তাই ঠিক হল। স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, কিন্তু কোথায় কালীকিঙ্কর? গাড়ি ছাড়তে তখন আর মাত্র সাত মিনিট আছে,

আমি ফিরে আসব ব'লে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় খবর পাওয়া গেল শিল্পী অপেক্ষা করছে প্ল্যাটফর্মের মুখে। শোনামাত্র কুলিসহ ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। আমাদের বসার আসন এবং ঘুমোবার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, সুতরাং গাড়িতে উঠতে কোনো রকম অসুবিধা হল না। তখন মনে পড়ল কালীকে বলা হয়েছিল স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করব, কিন্তু কোথায় তা বলা হয় নি, তাই এই বিভ্রাট। এই সম্পর্কে মনে পড়ল আরও একটি মজার ঘটনা। বহুদিন আগে 'বনফুল' যখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র তখন তার সঙ্গে হিন্দুস্থান বিল্ডিংে অবস্থিত ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া ঠিক হয়। কথা হয়েছিল সে গেটে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। আমি গিয়ে দেখি কেউ নেই, সুতরাং আমিই ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম তার জন্য। তার পর রাত্রে দেখা হলে শুনলাম সেও এক ঘণ্টা গেটে অপেক্ষা করেছিল। পরস্পর সত্য গোপন করছি ধারণায় তর্ক প্রায় বেধে ওঠে এমন সময় আবিষ্কার করা গেল সে অপেক্ষা করছিল মেডিক্যাল কলেজের গেটে আর আমি ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির গেটে।

হাওড়ার গাড়িতে যথেষ্ট ভিড় হল, কারণ ঘুমের গাড়ি হলেও ঘুমের 'অফিশিয়াল টাইম'-এর পূর্ব পর্যন্ত তাতে অন্য যাত্রীকে স্থান দিতে হবে। তার পর ঘুমের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে. যারা ঘুমের মাশুল দেয় নি, তাদের নেমে যেতে হয়, অর্থাৎ রেলওয়ের কর্মচারী এসে তাদের নামিয়ে দেন। আমাদের কামরা বর্ধমানে প্রায় খালি হয়ে গেল, তখন হিসেব ক'রে দেখলাম উপর নিচে মিলে মোট ২৮টি শোবার জায়গা আছে সে কামরায়, কিন্তু ঘুমের যাত্রী আমরা মোট আট জন। এই আট জনের মধ্যে আমরা দু'জন ভিন্ন আরও দু'জন বাঙালী সহযাত্রী পাওয়া গেল এবং সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের আসনও আমাদের সঙ্গেই সংলগ্ন। তাঁরা দু'জনেই ডেরাডুন যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে দু'জনেই মুসুরীতে যাবেন। যিনি আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি আমাদের পরস্পর পরিচিত হবার পূর্বেই আলাপ শুরু করে দিলেন। প্রথম কথা পাড়লেন রেলওয়ের বিরুদ্ধে। ঘুমের জন্য অতিরিক্ত মাশুল নেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, একে তো ইণ্টার ক্লাসকে সেকেণ্ড ক্লাস

নাম দিয়ে মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার উপর আবার ঘুমের মাশুল কেন? আমাদের সমর্থন পেয়ে তিনি খুব উত্তেজিত হলেন।

অথচ অবিলম্বে এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করবার নেই, কিছু করতে হলে রেলওয়ের অনেকগুলো মূলনীতি পরিবর্তন করা আবশ্যক। কিন্তু অবিলম্বে কিছু করবার নেই বলেই সকল বিষয়েরই মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা জমে ভাল। এক জায়গায় ঠায় বসে উত্তেজিত হওয়া চলে, এক পা কোথায়ও যেতে হয় না, দৈহিক পরিশ্রম কিছুমাত্র নেই। কিন্তু যদি এমন হত যে আমরা চার জন তৎক্ষণাৎ গার্ডের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেই গার্ড আমাদের ঘুমের দরুন অতিরিক্ত মাশুল ফেরত দিতে বাধ্য হবেন, তা হলে আমরা আমাদের সুখশয্যা ছেড়ে অতটা কষ্ট স্বীকার করতাম কি না সন্দেহ।

অতঃপর আলোচনা শুরু হল সরকারী হালচাল সম্পর্কে। আলোচনা অন্তে দেখা গেল, ব্রিটিশ আমলে যেমন, দেশী আমলেও তেমনি 'লালফিতা' রীতি সমান চলছে, সরকারী সনাতন শৈথিল্য সকল অফিসে একই ভাবে প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ রইল না।

যাই হোক, রেলওয়ের অতিরিক্ত ঘুমের মাশুল আদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের মনে যে ক্ষোভ জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে কিছু ন্যায্যতা ছিল, কারণ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় রাত বারোটার আগে কেউ শুনে পারিনি, সুতরাং সাড়ে দশ টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা চার আনা যে বৃথা গেল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি আবার সামান্য অসুবিধা হলেও ভাল ক'রে ঘুমোতে পারি না। একটু একটু ঘুমের আভাস চোখ দুটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল এবং প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর জেগে উঠছিলাম। আমাদের গাড়িখানা যেমন অন্ধকার ভেদ ক'রে ছুটে চলছিল, তেমনি ভাবে আমার সঙ্গীরাও ঘুমের অন্ধকার ভেদ ক'রে চলছিলেন বাধাহীন নিশ্চিন্ততার সঙ্গে।

দিনের আলো বোধ করি গয়া থেকেই শুরু হ'ল। আমি আগেই জেগে বসে দু'চোখ ভরে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। এই ভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভাল লাগে। সমস্ত অন্তর দিয়ে নতুন দেশকে অনুভব করতে না পারলে

মনে হয় বাইরের ভ্রমণ অনেকখানি বৃথা হয়ে গেল। যাবার অবশ্য লক্ষ্য থাকে একটি বিশেষ জায়গা, কিন্তু সমস্ত পথ এবং আশপাশের সমস্ত মিলিয়ে তবে সেই বিশেষ লক্ষ্যস্থলটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই আপাতশূন্য পথ আমার কাছে লক্ষ্যের অপরিহার্য অঙ্গ, উপলক্ষ মাত্র নয়।

তার পর সঙ্গীরা যখন জাগলেন তখন দেখা গেল রাত্রের প্রথমার্ধে আমরা বহু উত্তেজনাপূর্ণ আলাপে, অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, দিনের আলোতে সেই অন্তরঙ্গ ভাবটি আর নেই। দিনের আলোয় কেউ কাউকে যেন আর চিনি না এই রকম ভাব। কোনো একটা স্টেশনে চা ইত্যাদি যে যার মতো নীরবেই খেলাম, এবং সবাই আত্মস্থ ভাবে চুপচাপ বসে রইলাম। প্রথম কথা শুরু হল বারাণসীর আগে গঙ্গা পার হবার সময়। দূর থেকে বারাণসীর রূপ দেখার যে সুযোগ পাওয়া যায় ট্রেনের মধ্যে বসে, অন্য কোনো বড় শহরের রূপ সেভাবে দেখার সুযোগ নেই, সেই রূপও অন্য কোনো শহরের নেই।

গঙ্গার জল তখনও সবুজ আভাবিশিষ্ট, অন্তত সেতুর উপর থেকে সেই রকমই মনে হচ্ছিল। বর্ষার জল তখনও এসে পৌঁছয় নি। এই সব উপলক্ষ ক'রে আমাদের দিনের আলোয় নতুন ক'রে পরিচয় শুরু হল, এবং হঠাৎ আলাপ এত জমে উঠল যে শেষে খাওয়াদাওয়া পালা ক'রে এক একজনের খরচে চলতে লাগল। অবশ্য বয়ঃকনিষ্ঠের উৎসাহ এবং খরচই বেশি হল। বঙ্কিমবাবু দ্বারবঙ্গের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে ডেয়ারি করেছেন, দুধ ও দুধের থেকে উৎপন্ন নানা জিনিষের কারবার চালাবেন এই তাঁর উদ্দেশ্য। ডাক্তার ভাদুড়ী তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে কাজের কথা আলোচনা শুরু করলেন। ন্যাশনাল ইনফার্মারির রোগীদের জন্য সুবিধায় দুধ পাওয়া যেতে পারে কি না তাঁর মাথায় ঘুরছে এই ভাবনা। ন্যাশনাল ইনফার্মারি যে কয়টি যক্ষ্মারোগীকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের জন্য তিনি খুবই চিন্তিত বোঝা গেল তাঁর কথায়। হাসপাতালটি উঠে যেতে পারে এমন আশঙ্কা নাকি দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের অনেক আলোচনা হল এবং কি ক'রে এই পুরাতন অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

হাসপাতালটি সম্বন্ধে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সে সম্পর্কেও অনেক আলোচনা হল।

গাড়ির ভিতরেই স্নান খাওয়া শেষ ক'রে নিলাম সাড়ে এগারোটার মধ্যে। দুপুরের পরে গরম ক্রমে বাড়তে লাগল এবং এর পর আর জানালা খুলে রাখার উপায় রইল না। বাইরের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছে, কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলাম দিগন্তব্যাপী মাঠ—অথচ সবুজের চিহ্নমাত্র নেই, সব যেন পুড়ে গেছে, গরমে বাইরের রোদ যেন কাঁপছে, আর মাঠের মাঝে মাঝে চক্রাকারে ধুলো উড়ে উড়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, বহু দূরের গাছপালা সে ধূলোয় মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ট্রেনের দু-পাশে মাটিতে ছোট ছোট কাশগুচ্ছ সেই শুকনো মাটি ভেদ ক'রে একটু ক'রে সবুজ চিহ্ন এঁকে গেছে। আর মাঝে মাঝে আসছে আমগাছের সারি। প্রকাণ্ড এক একটা গাছ, ডালগুলো হাজার হাজার হলুদ রঙের ছোট ছোট আমের ভারে যেন কাতর হয়ে পড়েছে। এই অতিক্ষুদ্র দেশী আম এমন অজস্র ফলে' আছে, অথচ মনে হল সেগুলো খাবার লোক নেই। আমগুলো প্রায় সবই পেকে উঠেছে, তখনও জানি না এ আম সুখাদ্য কি না, কিন্তু যাই হোক অখাদ্য যে নয় তা বোঝা যায় গাছের সংখ্যা দেখে। অখাদ্য হলে এত বড় বড় গাছ এ রকম সারিবদ্ধভাবে এতগুলো এই কাঠের অভাবের দিনে কেউ সহ্য করত কি না সন্দেহ।

মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকখানি মাটির ঘর একই রকমের, বাইরের দিকে কোনো দরজা বা জানালা নেই এবং গ্রামের মধ্যে যতগুলি বাড়ি আছে তা একসঙ্গে একটি গুচ্ছের মতো ঘনসন্নিবিষ্টভাবে সাজানো। দূর থেকে এক একটি গ্রাম এক একটি দুর্গের মতো দেখায়। কোনো কোনো গ্রামের কাছে ছোট দু-একটা জলাশয় দেখা গেল, আর যেখানেই এ রকম জলাশয় অথবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানেই সামান্য কিছু চাষের ব্যবস্থাও আছে, এবং দু-এক খণ্ড জমিতে সবুজ শস্যেরও চিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু দু-ধারের সেই দিকচক্ররেখা ব্যাপী পতিত ক্ষেতের মধ্যে তার পরিমাণ মরুভূমির এক এক বিন্দু ওয়েসিসের মত। এমন বিরাট

প্রান্তর জলের অভাবে যেন হাহাকার করছে। অল্প কিছু দিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটির দিকে তাকালে বোঝা যায়, কিন্তু সে বৃষ্টিতে কোথায়ও জল জমে নি, ফাটা মাটি যেমন ছিল তেমনি আছে, ধুলো যেমন ছিল তেমনি আছে, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের তৃষ্ণার্ত মাটি সব জল শুষে নিয়েছে।

ভাবছিলাম খাদ্যবিষয়ে দু-এক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এ রকম কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সমস্যার বিরাটত্বের দিকে চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কলের লাঙল দিয়ে এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির মতো জায়গার সমস্ত খণ্ড জমি একসঙ্গে চাষ না করলে এবং জলের যথেষ্ট বন্দোবস্ত না করলে ফসল ফলবে কি ক'রে? এ রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারলে সে হবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমান। কন্‌স্টিটিউশনাল উপায়ে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চলতে পারে, কিন্তু কনস্টিটিউশনাল উপায়ে ফসল ফলানো এ অবস্থায় সম্ভব মনে হল না। অবশ্য ভারতবর্ষে যত জমি পতিত পড়ে আছে তার হয় তো সামান্য একটা অংশ চাষের উপযোগী করতে পারলেই ভারতীয় খাদ্যসমস্যা মিটে যেতে পারে, জমির পরিমাণের দিকে চেয়ে দেখলে সেটা কল্পনা করা যায়।

ট্রেন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে ছুটে চলেছে। শিল্পী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে স্থলদৃশ্যের বর্ণের দিকে—সবুজহীন এমন মাঠের দৃশ্য বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই না। অন্য সঙ্গীরা গরমের ঘায়ে একেবারে শুয়ে পড়েছেন। আমরা যে রাত্রিটি বিহারের সীমানায় কাটিয়েছি সে রাত্রিতে এমন ঠাণ্ডা হাওয়া ছিল যে শীতে দু'একটি জানালা বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছিল, তার পরেই যে যুক্তপ্রদেশে এসে এমন আগুনের মধ্যে পড়তে হবে কল্পনা করা যায় নি। আমরা যে উত্তাপ অনুভব করছিলাম তা ১১২ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নিচে নয়। বিকেল হয়ে এলো তবু গরম হাওয়া কিছুমাত্র ঠাণ্ডা হল না।

একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ট্রেন যাত্রীদের কাছে সেই দেশী আম বিক্রি করতে এনেছে দেখে কিছু আম কিনলাম—পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য। কৌতূহল ছিল এই আমের স্বাদ কেমন

জানতে, কারণ এই ঘাটতি খাদ্যের দিনেও কেন এত পাকা আম গাছে ঝুলে আছে, পেড়ে নেবার লোক নেই, তা জানা দরকার। আম ছ'টির দাম চার পয়সা নিল এবং ঐ সঙ্গে কালোজামও কিনলাম কিছু, স্বাদ পরীক্ষার জন্য নয়, খাওয়ার জন্য। জামগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু আমগুলি নিতান্ত সাধারণ, তবে টক নয়, অথচ খুব মিষ্টিও নয়, আঁশহীন নিরেট সার—লোভনীয় নয়, নিতান্ত অখাদ্যও নয়। জাম কুড়িটি ক'রে এক এক ঠোঙা দু'পয়সা, এতই ভাল লাগল যে সবাই প্রায় কাড়াকাড়ি ক'রে খেলাম, আরও পাওয়া গেলে আরও কেনা যেত।

সন্ধ্যার পূর্বে রোদের তেজ কমে এলেও হাওয়ার তাপ খুব বেশি কমেছে বলে মনে হল না। রেলের ধারের একটি জলাশয়ে অনেকগুলো ছোট ছেলে খেলা করছে, কিন্তু কাছে আসতেই দেখি সেগুলো নর নয়, বানর। সে এক অদ্ভুত খেলা। তারা তিন-চারটি দলে ভাগ হয়েছে, এক এক দলে চার-পাঁচটি ক'রে। তারা ঠিক মানুষের মতো এক জন আর একজনকে টেনে চিৎ ক'রে ফেলছে জলের মধ্যে; আবার সে উঠে আক্রমণ চালাচ্ছে, কখনো ক্রমাগত জল ছিটিয়ে দিচ্ছে এক দল আর এক দলের গায়ে। মনে পড়ল রাম রাজত্বেই তো এসে পড়েছি।

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম লক্ষ্ণৌতে। সেখানে দিনের যাত্রীরা সব নেমে গেলেন এবং শোবার যাত্রী দু-এক জন নতুন উঠলেন। আমরা ছিলাম মাঝামাঝি জায়গায়। আমার সম্মুখের প্রান্তসীমায় এক বৃদ্ধা মহিলা বহু জিনিষ-পত্র নিয়ে উঠেছিলেন হাওড়া থেকে, তাঁর ভারসাম্য রক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে উঠলেন এক বৃদ্ধা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা, দু'জনে দুই চরম প্রান্তে শুয়ে আছেন, আমরা মধ্যপন্থীরা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কখনও একটু শুয়ে কখনও একটু বসে আলাপ আলোচনায় কাটাচ্ছি। আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে নৈশাহারের অর্ডার দিয়েছিলাম, হর্দোই স্টেশনে খাবার দিতে। এই খাবারের কথা মনে থাকবে। অত্যন্ত বাজে ভাত ও মাংসের ঝোল, ঝালের শ্রাদ্ধ। তার আগে ফয়জাবাদ স্টেশনে চা ও সামান্য কিছু খাবার খেয়ে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল, কারণ

'খাস্তা' নামক কলকাতায় প্রাপ্তব্য দু'পয়সা দামের কচুরি প্রত্যেকখানা চার আনা ক'রে এবং পচা অ্খাদ্য কেক তিন আনা ক'রে। কেক ফেলে দিতে হ'ল, কিন্তু দাম দিতে গিয়ে দেখলাম গলা কাটার ব্যবস্থা খুব ভালই এখানে। শুধু এখানে নয়, রেলের প্রায় সর্বত্রই বহু বিষয়ে অমনোযোগিতা এবং শৈথিল্যের রাজত্ব। ট্রেন-যাত্রীরা দলে দলে প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিক দিয়ে নেমে চলে যাচ্ছে, টিকিট দেওয়া বা রেলের লোকের টিকিট আদায় করা যে একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ তা মনে হল না সব দেখে শুনে। যাত্রীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ ভার যাদের উপর, তারা সামান্য জিনিষ দিয়ে যা দাম নেয় এ দুর্মূল্যের বাজারেও তা দৃষ্টিকটু। তদুপরি খাদ্যবস্তু প্রকৃতই খাদ্য কিনা তা পরীক্ষার হয় তো কোনো ব্যবস্থাই নেই। অনেক সময় তার চেহারাই অরুচিকর। অথচ এই সব অসাধু ব্যবসায়ীকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ভার দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গ্লানিকর, লজ্জাকর এবং দেশবাসীর পক্ষে অপমানকর।

রাত্রে সবাই শুয়ে আছি। গাড়ির পাখাগুলি শেষ শক্তি দিয়ে ঘুরে চলেছে কিন্তু আবহাওয়া এতই গরম যে তাতে কোনো ফল হচ্ছে না। দ্বিতীয় রাত্রির শোয়াটা তাই খুব আরামপ্রদ বোধ হল না। তবু প্রথম অবস্থায় কিছু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, সামান্য একটু নিদ্রার আবেশ এসেও ছিল, এমন সময় কোন্ একটা স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার পর (গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াবার আগে) একটা শব্দ শুনে হঠাৎ জেগে দেখি দুটি সন্দেহজনক চেহারার লোক জানালা দিয়ে আমাদের কামরায় ঢুকছে। এক জনের হাতে ছোট একটা টিনের সুটকেস, অপর জনের মুখে বিড়ি, খালি পা এবং দু'জনেরই পোশাক খুব ভদ্র নয়। কামরার অনেকগুলো আসনই খালি ছিল, তারা নিশ্চিন্ত মনে একটায় বসে পড়ল। আমার মন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কোথায় যাবে? তোমাদের টিকিট আছে তো? আমার কথায় তাদের একজন চট্ ক'রে উঠে এলো আমার কাছে তার টিকিটখানা নিয়ে। দেখি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। সে নিজেই বলল,

অল্প দূরের যাত্রী তারা, যে স্টেশন থেকে উঠেছে সেখানে কোনো টিকিটই ছিল না ফার্স্ট ক্লাস টিকিট ছাড়া, বাধ্য হয়ে তাই কিনতে হয়েছে এবং ঐ টিকিট নিয়ে তারা ফার্ষ্ট ক্লাসে ওঠার চেষ্টা ক'রেও উঠতে পারে নি, দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল, তাই শেষ মুহূর্তে সেকেণ্ড ক্লাসের জানালা দিয়ে উঠে পড়েছে এই কামরায়। প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখে এবং ওদের কথা শুনে ওদের প্রতি সহানুভূতি জাগল, তাই ঘুমের গাড়িতে উঠে অপরাধ করলেও আমাদের আর তাতে কিছু মনে করবার ছিল না। তারা মোরাদাবাদ স্টেশনে নেমে গেল।

আমার আর ঘুম হল না, প্রথমতঃ চোরের ভয়ে, কারণ গাড়িতে সবাই ঘুমে আধমরা, এবং জানালা খোলা। দ্বিতীয়তঃ নজিবাবাদে ভোর পাঁচটায় নামতে হবে, এবং ৮০০ মাইল পশ্চিমে ভোর পাঁচটায় বেশ অন্ধকার থাকবে, সুতরাং ঘুমিয়ে বেশিদূর চলে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই আমি সেই গভীর সুষুপ্তির পরিবেশে একা জেগে বসে রইলাম জানালার ধারে। হাওয়া এতক্ষণে কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, বাইরে পশ্চিম আকাশে একটুখানি চাঁদ দিগন্তবিস্তৃত মাঠকে রহস্যময় ক'রে তুলেছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি আমি একা জাগ্রত নই। কর্ম-চঞ্চল পৃথিবী জেগে উঠেছে আমারই সঙ্গে। রাত তখন প্রায় চারটে হবে, দেখি কৃষকেরা মাঠে চাষ শুরু ক'রে দিয়েছে এর মধ্যেই। রেলের ধারে ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে চলেছি, তার প্রত্যেকটি বাড়িতে সবাই জেগেছে। স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে বাইরে খাটিয়ার উপর বসে আছে। মনে হল, দিনের দুর্দান্ত গরমে এরা যে কাজ করতে কষ্টবোধ করে, সে কাজ এরা রাত্রে শুরু ক'রে দেয়।

নজিবাবাদ স্টেশনটি ছোট হলেও এখানে বহু যাত্রী ওঠানামা করে, কারণ এটি একটি জংশন। এখানে সকালে এসেই আমরা কোটদ্বার যাবার গাড়ি পেয়ে গেলাম। ট্রেনে মাত্র প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী। ষোল মাইল পথ যেতে ঘণ্টাখানেক লাগল, গাড়ি খুবই আস্তে চলছিল। আমরা আটটা আন্দাজ সময়ে কোটদ্বারে পৌছে গবর্ণেন্ট রোডওয়েজ-এর টিকিট কিনে বাস-এ উঠে বসলাম। এখান থেকে তিনখানা বাস পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে পর পর ছাড়ে। হিমালয়ের দৃশ্য এইখান থেকে বেশ দেখা যায়।

আমরা চলছি শেষ বাসখানিতে। ল্যান্সডাউন এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল, এই ছাব্বিশ মাইল যেতে বাস প্রায় ৬০০০ ফুট উপরে উঠে যাবে। পাহাড়ের পাশ কেটে কেটে ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে রাস্তা উর্ধ্বমুখে যাত্রা করেছে, সব পাহাড় পথেরই চেহারা প্রায় এক। প্রথম ঘণ্টাখানেক বেশ প্রশস্ত পথ পাওয়া গেল, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী নদীর প্রায়-শুকনো উঁচু তীরভূমির পাশ দিয়ে চলেছি, নদীর বুকে প্রকাণ্ড বড় বড় পাথর বর্ষায় পাহাড় থেকে নেমে এসে আটকা পড়েছে। ওপারে শাল গাছ এবং অন্যান্য গাছের ঝোপ। শুকনো নদীটির দৃশ্য এমনই চমৎকার যে শিল্পী বার বার বলছিল এইখানেই নামা যাক। আমি আশ্বাস দিচ্ছিলাম—যেখানে যাচ্ছি সেখানেও অবশ্য অনেক ভাল ভাল দৃশ্য পাওয়া যাবে।

দোগাদ্দা নামক একটি দু'পথের সঙ্গমে এসে বাস থেমে গেল। আমাদের পূর্বগামী বাসগুলোও এখানে থেমে আছে দেখলাম। অন্যান্য পথের আরও অনেকগুলো বাস। পূর্বগামীরা একে একে ছেড়ে গেল, তারপর মিনিট পনেরো পরে আমরাও চলতে শুরু করলাম। ল্যান্সডাউনের পথে সরকারী বাস ছাড়া অন্য কোনো বাস বা গাড়ি চলে না। শোনা গেল প্রাইভেট সার্ভিস থাকাকালীন পর পর দুখানা যাত্রী বাস পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যাত্রী অনেক মারা পড়েছে, তাই এই নতুন ব্যবস্থা। পাহাড়পথ সত্যই খুব বিপজ্জনক বোধ হল বাস-এর পক্ষে। পথ ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। যেখানে মোড় ঘুরবে সেখানে অবস্থা এমনি হয় যে দু'তিন ইঞ্চি একটু বেশি গেলেই অধঃপতন অনিবার্য। যদিও মোড় ঘোরার কোণগুলো বৈজ্ঞানিক হিসাব মতো এমন ভাবে একদিকে হেলিয়ে তৈরি যাতে পথ আপনা থেকেই গাড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু তবু সে সময় গাড়িকে পথের এক পাশে এত বেশি যেতে হয় যে আত্মরক্ষার জন্য উদ্বৃত্ত জমি দু'ইঞ্চিও থাকে কি না সন্দেহ। এমনি অবস্থায় ঠিক মুহূর্তে স্টিয়ারিং ঘোরাতে না পারলে গাড়ির পক্ষে পতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। পথও এমন এলোমেলো যে ডান দিকের মোড় ঘুরতে না ঘুরতে তৎক্ষণাৎ বাঁ দিকে ঘুরতে হয়, আবার সে দিক থেকেও সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে, সে সময় বাস

প্রায় লাফাতে থাকে। কিন্তু তবু ভরসার কথা এই যে আমরা তো জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ঠিক এমনি করেই বেঁচে আছি, এক চুল এদিক ওদিক হলে কুমায়ুন পর্বতমালার চক্রপথেই হোক অথবা কলকাতার সমতল রাজপথেই হোক, সর্বত্রই ঐ একই পরিণাম।

স্থলদৃশ্য ক্রমশ বদলে যাচ্ছে—যত উপরের দিকে উঠছি। ছোট ছোট শাল গাছ যা পিছনে ফেলে এসেছি তা আর নেই, এখন পাহাড়ী গাছের মধ্যে চিড় পাইনের আতিশয্যই বেশি। পাহাড়ের চেহারা অভিনব, কারণ চার হাজার সাড়ে চার হাজার ফুট এক একটা পাহাড় মাথা থেকে তলদেশ পর্যন্ত চতুর্দিকে শত সহস্র সিঁড়ির বেষ্টনীতে ঘেরা। চাষের জন্য এইভাবে পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত তৈরি হয়েছে, ইংরেজীতে স্টেপ বা টেরাস কালটিভেশন বলে। কতদিনের কত পরিশ্রমে এক একটা আস্ত পাহাড় কেটে কেটে এইভাবে চাষের জমি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে তা ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। উপত্যকাগুলি সবই পাতলা কুয়াসার আবরণে ছাওয়া। দূরের পাহাড় কুয়াসায় প্রায় অদৃশ্য।

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাপী দৃশ্যসমুদ্র পার হয়ে আমরা পৌছলাম অরণ্যগর্ভের ল্যান্সডাউন শহরে। এটি একটি ক্যান্টনমেন্ট বা 'ছাউনি'। ছোট্ট জায়গাটি যেন কেবলমাত্র গড়বালি রেজিমেণ্টের জন্যই তৈরি, সুতরাং সেনানিবাসের আয়োজনটাই সেখানে সব চেয়ে বেশি। ওখানকার বাসিন্দারাও সেনানিবাস সংক্রান্ত চাকরি উপলক্ষে সেখানে আছেন—সুতরাং ছোটখাটো একটি বাজারও আছে। বাইরের কোনো লোক এখানকার দৃশ্য উপভোগের জন্য আসে না, বোধ হয় এ বিষয়ে আমরাই প্রথম। তাই হয় তো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকব।

এখানে চাকরি উপলক্ষে কয়েক ঘর বাঙালী আছেন। হরিধন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার অফিসের কর্মী, তার বাড়িতেই আমরা উঠেছি। এই উপলক্ষে এই দূর দেশের বাঙালী গৃহস্থালীর চেহারাটাও কিছু দেখা গেল। রান্না ঘরের ব্যাপারটি অনেকটা সরল, কেন না এখানে মাছ দুর্লভ এবং মাংস যা পাওয়া যায় তা প্রায় অখাদ্য। সুতরাং ডিম ও ডাল এবং কিছু তরকারী এখানকার দৈনন্দিন

আহার। তবু এই সরল ব্যাপারেও শ্রীমতী ইলা, শ্রীমতী ছায়া ও বালক জ্ঞান সিং প্রতি বেলা তিন চার ঘণ্টা প্রাণান্ত পরিশ্রম কেন করছে কৌতূহল বশতঃ তার সন্ধান নেওয়া গেল। দেখলাম ১৮ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট এক একটা আস্ত কাঠের খণ্ড জ্বালানো হচ্ছে উনুনে,—তদুপরি যাদের উপর মূল বিষয়ের দায়িত্ব তারা দু'জনেই সন্থ কলেজ উত্তীর্ণ, মনে হল শেখা এবং কাজ একই সঙ্গে চলছে।

এই বাড়ির সম্মুখে একটি পাহাড়ে কুচকাওয়াজের মাঠ। এইখানে দরবান সিং নেগি নামক গড়বাল সিপাই নায়কের স্মৃতিফলক আছে। যে সকল ভারতীয় সিপাই প্রথম মহাযুদ্ধে সর্বপ্রথম ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পায় তার মধ্যে সে একজন, সুতরাং দরবান্ সিং নেগি গড়বালদের কাছে বিশেষ সম্মানীয়।

পথে আসতে সিঁড়ি পথের যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কাছাকাছি দেখেছিলাম এবং যা দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছিল সেখানেই নেমে পড়ি—ছ' হাজার ফুট উপরে এসে সে সব দৃশ্য অনেক নিচে পড়ে গেছে। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। দূর থেকে ছবি নেওয়ার অসুবিধা, কারণ সর্বদা পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে কুয়াসার ঢাকন আছে তা যত দূরে যাওয়া যায় ততই গভীর দেখায় এবং ভেদ ক'রে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায় না।

শহরের পথ ঘাট নির্জন, চারদিকে বড় বড় গাছ, তার ভিতরের পাহাড়ী উঁচু নিচু পথগুলিকে ঘিরে একটা গভীর নির্জনতা। ঘন ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পথের উপর এখানে-সেখানে রোদের খেলা। শিল্পী বেরিয়ে গেছে রং তুলি কাগজের ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। এক এক বেলা এক একখানি রঙীন ছবি আঁকা শেষ ক'রে ফিরছে। আকাশে এক বিন্দু মেঘ নেই, দিনে আস্বাভাবিক গরম, পাহাড় পথ অত্যন্ত উঁচুনিচু, একটু হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ি—অথচ সে পরিশ্রমের সার্থকতা নেই ক্যামেরার কাছে। তদুপরি পথে পথে সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধ মহড়া চলছে, নির্জন মনে ক'রে যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের খেলা। শিল্পী এখানে বেমানাম, ক্যামেরা ঘাড়ে এদের মধ্যে ঘোরা সন্দেহজনক, নিজেরই কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। তদুপরি

প্রবাসী প্রবাসিনীরা দু'জন বাঙালী অতিথি পেয়ে আতিথেয়তা যেমন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শুরু ক'রে দিল তাও আমাদের পক্ষে সঙ্কোচের কারণ হয়ে দাঁড়াল। বাইরের প্রকৃতি প্রতিকূল, ঘরে যত্নের আতিশয্য, এ দুই-ই আমাদের মতো দুই ঘরছাড়ার পক্ষে লজ্জাকর। দু'জন গোপনে পরামর্শ করলাম এবারে বিদায় হওয়া দরকার। ঠিক হল এখান থেকে হরিদ্বার ও হৃষিকেশ যাব এবং সেখান থেকে সোজা কলকাতা ফিরব।

এমন সময় সিমলা থেকে হঠাৎ এলো এক পোস্টকার্ড—"বর্ষার মেঘ অপূর্ব্ব শোভা নিয়ে তোমার ক্যামেরার অপেক্ষা করছে—সমস্ত সিমলা-প্রকৃতি বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হয়েছে কালীকিঙ্করের জন্য।"

কলকাতা ছাড়বার আগে বন্ধু কিরণকুমার রায়কে ল্যান্সডাউনের ঠিকানা দিয়ে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম—তারই জবাব ওটা। এর পর কি ক'রে কি হয়ে গেল ঠিক মনে নেই, যখন অবস্থাটা প্রথম উপলব্ধি করলাম তখন দেখি আমরা সমতলভূমিতে নেমে নজিবাবাদ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে আছি। সিমলা যাবার ট্রেন কখন জানি না, কি পরিমাণ দুঃখভোগ অদৃষ্টে আছে তাও জানি না, কিন্তু আমরা ছ' হাজার ফুট নেমে এসেছি নিচে। ল্যান্সডাউনে থাকতে যত রকমে সম্ভব সিমলা যাবার সুবিধাজনক সময়-তালিকার সন্ধান নিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ দিতে পারেন নি। পঞ্জাবী শিখ, পঞ্জাবী হিন্দু, যুক্তপ্রদেশের লোক, বাঙালী, কেউ জানেন না কোন্ গাড়িতে কোথায় গিয়ে প্রথম নামতে হবে। তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়েছিলেন এই যে আম্বালায় গিয়ে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কালকা যাবার গাড়ির জন্য।

নজিবাবাদে এসে শুনলাম রাত প্রায় ১১টায় একখানা গাড়ি আছে, সাহারানপুরে গিয়ে গাড়ি বদল করতে হবে। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখা গেল সে গাড়িতে গিয়ে লাভ কি? অপেক্ষা যদি করতেই হয় তবে নজিবাবাদেই ভাল। অতএব রাত প্রায় ১টার গাড়িতে যেতে হবে। টিকিট করতে গিয়ে জানা গেল ১২টার পর তারিখ বদল হবে, অতএব টিকিটও ১২টার পরেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু রেলওয়ের যে লোকটি ১২টার পূর্বে এ কথা বলেছিলেন তিনি ১২টার পর মত পরিবর্তন করলেন। অর্থাৎ পুনরায় টিকিট কিনতে গেলে তিনি বললেন অল্প দূরের টিকিট এ গাড়িতে বিক্রি করা হয় না। দেখা গেল রেলওয়ের লোকদের গাড়ির সময়-তালিকা এবং কোন্ গাড়িতে কোথায় যাওয়া সুবিধা সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই একটি ক'রে আলাদা মত আছে। তাঁদের যখন যা ধারণা, হয় তো তাই বলে দেন, হয় তো তাঁরাও ইম্প্রেশনিস্ট। ট্রেনের সময়-তালিকা ইত্যাদি খুঁটিনাটি তথ্য একমাত্র কুলিরাই ঠিক বলতে পারে। কুলিরা প্রি-র‍্যাফেলাইট।

অতএব পরদিন সকাল পর্যন্ত নজিবাবাদ ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে সকাল সাতটা আন্দাজ সময়ে সাহারানপুরগামী একখানা গাড়িতে চেপে বসা গেল। সকাল বেলা গরম বেশি ছিল না, গাড়িও প্রায় খালি ছিল। কিন্তু দশ-বারো বছরের দুটি নোংরা ছেলে ক্রমাগত আম খেয়ে খেয়ে গাড়ির একটা ধার জঞ্জালে পূর্ণ করতে লাগল। তারা বিনা ভাড়ায় সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। তারা বলল পুলিসে ধরুক এই তারা চায়, তা হলে খেতে পাবে। অত্যন্ত অকালপক্ব চালিয়াত বস্তির ছোকরা। কিন্তু পুলিসে তাদের ধরল না, কেউ তাদের কিছু বলল না, কারোই এ বিষয়ে কোনো গরজ নেই। আমাদেরও টিকিট হাওড়া থেকে ছাড়বার পর কাউকে কোথাও দিতে হয় নি। টিকিট কেনাই অর্থহীন বলে মনে হয়েছে অনেক সময়। বিনা টিকিটে ভ্রমণের এমন সুযোগ চোখে না দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। এ সুযোগ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করছে নির্বিকার ভাবে।

রুড়কির পথে সাহারানপুর এসে পৌঁছলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। আবার ওয়েটিং রুম, আবার অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা। এখানে কুলিদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে দেখা গেল সন্ধ্যার পূর্বে একটা গাড়ি ছাড়ে সেটাতেই আম্বালা গেলে তার কিছু পরেই কালকার গাড়ি পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্বের কোনো গাড়িতে না যাওয়াই স্থির করলাম। এখানে অসহ্য গরম, কিন্তু সব বন্ধ ক'রে ওয়েটিং রুমে থাকতে ততটা কষ্ট নেই। দুপুরে স্নান ক'রে ওখানে বসেই ভাত, মাছের

কাটলেট এবং ডাল খাওয়া গেল। ট্রেনে বা ওয়েটিং রুমে এর চেয়ে ভাল খাওয়া আর কোথাও জোটে নি। রুচিকর ডিশ প্লেট, উৎকৃষ্ট চালের ভাত, সুমিষ্ট ডাল ও মাছ এবং পরিবেশনের পারিপাট্য—সব মিলিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিকর। এ রকম বিশেষ যত্ন পেলাম তার একটি কারণ অনুমান করি এই যে ওয়েটিং রুমের রক্ষক ফকির চাঁদের সুনজরে পড়েছিলাম আমরা আগেই। বৃদ্ধ ফকির চাঁদের চেহারাটি ছিল লোভনীয়, আমি তার ছবি তুলে নিয়েছিলাম এবং কালীকিঙ্কর ব্রাউন পেন্সিলে তার একখানি চমৎকার প্রতিকৃতি এঁকেছিল। আঁকা ছবিখানা তাকে তখনই দিয়ে দেওয়া হল, এবং তাতে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। বোধ হয় এই কারণেই ফকির চাঁদ আমাদের আহারের তত্ত্বাবধান করেছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল নজিবাবাদের একটি কাহিনী। ল্যান্সডাউন থেকে ফিরে আমরা ঐ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার সময়ে শিল্পী শহর দেখতে বেরিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে যে কাহিনীটি বলল তা এই। সে একটি বাড়িতে মসজিদ দেখে তার স্কেচ এঁকে নিচ্ছিল পেন্সিলের সাহায্যে, সেই বাড়ির মালিক তা দেখে শিল্পীর প্রতি এমন সশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন যে তাকে বাড়িতে নিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়লেন, এবং শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে এদিকে এলে তাঁর বাড়িতে অতিথি হতেই হবে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথা তিনি বার বার তাকে বললেন। শিল্পী বিস্মিত হয়েছিল তাঁর সৌজন্য দেখে।

সন্ধ্যার পরে আম্বালা পৌঁছলাম। সেখানে রাত্রের আহারের সন্ধানে গিয়ে দেখি ভাত কোথাও নেই। স্টেশনের খাবার ঘরে ভাত ছাড়া আর সবই আছে। বোঝা গেল খাঁটি পঞ্জাবে এসে পড়েছি। ঘণ্টা দুই পরেই কালকার গাড়ি পাওয়া গেল। গাড়িতে ভিড় ছিল না আদৌ, আমরা দু'জন আর একজন সুট পরা পঞ্জাবী হিন্দু যুবক। বেশ স্বাস্থ্যবান। কিন্তু সে তার কথায় এবং ভাব-ভঙ্গিতে যে অশিক্ষা এবং অমার্জিত ভাবের পরিচয় দিল তাতে স্তম্ভিত হতে হয়। বাংলায় গোবর গণেশ বলতে যা বোঝায় তাই, কিন্তু সে যে কোনো সরকারী বড়কর্তার আত্মীয় সে কথাটি বার বার উচ্চারণ না ক'রে থাকতে পারল না।

বাংলাদেশের কোনো ভদ্র যুবক সম্পর্কে কিন্তু এতখানি অজ্ঞতা ও রুচিহীনতা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, ওদেশে আমরা যাকে সংস্কৃতি বলে জানি, তা তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে নেই, তা যে থাকা উচিত সে ধারণাও বোধ করি কারও নেই।

আমাদের দ্বিতীয় রাত্রিবাস হল কালকার ওয়েটিং রুমে। পরদিন সকালে সিমলার গাড়ি। গাড়িতে গিয়ে উঠতে না উঠতে এমন ভিড় হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত অনেকেই দাঁড়িয়ে বা নিচে বসে বসে চললেন। বারো জনের জায়গায় প্রায় ত্রিশজন যাত্রী, তবে সুবিধা এই যে রেলওয়ের ওতে আয় বেশি হয়, যাত্রীদের অসুবিধা যেটুকু হয়, তা স্বদেশী রেলওয়ের জন্য আত্মত্যাগ হিসাবে ধরে নিলে মনে আর কোনো গ্লানি থাকে না।

কিন্তু আমাদের মনের গ্লানি আরও সহজে দূর হল। পাহাড়ের এলোমেলো পথের দু'ধারে প্রতিমুহূর্তে নতুন দৃশ্য, প্রতি পাকে এক একখানা নিখুঁৎ ছবি, ছবির পর ছবি বদল হচ্ছে চলচ্চিত্রের মতো। একই জায়গায় বসে এক একটা পাহাড় বেষ্টন ক'রে চলেছি চারদিকের অপরূপ শোভার ভিতর দিয়ে। কখনো উপরে উঠতে এঞ্জিন হাঁপিয়ে উঠছে, কখনো দ্রুত গতিতে কিছু নিচে নেমে যাচ্ছে, কিছু সোজা পথে, বহু বাঁকা পথে, বহু টানেলের অন্ধকার পথে ছুটে চলেছি আট হাজার ফুটের উচ্চ লক্ষ্যে।

জেমস্ ওয়াট বাষ্পশক্তি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন দু'শো বছর আগে, সেই শক্তি কি নিষ্ঠার সঙ্গে আজ দুটি বাঙালী সন্তানকে সৌন্দর্যের স্বর্গে টেনে নিয়ে চলেছে সে কথাটি হঠাৎ মনে এলো। আর ঐ সঙ্গে মনে এলো বন্ধুর পোস্টকার্ডের দুটি লাইন—তার ক্ষমতাও এই বাষ্পীয় শকটের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়। এক শক্তি দেহকে টানছে, আর এক শক্তি মনকে। একই কথা বহু বিস্তারিত ক'রে মুখে উচ্চারণ করলে কথার শক্তি অনেক কমে যায়। কিন্তু সংক্ষেপে সেই কথাটি লেখা হলে তার শক্তি তখন কে মাপবে ? উচ্চারিত কথার ইঙ্গিত যায় হাওয়ায় মিলিয়ে, কিন্তু লিখিত কথা রেডিয়ামের মতো তেজ বিকিরণ করতে থাকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের যে একটি নতুন রূপ দেখলাম তা হিমালয় পর্বত শ্রেণীতে কল্পনার অতীত ছিল। কোথায়ও এ রকম বিরাট নেড়া পর্বতের বেআব্রু শোভা দেখি নি। আমরা তখন তার উপর দিয়ে চলছিলাম। নিচের দিকে অন্ততঃ পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত একটি উদ্ভিদের চিহ্ন নেই। সেই সব পাহাড়ের ব্রাউন রঙের ঢেউ খেলানো ঢালু গায়ের উপরে রোদ পড়ে সমস্ত পাহাড় আর তলভূমি আশ্চর্য শোভা ধারণ করেছে। শিল্পী বলে, আর এগিয়ে কাজ নেই, এইখানেই নামা যাক। বুঝতে পারছিলাম এর অপেক্ষা অভিনব সুন্দর দৃশ্য এ পথে আর পাব না। কারণ এ রকম অভিজ্ঞতা সর্বত্রই হয়েছে। সুন্দরতম জায়গা সব সময়েই লক্ষ্যস্থলের মাঝপথে ফেলে যেতে হয়।

সিমলায় পৌছলাম আমরা প্রায় আড়াইটার সময়। স্টেশন থেকে উপরে উঠেই শহরের বিরাটত্ব উপলব্ধি করলাম। এখানে চারদিকে যত লোকালয়ের চিহ্ন দেখলাম, কাছের দূরের সমস্ত পাহাড়ের মাথায় মাথায় যত বাড়ি দেখলাম, তাতে দার্জিলিং শহর এর কাছে শিশু।

কাইথু অঞ্চলটি সিমলার প্রধান কেন্দ্রস্থল থেকে অনেকটা নিচে। স্টেশন থেকে অনেকটা দূর আসার পর যখন সেই নিম্নগতি শুরু হল তখন এ রকম প্রায়-খাড়া পথে নামায় অনভ্যস্ত আমার অসুবিধা হচ্ছিল খুবই। তা ভিন্ন পথের দীর্ঘ ক্লান্তি এ রকম পথে চলার পক্ষে অনুকূল নয়, সেজন্য এক একবার বেশ ভয় হচ্ছিল হয় তো এখানে আসাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে, এ পথে একবার নেমে আর উপরে ওঠার প্রবৃত্তি থাকবে না! দুর্বল দেহে অনভ্যস্ত পথে এ ভাবে ওঠা-নামা করা সত্যই অত্যন্ত কষ্টদায়ক। অসম্ভব রকমের খাড়া ঢালু পথ। অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা ক'রে নামছিলাম। অনেকটা দূর নেমে আসার পর বাঁয়ের দিকের বাঁক ঘুরে আরও নিচে নামছি এক ফুট প্রশস্ত অসমান পথে। কিছু দূর নেমে আবার ডান দিকের বাঁক ঘুরে চলছি। এরই শেষে দুর্গা-ভিলার দোতলা। চমৎকার ছোট বাড়িটি। উপরের তলায় কিরণকুমার রায় ও ফণী চাটুজ্জের বাস। এরা একই সঙ্গে কলকাতায় কাজ করত এবং অফিস সিমলায় উঠে এলে এরাও সিমলায় এসেছে বছর তিনেক হল। বাঙালী হিসাবে সাহসের

পরিচয় দিয়েছে সন্দেহ নেই, কেননা হঠাৎ এত দূরে আসতে হবে ভয়ে, অথবা অন্যান্য অসুবিধায়, অধিকাংশ বাঙালীই তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। প্রবাসে বাঙালীর সংখ্যা কি এখন দ্রুত কমে যাচ্ছে? দেখলাম ল্যান্সডাউনে মাত্র দু'তিন ঘর বাঙালী আছে, এবং ল্যান্সডাউন থেকে সিমলা যাবার পথে কোটদ্বারে ট্রেনের মধ্যে মাত্র একজন বাঙালীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি রেলওয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার, নজিবাবাদে আসছিলেন। এ ভিন্ন দু'দিনের পথে একটিও বাঙালী দেখিনি।

দুর্গা-ভিলায় এসে পৌছলাম তিনটের কিছু পরে। বাড়িটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে, কাজেই পাহাড় পথে সোজা এসে দোতলায় নামা যায়, এক তলায় নামতে হলে অন্য পথে ঘুরে নামতে হবে। বাড়ির সম্মুখের উন্মুক্ত দৃশ্যে মুহূর্তে আমাদের পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল (তার সঙ্গে অবশ্য ভাল ভাল খাবারও ছিল)।

আমি বহু পূর্ব হতেই ঠিক করেছিলাম বিকেলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করব, কোথায়ও বেরুব না, কিরণও বলল একবেলা বিশ্রাম করাই উচিত। কালী-কিঙ্করেরও সেই মত। সুতরাং গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী কমলাকে খাবার ঘরের পরবর্তী নৈশ বৈঠক তদ্বিরের ভার দিয়ে কিরণ আমাদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে বসে গেল। দুর্গা-ভিলা থেকে সম্মুখস্থ দৃশ্য খুব সুন্দর। দুই পাশে একটার পর একটা পাহাড় দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে, মাঝখানে আঁকা-বাঁকা উপত্যকা, অনেকটা দূরে দূরে এক একটা বাড়ি, পুতুলের বাড়ির মতো ছোট, পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। দূরের মানুষগুলোকে প্রায় পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। আকাশে ভাঙা মেঘ, সুতরাং আকাশের নীলিমা এখানে উপভোগ্য। পাহাড়ের গায়ে গায়ে 'রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা' পরম রমণীয়। সব পাহাড়ে একসঙ্গে রোদ পড়লে এত সুন্দর দেখায় না। এক এক সময় রোদে এক একটি পাহাড় আলোকিত হয়ে উঠছে তাতে মনে হয় যেন সমস্ত দৃশ্যপট খুশিতে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাঁয়ের দিকে দীর্ঘ উঁচু পাহাড় হাজার হাজার দেওদার গাছের অরণ্যে ঢাকা। মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বাড়ি

দেখা যাচ্ছে, এমন কি লাট সাহেবের বাড়িটিও তার উচ্চ স্থানের অসাধারণ গৌরব নিয়ে সাধারণ নিম্নতলবাসীর দৃষ্টিগোচর হয়ে আছে।

পায়ের নিচে চেয়ে দেখি টেনিস খেলার উপযুক্ত ছোট্ট একটুখানি জায়গা সমতল ক'রে তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত সবুজ পরিবেশে ঐ একটুখানি শাদা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। শুনলাম ওটি টেনিস কোর্ট নয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মাঠটিকে যে অত ছোট দেখাচ্ছে তার কারণ ওটি আমার অবস্থান থেকে নিচের দিকে অনেক দূরে অবস্থিত, পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই পরিপ্রেক্ষিত বোধে এই রকম ভ্রান্তি ঘটে। এই ঘোড়দৌড়ের মাঠের দৌড়ের দিন অনেকগুলো ঘোড়া দেখে প্রথমে সেগুলোকে পাখী মনে হয়েছিল। তার পর যখন তারা সেই ডিম্বাকৃতি মাঠে ছুটতে শুরু করল এবং শত শত লোকের চিৎকার চার দিকের পাহাড়ের প্রাচীরে বাধা পেয়ে উপরে উঠে এলো তখন মনে হল এটি ঘোড়দৌড়ই বটে। জায়গাটি যে অনেক দূরে অবস্থিত তার আর একটি প্রমাণ এই যে, সেই নির্জন আবহাওয়ায় অত লোকের সম্মিলিত চিৎকার অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে কানে এসে পৌছতে লাগল। কিন্তু সে হল আরও কদিন পরের অভিজ্ঞতা, কারণ ওখানে রেস খেলা হয় রবিবারে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ফণীর আবির্ভাব ঘটল এবং তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিমলা প্রবাসের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলতে লাগল। এখানে একটা বিষয়ে সবাই এক মত যে, এ রকম অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে, এমন নির্জন আবহাওয়ায়, কিছুকাল থাকা অভ্যাস করলে কোলাহল ও জনতাপূর্ণ জায়গা আর ভাল লাগে না। কথাটা সত্য। কারণ জায়গাটা এতই উঁচু যে সর্বদা মনের মধ্যে এই চেতনাটি জাগ্রত থাকে যে, ধূলিধূসরিত প্রতিদিনের অতি পরিচিত একঘেয়ে পৃথিবী থেকে হঠাৎ যেন মেঘের রাজ্যে উঠে এসেছি। এই ধারণাটি বিশেষ ক'রে বাঙালীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যার অর্থ হল—সাদাসিদে জীবন, উচ্চ চিন্তা (প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং)। ও দুটোর একটা হয় তো সম্ভব, কিন্তু দুটো এক সঙ্গে বোধ হয়

কোনো বাঙালীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সাদাসিদে জীবন কাটিয়ে উচ্চ চিন্তায় মশগুল কোনো বাঙালীকে আমি অন্তত দেখিনি। আমরা প্লেন লিভিং-এ অনেকেই অভ্যস্ত, কিন্তু হাই থিংকিং-এর পরিবর্তে হাইট থিংকিং করি। অর্থাৎ উচ্চ চিন্তার স্থলে উচ্চতার চিন্তা করি, এবং আমার মনে হয় প্লেন শব্দটিরও সমতল ভূমির সমার্থক অর্থটি ধরে নিলে আমাদের সম্পর্কে প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাইট থিংকিং কথাটি সম্পূর্ণ খাটবে। আমরা সেটাই ক'রে থাকি, অর্থাৎ সমতল ভূমিতে বাস ক'রে উচ্চতার চিন্তা করি। সিমলা সেই হাইট থিংকিং-এর বিড়ম্বনার হাত থেকে সিমলা প্রবাসী বাঙালীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই উচ্চতায় বসে নিজেকে নতুন ক'রে পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, অবশ্য এর জন্য মনের দিক দিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ মননশীল হওয়া আবশ্যক। এখানে বসে মনের প্রসারতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। দেশের কথা চকিতে যদি কখনও মনে পড়ে তখন একই সঙ্গে পঞ্জাব এবং বাংলা এই দুই দূরবিচ্ছিন্ন দেশ ও তার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত দেশের রূপ কি একই সঙ্গে মনে পড়ে না? কিন্তু এটি হল ভাবের দিক, অর্থাৎ একটু চেপে ধরলে যার স্পষ্ট অর্থ হারিয়ে যায়, সুতরাং এই দিকটির কথা আর না বলাই ভাল। সিমলার উচ্চতায় আরও আকর্ষণ আছে এবং সেটি সেই দিনই রাত্রে খেতে বসে প্রত্যক্ষ করা গেল। চমৎকার চাল, সুমিষ্ট মাছ, সুস্বাদু দুধ এবং নানাজাতীয় তরকারি এখানে প্রচুর। এমন সুখাদ্য মাছ যে এখানে মেলে (এবং ল্যান্সডাউনে আদৌ মেলে না) এই তথ্যটি জানা না থাকায় জ্ঞান-জগতে একটা মস্ত বড় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। ল্যান্সডাউনে ছিল জ্ঞান সিং, বালকমাত্র, হাসি মুখ, কোমল স্বভাব। এইখানে তার পরিপূরক রূপে দেখলাম কৃপারামকে। এ রকম অনমনীয় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ কমই দেখা যায়। যখন সে কাজ করে, যখন সে হাঁটে, যখন সে সামনে ঝুঁকে পড়ে, যখন সে ডাইনে বামে অথবা পিছনে হেলে, তখন তার অন্য যা-কিছু পরিবর্তন ঘটুক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে, কোনো দিকে এতটুকু বেঁকে যায় না, দেখে মনে হয় যেন একটি মাত্র নিরেট হাড়ে গড়া সেটি, বরঞ্চ একটুখানি পিছন দিকেই হেলানো, সম্মুখের দিকে কদাপি নয়।

কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্য, রান্না এবং বাজার করার কাজ সে একাই করে এবং উত্তমরূপেই করে।

দুর্গা-ভিলার নিচের তলায় শুনলাম এক মাতাজি আছেন এবং তিনি বাঙালী। সিমলা অঞ্চলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, এবং শিষ্যের সংখ্যাও কম নয়। দুর্গা-ভিলা বাড়িখানির যিনি মালিক তিনিও তাঁর শিষ্যদের অন্যতম, তাই মাতাজি দুর্গা-ভিলায় মাঝে মাঝে এসে বাস করেন। তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর জটা, সেই জটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমরা যখন আলাপে ব্যস্ত ছিলাম কালীকিঙ্কর তখন তাতে যোগ না দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায় তা পরে বোঝা গেল। শ্রীমতী কমলার কাছ থেকে মাতাজি সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনে সে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল এবং কমলাই তাকে মাতাজির কাছে নিয়ে গিয়েছিল আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। তারপর শিল্পী ও সন্ন্যাসিনীর অনেকক্ষণ কি আলাপ হয় তা জানি না, কিন্তু বোঝা গেল মাতাজি শিল্পীর সঙ্গে আলাপ ক'রে তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর দিনই। দুর্গা-ভিলার দোতলা থেকে নিচে যেতে হলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে একটা বাঁক ঘুরে নিচে নামতে হয়। এই রকম এক দিকের বাঁকের কাছে ছাউনি সম্বলিত একখানি বেঞ্চি আছে। শিল্পী সেই জায়গাটাই তার দৈনন্দিন আহ্নিকাদির জন্য বেছে নিয়েছিল। পরদিন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে শিল্পী ফিরে এসে বলল আহ্নিক শেষে চোখ খুলেই দেখে একটি পাত্রে উৎকৃষ্ট কয়েকটি মিষ্টান্ন ও এক গেলাস জল তার সম্মুখে রয়েছে। বলা বাহুল্য, মাতাজির স্নেহের ওটি মিষ্টান্ন রূপ। বললাম কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমিও বসে যাব চোখ বুজে, কিন্তু বললাম নিতান্তই ঠাট্টাচ্ছলে। কারণ বস্তুজগতের সৌন্দর্যের প্রতিই আমার লোভ বেশি, তাই যতক্ষণ সম্ভব চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করি, সন্দেশ মিলুক আর না মিলুক।

কিরণ, ফণী অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের কার্যস্থলে। আমরা

দু'জনও বারোটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে বেরিয়ে গেলাম দৃশ্য দেখতে; কিন্তু ঘর থেকে বেরুলেই ক্রমাগত উপরে উঠতে হয়, এবং আমার পক্ষে তা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হতে লাগল। দু'এক মিনিট পরেই কিছু বিশ্রাম করলে এবং খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে ততটা কষ্টকর হয় না। আপন গরজেই এই কৌশলটি আবিষ্কার করে নিলাম। দু'বছর আগে শেষ পাহাড়ে ওঠা-নামা করেছি, কিন্তু এ রকম প্রাণান্তকর মনে হয় নি—যদিও বহুদূর হাঁটার পর অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এখানে প্রতি মিনিটে এ রকম ক্লান্ত হয়ে পড়তে হবে তা কে জানত? পথ দীর্ঘ এবং গ্রেডিয়েণ্ট বেশি। দীর্ঘ পথ এই জন্য যে সিমলা বহু বিস্তৃত জায়গা, সুতরাং দুর্গা-ভিলা থেকে ঘুরে ঘুরে শুধু উপরে উঠেই নিষ্কৃতি পাচ্ছি না, অপেক্ষাকৃত সমতল পথের সন্ধানে অনেকটা দূরত্বও অতিক্রম করতে হচ্ছে। কিছুটা উপরে উঠে দেখি দুর্গা ভিলা কত নিচে পড়ে আছে। পথের দিকে চেয়ে দেখি আরও তিন গুণ পরিমাণ উপরে উঠতে হবে। একটু একটু ক'রে এগিয়ে এবং দু' এক মিনিট অন্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগলাম। এইভাবে চলতে চলতে দ্বারবঙ্গের বাড়ি ছাড়িয়ে প্রশস্ত উৎকৃষ্ট পথ পাওয়া গেল, এবং সেই পথে যতদূর যাওয়া সম্ভব গেলাম। শিল্পী কোন্ কোন্ জায়গায় বসলে ছবি আঁকার সুবিধা হবে সেই সব জায়গা মনে মনে চিহ্নিত করে রাখছিল। এ পথে ক্যামেরা খোলার বিশেষ দরকারই হল না, বিশেষত্ব কিছুই ছিল না।

ফিরে এলাম আমরা ঘণ্টা কয়েক ঘুরেই। শিল্পী যে-কোনো জায়গায় অবশ্য বসে যেতে পারত, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকায় তা আর হল না, কারণ যে সব পথে ঘোরা হল সে সব পথে আমি সম্পূর্ণ বেকার। শিল্পীর পক্ষে একা বেরুলোই প্রশস্ত। আমার পক্ষেও তাই। আমি ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পরই শিল্পীর পা চঞ্চল হয়ে উঠল, সুতরাং আমি একা শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। আধঘণ্টা আন্দাজ কেটে গেছে, ইতিমধ্যে ভারী পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি শিল্পী ফিরে এসেছে। কি ব্যাপার? বলল, জল নিতে ভুল হয়ে গেছে। ব্যাগে রং তুলি কাগজ সবই আছে, জল নেই! সুতরাং ভুল-যাত্রা সংশোধন ক'রে সে

আবার দুর্গা-ভিলা এবং সংলগ্ন পাহাড় কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল। তার আসা এবং যাওয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা প্রকাশ পেল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল তার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট দৃশ্য সে পেয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ফণী এসে আসর জমিয়ে বসেছে। ভদ্রতার অবতার এবং চিত্তাকর্ষী কাহিনী রচনায় নিপুণ। একটা ভরসা হল এই যে, সিমলা-বাসের পরিমিত ক'টা দিন আর যদি পাহাড়ে ওঠানামা নাই করতে পারি তা হলেও কোনো ক্ষতি হবে না, ফণীকে পেলেই যথেষ্ট হবে। শুধু অফিসের কয়েক ঘণ্টা যা অসুবিধা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে অসুবিধাও দূর হল, পরদিন তার প্রবল জ্বর এসে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা আটটা বেজে গেছে, সিমলায় তখনও অন্ধকার হয় নি (কলকাতা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পরে ওখানে সূর্যাস্ত হয়)—এমন সময় হঠাৎ যেন আকাশের আলো নিবে গেল, চেয়ে দেখি মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, এবং আরও দেখি ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি নেমে পড়েছে। শিল্পী তখনও ফেরে নি—কিন্তু ফিরতে দেরি হল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিজে শিল্পী ভিজে ছবি নিয়ে এসে হাজির হল এবং কালবিলম্ব না ক'রে তুলি চালিয়ে জলের সঙ্গে রঙের সামঞ্জস্য ক'রে ফেলল। ছবিখানি ভেজাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি, কারণ খুব বেশি ভেজে নি। সন্ধ্যার অল্প আলোয় চাপা রঙে মণ্ডিত পাহাড়গুলো যেন ঢেউয়ের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পর্বতমালার এ রকম প্রাণোচ্ছ্বসিত প্রকাশ একমাত্র শক্তিশালী তুলিতেই ফুটতে পারে।

সিমলার দৃশ্যে শিল্পী সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এবং পরদিন সকালের খাওয়া শেষ ক'রেই বেরিয়ে গেছে ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। আমি পড়ে আছি একা ফণীর সঙ্গে। তার প্রবল জ্বরের কথা পূর্বেই বলেছি, অতএব সেটি আমার সুযোগ। আমরাও কিছু পরেই বেরিয়ে গেলাম ঊর্ধ্বপথে। এই যাওয়ার উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ পাহাড়পথে চলায় অভ্যস্ত হওয়া এবং ঐ সঙ্গে যদি দৈবাৎ কোনো ছবির বিষয়বস্তু পাওয়া যায় তা দেখা। দৃশ্য সম্পর্কে মোহ কেটে গিয়েছিল, কেননা, এ সব বিস্তৃত দৃশ্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না, সুতরাং ঠিক

করলাম বাজার লোকজন ও পথঘাটের ছবিকেই প্রধান করতে হবে। কিন্তু সেই জনতাপূর্ণ জায়গা তখনও আমাদের দৃষ্টির বাইরে ছিল, এবং সে দিকে যেতে হলে বিকেলের দিকে যাওয়াই ভাল। সুতরাং টানেল ভেদ ক'রে ওপারের বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে চার দিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এই পথে বাস চলাচল করে এবং এখান থেকে শহরের খানিকটা অংশ বেশ দেখা যায়। বাস্-এর অবস্থা পৃথিবীর বোধ হয় সর্বত্রই সমান। ভিড়ের আতিশয্য সর্বত্র। টানেলের পাশে দু'দল কুলি বসে আছে যাত্রীদের মালপত্র বহনের আশায়। কুলিরা দুটি দলে বিভক্ত কেন সে বিষয়ে ফণীর কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল। সিমলার মতো বড় জায়গার পক্ষে এটি অবশ্যই লজ্জাকর, এবং আরও বেশি লজ্জাকর হচ্ছে এই যে, বাস্ থামলে বড় দলটি বাস্-এর কাছে আগে ছুটে গিয়ে নিজেদের হিন্দুত্বের পরিচয় দিতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে খুব গোঁড়ামি দেখা গেল না, যদিও কুলিদের অত্যাচারে হয় তো বাধ্য হয়েই 'হিন্দুত্বের' ঘাড়ে বোঝা চাপাতে হয়। মনে হল বিষয়টির দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব জিইয়ে রাখছে এই সব কুলিরা, এটি অত্যন্ত অন্যায়, বরঞ্চ এই নিচের ধাপেই এর ঠিক উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা ও বর্বরতার যুগ অতীত যুগ হিসাবে না মেনে নিলে রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষতি করা হবে, এ কথাটা প্রত্যেকেরই এখন স্মরণ রাখা দরকার।

এই প্রাতর্ভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরে এলাম আমরা প্রায় বারোটার সময়। শিল্পী তখনও ফেরে নি। আমরা একটু বিশ্রাম করতেই কার পদধ্বনি শোনা গেল দরজার বাইরে। প্রবেশদ্বারে কাঠের পথ বেয়ে কেউ এলে আগে থাকতেই বেশ বোঝা যায়। শিল্পী ফিরেছে মনে ক'রে দরজা খুলতে দেখি ফণীর অফিসের এক পিওন, হাতে চিঠি। তাতে লেখা আছে জ্বর খুব প্রবল না হলে অফিসে একটি জরুরি কাজ ছিল, আসা প্রয়োজন। কিন্তু জ্বর তখন প্রায় এক'শ তিন ডিগ্রী, তাই চিঠির সাহায্যেই নির্দেশাদি দিয়ে ফণী বিছানায় শুয়ে পড়ল, এবং আরও ঘণ্টাখানেক শিল্পীর জন্য অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম আপাততঃ তার

ফিরে আসার কোনো চিহ্ন নেই তখন আমরা স্নান এবং আহার শেষ ক'রে স্থায়ী ভাবে শয্যাশায়ী হলাম।

শিল্পী ফিরল বেলা দু'টোয়, প্রকাণ্ড এক ছবি শেষ ক'রে। দুপুর বেলার উজ্জ্বল রূপ, পাহাড়ে পাহাড়ে রঙের খেলা, ঘন নীল আকাশে ভাঙা ভাঙা শাদা মেঘ। শিল্পী পাহাড় দেশের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ ক'রে ফেলেছে আর তাকে আটকায় কে? তাই সে এসে খাওয়াটা কোনো রকমে শেষ ক'রেই আবার বেরিয়ে গেল ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে। সিমলার অফিস বা বাণিজ্য অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রের বাইরে যত জায়গা আছে তা এমনই নির্জন এবং শান্ত যে শিল্পীর পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ আদর্শ পরিবেশ বলা চলে। পথের ধারে বসে রঙীন ছবি আঁকছে অথচ অকারণ কৌতূহলীর ভিড় নেই। দু'একজন যারা একটু কাছে এসে দেখে গেছে তারা শিল্পীর প্রতি সম্মান রেখেই তা করেছে। বাজে লোক কেউ তাকে বিরক্ত করে নি।

বিকেলে আমাদের আর কোথায়ও বেরুনো হল না, যদিও আমার মনে হচ্ছিল, হাঁটতে খুব অসুবিধা হত না। বাজার এলাকাটি দেখার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, আর ঐ সঙ্গে অভিজাত অঞ্চল। পরদিন শনিবার, অতএব কিরণ বিকেলে আমাদের সঙ্গী হবে এ রকম কথা হয়েছিল। অফিস থেকে ফিরবে দুটোর পর, তারপর রওনা হব। ভয় হচ্ছিল শেষ বেলায় গিয়ে কতটুকু আর দেখা যাবে। তা ছাড়া আকাশের অবস্থা অনিশ্চিত, গত রাত্রেও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিরণকে জিজ্ঞাসা করলাম ফণীর অনুকরণে আগামী কাল তার প্রবল জ্বর হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। সে বলল আদৌ নেই। খুবই নিরাশ হলাম। উল্টে তার এক মাসের পুত্রের জ্বর হয়ে গেল।

এদিকে আমার পাহাড় পথে চলার সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে, কৌশল ইতিমধ্যেই আয়ত্ত ক'রে ফেলেছি, কাজেই পরদিন সকাল বেলাটা আর ঘরে বসে কাটাতে ইচ্ছা হল না, ঠিক করলাম কালীকিঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে যাব। সে দৈনিক দুখানা ক'রে ছবি আঁকছে দু'বেলা। সুতরাং আমার সঙ্গে যাওয়া মানে তার একখানা ছবি নষ্ট হওয়া। কিন্তু একটা রফা করা গেল।

চলতে চলতে যদি ছবির জায়গা মিলে যায় তা হলে সে বসে যাবে সেখানেই।

কিন্তু আমরা দুর্গা-ভিলা ছেড়ে উপরের পথে একটুখানি নিচের দিকে নামতেই দেখি এক কাশ্মীরী মুসলমান উঠে আসছে উপরের দিকে। দেখতে প্রায় আবদুল গফফার খাঁয়ের মতো, তেমনি দীর্ঘদেহ এবং সুন্দর। হাতে দড়ি, পিঠে শূন্য থলে, শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু তবু অভাবের ছাপ তার সর্বাঙ্গে। তাকে দাঁড়াতে বললাম, অত্যন্ত অনুগতের মতো দাঁড়াল ক্যামেরার সম্মুখে। কালী-কিঙ্করও একটা স্কেচ এঁকে নিল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাজ মেলে না, খেতে পায় না ভাল ক'রে। তাকে কিছু পয়সা দিলাম, কিন্তু মনে হল এটি তার পক্ষে একেবারেই আশাতীত। সে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তার বহু দুঃখের কথা আমাদের শোনাল। কত কাল সে মানুষের মুখ থেকে একটি অনুকম্পাপুর্ণ কথা শোনে নি।

এই একটি লোকের ছবি নিয়ে আমার এক বেলার কর্তব্য শেষ হল এবং অল্প কিছু দূর ঘুরেই শিল্পীকে মুক্ত ক'রে দিলাম। সিমলা-প্রকৃতি তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, কিন্তু সে বিদ্যুতের শত শত তারের বন্ধনীতে নিজেকে জড়িয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে অধিকাংশ জায়গাতেই। শিল্পীকে বললাম যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, কারণ বিকেলে আমরা শহর অঞ্চলে যাব। কিন্তু তার আর ফেরা হল না যথাসময়ে। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে তিনটে আন্দাজ সময়ে কিরণ ও আমি বেরিয়ে গেলাম। আমি জানতাম সিমলা ভ্রমণ আজ বিকেলেই শুরু এবং শেষ, এর পর সুযোগ বা উৎসাহ কিছুই থাকবে না।

দুর্গা-ভিলা থেকে বেরিয়ে প্রথম বড় রাস্তা ধরতেই সামর্থ্য প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে ঘোরা পথ এড়াবার জন্য কিরণ আমাকে যে পথে টেনে নিয়ে চলল সেই পথেই যুধিষ্ঠির স্বর্গে উঠেছিলেন। দু'তিন মিনিট উঠেই মনে হল সিমলায় অন্ধকার নেমে আসছে। অন্ধকার সত্যিই নামছিল আকাশ-পথে। বর্ষার মেঘ মাথার উপরে, দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে গায়ে। তখন যুদ্ধের সময়ের রেল-কর্তৃপক্ষ প্রচারিত কয়েকটি বিজ্ঞাপন আমার

মানস চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার একটি হচ্ছে "ট্র্যাভেল হোয়েন ইউ মাস্ট।" অর্থাৎ নিতান্ত জরুরি হলে তবেই ভ্রমণ ক'রো। নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই অপরাহ্ণ ভ্রমণটা কি সত্যই জরুরি ছিল? মন বলল, শুধু এ ভ্রমণ নয়, ল্যান্সডাউন ভ্রমণ এবং সিমলা ভ্রমণ সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যহীন।

মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত জীবনে এর মতো অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ আর করি নি। পথের এক ধারে তারের বেড়া ছিল, সেই তার ধরে উঠতে পারলে কিঞ্চিৎ সুবিধা হত, কিন্তু তা হল না, কারণ উপরে ওঠার চেয়েও নিচে নামার যাত্রী ছিল বেশি এবং তার ছিল তাদের দখলে।

বৃষ্টি পড়ছিল টিপ টিপ ক'রে, অবশেষে উঠে এলাম সমতল ক্ষেত্রে, কালীবাড়ির সীমানায়। ঐখানে একটুখানি ঘুরে এবং বিশ্রাম ক'রে অনেকটা আরাম বোধ হল। কালীবাড়ি থেকে নিচের দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার। কঠিন তারের বাধা না থাকলে এইখানে কিছু ভাল ছবির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দৃশ্যের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, দুঃখ ছিল না। তাই ওখান থেকে বেরিয়েই পথের ও পথের পাশের মানুষের ছবি তোলা শুরু ক'রে দিলাম। কাপড়-কাচা তরুণী থেকে তামাক টানা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা সবাই হাসি মুখে আমার উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করল।

আকাশে মেঘ বহু পূর্বেই কেটে গিয়ে চার দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমরা এগিয়ে চলেছি ম্যালের দিকে। বাড়িগুলি পথের পাশে ছবির মতো লাগছে। ক্রমে অভিজাত অঞ্চলের চিহ্ন ফুটে উঠছে। পুরুষেরা সাহেবী ও মেয়েরা মেম সাহেবী ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে। মেয়েদের রং মাখার বাড়াবাড়িটা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সমান পর্যায়ে উঠেছে। এটি খুব বেশি দিনের ঐতিহ্য বলে মনে হয় না দেখে। হয় তো মেমসাহেবদের রাজত্বকালে ইচ্ছা ও অভ্যাসটা কিঞ্চিৎ চাপা ছিল, তাদের প্রভাব কেটে যাবার পর ইচ্ছাটা অবাধ হয়ে উঠেছে কিন্তু অভ্যাসটা এখনও পাকা হয় নি। কিংবা "স্বাধীন ভারতে প্রথম রং মাখা" এই মনোভাব আছে এর মূলে—কাজেই বাড়াবাড়িটা সাময়িক বলে ধরা যেতে পারে। কিংবা হয় তো আমারই ভুল, পিছিয়ে

পড়া কলকাতা শহর থেকে এসে হঠাৎ এ সব নতুন মনে হচ্ছে। যারা আড়াই টাকায় তিন শিশি সুগন্ধ তেলের সঙ্গে উৎকৃষ্ট তিনটি হাতঘড়ি বাংলা দেশে বিক্রি ক'রে ধনী হয়, অথবা সর্বদুঃখবিনাশী ম্যাজিক আংটি বা রুমাল বাঙালীর কাছে দু'টাকায় বিক্রি ক'রে বাঙালীর দুঃখ দুর করার চেষ্টা করে, তারা বাঙালীর অপেক্ষা যে অনেক বেশি প্রগতিশীল এ বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব আর চিন্তা না ক'রে বিষয়টি মেনে নিলাম। তার পর চলল ঘোরার পালা। যখন পা আর চলে না তখন ভ্রমণ শেষ ক'রে একখানা ছড়ি কিনে তারই সাহায্যে ঘরে ফিরে এলাম। পঞ্জাব দেখা আমার প্রায় শেষ হয়েছে, আর অল্প কিছু বাকী, সেটুকু রেলপথে পাওয়া যাবে। এ দিকে শিল্পী দৈনিক দুখানা ক'রে রঙীন ছবি শেষ করছে, আর আমি শুয়ে শুয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

২৭ জুন রওনা হওয়া গেল। গাড়িতে আসন আমাদের রিজার্ভ করা ছিল এবং কালকার পর থেকে দু'রাত্রির ঘুমের মাশুলও অতিরিক্ত দেওয়া ছিল। আমাদের কামরায় আমরা দু'জন ভিন্ন আর চার জন স্থানীয় ব্যক্তি উঠলেন। তাঁদের তিন জন মিলিটারি ও এক জন সিভিল। তাঁরা গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাস খেলায় মন দিলেন। তার জন্য দাবী হ'ল আমাদের উঠে অন্য দিকে যেতে হবে। এ দাবী পূরণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাঁরা মাঝখানের মালপত্রের উপর তাস বিছিয়ে চার জন এমন ভাবে বসলেন যাতে আমাদের বেশ অসুবিধা হতে লাগল।

আরও দু'এক জন ভদ্রলোক উঠলেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু এই চার জন বর্বরের মনে তাঁদের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা আছে বলে মনে হল না। পাশের গাড়ি থেকে তাঁদেরই স্বদেশবাসী কয়েকজন মহিলা স্নানঘরে যাবার সময় তাঁদের পা এবং তাসের আসর ডিঙিয়ে যেতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাতেও তাঁদের অভিনব শিক্ষা এবং সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না। আমার সম্মুখস্থ সাহেববেশী খেলোয়াড় আমার পাশে পা তুলে দিলেন। আমাকেও বাধ্য হয়ে তাঁর পাশে পা তুলতে হল, কিন্তু তাতে তাঁর আপত্তি হল না। দেখলাম যাঁর যেমন খুশি অন্যের গায়ে পা তুলে বসছেন। এর মধ্যে যে অভদ্রতা আছে সে বোধহই তাঁদের

নেই—এটি বেশ বোঝা গেল। মহিলাদের প্রতিও তাঁদের কিছুমাত্র সৌজন্য নেই। রূপোর কোদালের মতো ঝক্‌ঝকে দাঁত সর্বদা হাঁ-করা মুখ থেকে বেরিয়ে আছে। যুগান্তের বর্বরতার ছাপ চোখে-মুখে। অতএব সাহেবী পোষাক তাঁদের নিতান্তই অনুকরণ মাত্র, মুখের ইংরেজী বুলিও প্রভুভক্তির নিদর্শন মাত্র। তাসের আড্ডার চার জন লোক পরস্পর খুব যে পরিচিত তা মনে হল না, এক ধর্মীও নয়, তাই এঁদের সাধারণ পঞ্জাবীদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখলে খুব যে ভুল দেখা হবে তা মনে হয় না। অবশ্য পঞ্জাবীদের মধ্যে সংস্কৃতিবান লোকেরও দেখা পেয়েছি ইতিপূর্বে, কিন্তু তাঁদের দেশে বসে সেই সব দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অথবা সংস্কৃতির অর্থ দেশভেদে পৃথক, আমিই হয় তো ভুল করছি।

কালকার গাড়িতে উঠে মস্ত বড় একটা আরাম পেলাম। গাড়ির বাইরে আমাদের নামের কার্ড দেওয়া ছিল, অতএব সেটিকেই ঘুমের গাড়ি মনে ক'রে আমরা শুয়ে পড়লাম। যতগুলো আসন তার অতিরিক্ত এক জন যাত্রীও ছিলেন না। আমার পাশের আসনে ছিলেন এক রেভারেণ্ড। তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু হল। যতদূর মনে পড়ে রেভারেণ্ড মরিস্ তাঁর নাম। যুবক, এবং অত্যন্ত মধুরভাষী। পরস্পর পরিচয় প্রসঙ্গে শিল্পীর ছবিগুলি তাঁকে দেখালাম। হঠাৎ তাঁর হাত থেকে দু'একখানা ছবি পড়ে যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেগুলি তুলে ক্রমাগত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন যে যেভাবে সাজানো ছিল তা বোধ হয় নষ্ট হল।

ভদ্রতা, সৌজন্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির একটা পরিচিত মধুর স্বাদ পেলাম সুদীর্ঘ ছ'ঘণ্টা পরে, মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তারপর ছবি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হল তাতে তাঁর এ সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে বিস্মিত হলাম। রীতিমতো পণ্ডিত লোক, মুখে তাঁর প্রকৃত শিল্প-সমালোচকের ভাষা। আমি কথা তুললাম, চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন এমন শিল্পী ইউরোপের সর্বত্রই সংখ্যায় অনেক বেশি। কি ক'রে এটা সম্ভব হয়েছে? তিনি বললেন স্কুল থেকেই ছোটদের চিত্রবিদ্যার সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং ওসব দেশে সচিত্র সাময়িকপত্র এবং অন্যান্য নানা বিভাগে

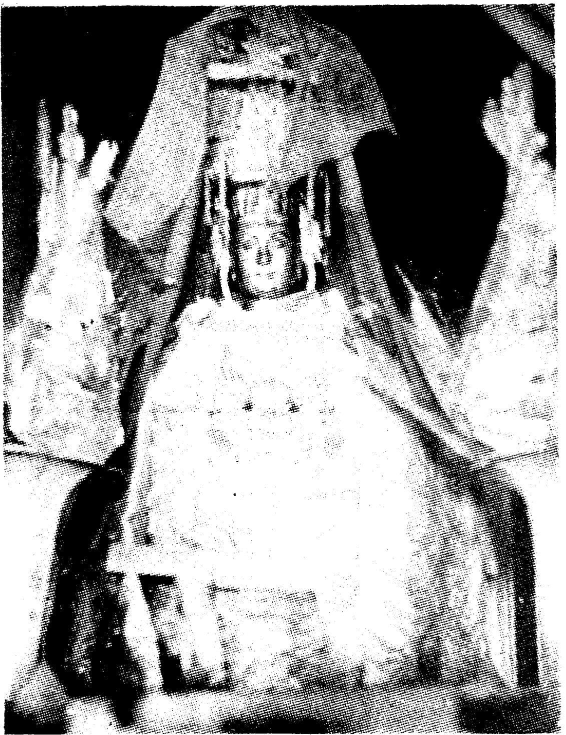


[illegible] শহরের নিচের পথ



সিমলার বড় ডাকঘরের সম্মুখস্থ পথ

('পশ্চিম হিমালয়ের পথে' দ্রষ্টব্য)



থাং-ও-বিও মন্দিরের বুদ্ধ মূর্তি



পা নামক চিত্রবিচিত্র ঝুড়ির ঢাকনা

চীনের পথে দ্রষ্টব্য।

ছবির চাহিদা খুব বেশি, সুতরাং শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও খুব বেশি। তা ভিন্ন ছবির গ্যালারিগুলিতে সবাই সব সময় ভাল ছবি দেখার সুযোগ পায়, কাজেই শিল্পীজনোচিত চোখ এবং মন তৈরি হবার সুযোগ থাকে সবারই। তবে আজকাল যুদ্ধের পরে গোড়া থেকেই স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় পৃথক ক'রে দেওয়া হয়েছে, তাড়াতাড়ি কাজের লোক চাই দেশে এখন।

এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি সকালে দিল্লী স্টেশনে নেমে গেলেন। দিল্লীর পর থেকে আবার বিনাটিকিটে ভ্রমণের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। একটি দশ বছরের মেয়ে আমাদের গাড়ির বাইরে পাদানির উপর দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। ঘণ্টায় ৫৫ মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে কিন্তু সে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুঁটুলি হাতে নিয়ে।

তারপর আবিষ্কার করলাম (কানপুরে) যে আমাদের গাড়িতে যে তিন জন মহিলা ও এক যুবক ছিলেন তাঁরাও ঐ পথের পথিক।

তারপর আবিষ্কার করলাম আরও ভয়ানক একটা জিনিস—মোগলসরাই স্টেশনে। আমরা দু'জনে ঘুমের গাড়ির জন্য অতিরিক্ত মোট চল্লিশ টাকা দেওয়া সত্ত্বেও ঘুমের গাড়ি আমাদের আদৌ দেওয়া হয় নি—শুধু বসার জায়গা রিজার্ভেশন মাত্র এবং তার জন্যও পৃথক টাকা দেওয়া ছিল। ফিরে এসে রেলকম্পানিকে চিঠি দিয়েছিলাম অভিযোগ ক'রে, আজও (১৬-৯-৪৯) তার উত্তর পাই নি। সাধুতার অদ্ভুত সাম্য দেখলাম দুদিকেই। রেলের দিকেও, যাত্রীর দিকেও; অতএব দুঃখ কি?

বাড়ি ফেরার সাত দিন পরে কিরণ লিখছে—সিমলা এখন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠেছে, রঙে রঙে ছেয়ে গেছে সব পাহাড়। ফণী লিখছে—সমস্ত সিমলাই যেন স্যাপার-টার্নার।

(১৯৪৯)

চীনের পথে

আমার চীনভ্রমণের কিছু ভূমিকা আছে। এই ভ্রমণ-ব্যাপারটি আসলে রফার ব্যাপার। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই। রফা ক'রে চলায় আমরা অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত। যা চাই তা পাই না, খুশি থাকতে হয় তার পরের জিনিসটিতে। ইংরেজীতেই কথাটি শোনায় ভাল—next best। অর্থাৎ যেটি পাওয়া গেল না, তার বদলে তার অনুকল্প আর একটি জিনিস। চালের অভাবে যেমন গম, ধুতির অভাবে হাফ-প্যাণ্ট। কিছুক্ষণ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি, তার পর নিশ্চিন্তমনে সব মেনে নিই।

আমার চীনভ্রমণও এই অগত্যা মেনে নেওয়া। বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ১৯৫১) যে সব সৌভাগ্যবান চীনদেশে রওনা হচ্ছেন, বলা বাহুল্য আমি তাঁদের দলভুক্ত নই, অথচ আমারও চীনদর্শন-বাসনা প্রায় চীনের মতোই প্রাচীন। হয় তো এই বাসনা হাজার দুই বছর আগেকার চীন-ভারত মৈত্রীর প্রভাব। যাঁরা সে যুগে চীন থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারত থেকে চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের অদৃশ্য হাত আজও চীন-ভারত মৈত্রীগঠনে সাহায্য করছে। তাই শুধু আমার নয়, সম্ভবত ভারতবাসীমাত্রেরই মনে চীনভ্রমণের একটি চেতন বা অবচেতন বাসনা আছে। অথচ বর্তমান সময়ে এ বাসনা পূরণ করায় অসুবিধা আছে খুবই। বর্তমান চীন তপ্ত তৈলকটাহ, ভবিষ্যৎ চীনগঠনের মশলা ভাজা হচ্ছে সেখানে। এ চীন নিশ্চিন্ত মনে দেখা চলে না। নিশ্চিন্ত মনে দেখতে হলে দেখতে হয় কনফিউসিয়াস বুদ্ধ লাওৎ-সের চীন, ফা-হিয়েন হিউয়ান-সাঙের চীন। অর্থাৎ প্রাচীন চীন।

সৌভাগ্যবশত একটা সুযোগ জুটে গেল বাংলাদেশের নিমন্ত্রিতদের চীন রওনা হবার পূর্বমুহূর্তে ল-চং-গী নামক এক চীনা যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাকে দেখেই মনে এলো সেই ইংরেজী কথাটি—next best।

অবিলম্বে চীনভ্রমণ আয়োজন শেষ করে ফেললাম। এক দিন সকালে গলায় লাইকা ঝুলিয়ে দু'জন রওনা হলাম ধাপা অভিমুখে। আমার এ চীন ধাপার জলাভূমির চীন, কলুটোলা, ছাতাওয়ালা গলি, টেরিটিবাজার, ফিয়ার লেনের চীন। অর্থাৎ সবটাই ধাপ্পা। ল-চং-গী বলল ধাপা থেকেই শুরু করা যাক আমাদের প্রথম পর্ব। ঐখানে এক চীনা শহর গড়ে উঠেছে চামড়ার কাজ উপলক্ষে। রওনা হতে বেলা প্রায় ন'টা হল। বেলেঘাটার পথে বাস্-এ গিয়ে হাঁটতে হবে মাইলখানেক। পথ অত্যন্ত খারাপ। রিক্সা চলা প্রায় অসম্ভব। ভাঙা উঁচুনিচু পথ মেরামত হচ্ছিল, সর্বত্রই পাহাড়সমান উঁচু খোয়ার গাদা। তদুপরি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। চলতে পা ক্ষতবিক্ষত হল, তদুপরি কাদা এবং জল। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু রোদ তা প্রায় আগুনের মতো গরম।

ক্রমে এগিয়ে চলেছি আর বড় বড় কারখানা সব চোখে পড়ছে। সবই চামড়ার কারখানা। সমুদ্রের মতো জলাভূমি। জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতে পুঁতে কাঠের তক্তা বিছিয়ে প্রকাণ্ড এক একটা মাচা করা হয়েছে। মাচায় একের পর এক চামড়া বিছিয়ে মজুরেরা তাতে রং মাখাচ্ছে। পাশে কতক চামড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রোদে শুকনোর জন্য। কিন্তু ঘন বর্ষণে কোনো কাজই ঠিকমতো হচ্ছে না।

দুঃখের পথ অতিক্রম ক'রে ল-চং-গী ও আমি গিয়ে উঠলাম ল-চং-গীর এক পরিচিত বাড়িতে। সেখানকার সব বাড়িই ট্যানারির সঙ্গে যুক্ত। আশা ছিল কতকগুলো কারখানা ঘুরে দেখব। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই খারাপ। যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে এলো এবং একটু পরেই প্রবল বৃষ্টি। চলার পথে কারখানাগুলো বাইরে থেকে দেখেছিলাম, তার বেশি আর দেখা সম্ভব হল না। কল চলেছে সব কারখানায়। কোথাও চামড়া পালিশ হচ্ছে, কোথাও ঘষা হচ্ছে শাদা সোয়েড তৈরির জন্য। দু'এক জন (অসুস্থ সম্ভবত) লেপের মতো চামড়া গায়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চামড়ার গন্ধ সমস্ত বাতাসে, তবে জায়গাটা একান্তই খোলা বলে গন্ধ উগ্র নয়। বৃষ্টির মধ্যে ঘরের আশ্রয়ে বসে বসে যেটুকু সংবাদ শুনলাম তা হচ্ছে এই যে, চামড়ার কাজে অথবা জুতো

তৈরিতে যারা নিযুক্ত তাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাদের নাম হচ্ছে "খে"। এই খে-সম্প্রদায় বহু প্রাচীন কাল থেকে চামড়ার কাজে হাত পাকিয়েছে। ক্যাণ্টনের খে নামক জায়গা থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

চীনদেশের এক একটা এলাকার লোকেরা এক একটি বিশেষ শিল্পকাজে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। যেমন ক্যাণ্টনের আর এক সম্প্রদায় দারু-শিল্পে ওস্তাদ। ড্রাই ক্লীনিং এবং ডায়িং-এর কাজে ওস্তাদ সাংহাইবাসীরা। এমন কি দাঁত তোলা এবং দাঁত বাঁধাইয়ের কাজেও একটি বিশেষ জায়গার লোকেরা বিশেষজ্ঞ, এরা ক্যাণ্টনের ওপাম নামক জায়গার অধিবাসী। এই যে প্রদেশ বা সম্প্রদায় ভেদে কর্মভেদ এটা এমনই এদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে, এক সম্প্রদায়ের লোকের অপর সম্প্রদায়ের কাজ করতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যারা পথে পথে কাপড় ফেরি ক'রে বেড়ায় তারাও একটা বিশেষ এলাকার লোক। এরা নাকি শানটুংবাসী এবং অধিকাংশই মুসলমান।

আমার সঙ্গী ল-চং-গীর পরিচয় কৌতূহলোদ্দীপক। এর পৈতৃক বাড়ি চীনদেশের আময় প্রদেশে, কিন্তু চীন সে দেখে নি, বাংলাদেশেই তার জন্ম, বরিশালে। চীনা ভিন্ন আর সবই জানে, ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত। এর পিতার নাম ল-খে-হং। ল-খে-হং-এর বর্তমান বয়স প্রায় সত্তর বছর। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন তিনি তাঁর পিতা ল-চিন-থি-র সঙ্গে আময় থেকে কলকাতা আসেন এবং ছ'বছর কলকাতা বাসের পর বরিশাল যান তাঁরই সঙ্গে। ল-চিন-থি বরিশালে সুপারি, তামাক ও লঙ্কা চালানের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ল-খে-হংও সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত। বাংলাদেশের এই তিনটি জিনিস সিঙাপুর, পেনাং প্রভৃতি জায়গায় চালান হয়। দীর্ঘ কাল বরিশালে কাটাবার পর, দেশ বিভাগ হলে তিনি গত ১৯৪৮ সনে কলকাতা চলে এসেছেন। সুতরাং ল-চং-গীও এসেছে পিতার সঙ্গে। ল-চং-গী বাইশ বছরের যুবক, আজন্ম বাংলাদেশে থেকে বাঙালী হয়ে গেছে, বাংলা লেখে, বাংলায় কথা বলে। গত আই-এস্‌সি পরীক্ষায় পাস ক'রে এখন 'স্পেশাল বেঙ্গলী' নিয়ে বি-এ পড়ছে। ম্যাট্রিকুলেশনে সংস্কৃত পড়েছিল। এদের পৈতৃক

ব্যবসা এখনও চলছে, সঙ্গে আছেন আর এক জাত ভাই—নাম চান-চুই-তী। ল-খে-হং বৃদ্ধ কিন্তু এখনও অসাধারণ পরিশ্রমী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমার চীনভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল এঁদের তিন জনের সঙ্গে। কারণ তিন দিনের মধ্যে আমাকে চীন ভ্রমণ শেষ করতেই হবে, সম্পাদক আমার ভ্রমণ কাহিনীর অপেক্ষায় বসে আছেন। নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। আমরা কলুটোলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের এক আধুনিক চীনা বাড়িতে। ল-খে-হং এবং চান-চুই-তী এঁরা দু'জনেই বাংলা বলতে পারেন, ল-চং-গীর বাংলা অবশ্য আরও মার্জিত। সুতরাং এঁদের সঙ্গে আলাপে আমার কোনোই অসুবিধা হল না। যে পরিবারটির কাছে গেলাম তাঁরাও যথাসাধ্য আমাকে তাঁদের ঘরের খবর জানায় সাহায্য করলেন। এঁরা প্রায় চার পুরুষ যাবৎ বাংলাদেশে আছেন। গৃহকর্তা বুন-চং বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী এখন বৃদ্ধা, বয়স তিরাশী বছর। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ। বুন-চংও সুপারি তামাকের ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। তাঁর ছ'টি পুত্র এবং দু'টি কন্যা। দু'টি পুত্র লণ্ড্রি ব্যবসায়ে নিযুক্ত এবং অন্যরা বিদেশে চাকরি করে। একটি কন্যার তিন কন্যা ও এক পুত্র। এই তিন কন্যার এক জন বি-এ পাস, একজন ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। ছেলেটিও ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে। কলেজের মেয়েটির নাম ছায়-হু এবং ছেলেটির নাম আং-ম-বা। বুন-চং-এর ছয় পুত্রের তিন জন খ্রীস্টান। দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীরা সবাই খ্রীস্টান। দেখলাম একটি টেবিলে মাতা মেরি, দুটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি হাস্যরত বুদ্ধমূর্তি (Laughing Buddha) সাজানো রয়েছে, একই সঙ্গে যার যেমন ইচ্ছা পূজা বা উপাসনা চলে। দুটি ধর্ম পাশাপাশি, কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই এবং উপাসকেরাও একই পরিবারভুক্ত। এই ঘটনাটি আমার বড়ই ভাল লাগল।

ঘরে নানারকম চীনা-শিল্প আছে, তার মধ্যে একটি পাত্র দেখতে বড়ই সুন্দর। চীনাভাষায় এর নাম পা। টিফিন-কেরিয়ারের মতো চারটি গোল কাঠের পাত্র পর পর সাজানো—এবং সেই রকমই হাতে ধরে তোলা যায়। পাত্রগুলি দেড়

ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। উপরের ঢাকনায় সুন্দর ছবি, ঢাকনাটা খুলে দাঁড় করিয়ে রেখে একটি ছবি তুলে নিলাম।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে হল।

আমার চীনভ্রমণ পরিকল্পনার আর একটি অঙ্গ এখানকার চীনা মন্দির দেখার। এইখানে আবার আমার সহায় হলেন চান-চুই-তী। ল-চং-গী তো সর্বদাই সঙ্গে আছে।

আমরা তিন জন নানা গলিঘুঁজি পার হয়ে পৌছলাম গিয়ে ডেমজেন লেনের প্রাচীনতম চীনা বৌদ্ধমন্দিরে। মন্দিরটির নাম থান-ও-বিও। প্রকাণ্ড বাড়ি। মন্দিরটি দোতলায় অবস্থিত। আমি ভুলে গেলাম কলকাতা শহরে আছি, এ অনুভূতি ইলিউশন নয়, মায়া নয়, এ সত্য অনুভূতি। চীনদেশে যাঁরা গিয়েছেন চীনা আবহাওয়া তাঁরা এর চেয়ে বেশি অনুভব করেছেন এ কথা বিশ্বাস হয় না। একটা অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। দোতলায় খোলা প্রশস্ত ছাত, তার পর মন্দিরের দালান, তার পর মন্দির। তিনটি সুসজ্জিত দরজা, প্রত্যেকটি দরজায় সুরুচিসঙ্গতভাবে সিল্কের চিত্রিত পর্দা ঝোলানো। একটি দরজার সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "হাফ-কি-ই-পাব।" শুনলাম এর অর্থ "প্রবাসীদের কল্যাণার্থে।"

মন্দিরের ভিতরটা চীনা কাগজের ফুল ও নানারকম চীনা-মাটি ও ধাতুনির্মিত মূর্তিতে সাজানো। এক দিকে উঁচুতে ঝোলানো ড্রাম, অন্যদিকে ঘণ্টা। বিশেষ উপলক্ষে এ দুটি বাজানো হয়। মন্দির কেন্দ্রে দু'ধারে ফুলের সাজের পিছনে একটু উঁচুতে বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরে কিছুক্ষণ কাটাবার পরেই নিঃশব্দ পদক্ষেপে ফিকে হলুদ রঙের এক শীর্ণ বৃদ্ধ চীনা উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে। তার বয়স ৯০ বছর। এমন শান্ত এবং করুণ তার চাহনি যে দেখলেই মনে হয় এই থান-ও-বিওর প্রশান্ত তথাগত মূর্তির আবহাওয়ায় আশৈশব বাস করার ফলে সে নিজেই শান্ত এবং আত্মগত হয়ে উঠেছে। কিংবা সেই করুণ চাহনি সম্পূর্ণ আফিং-এর কৃপায় কি না কে জানে। এই বৃদ্ধ বিশেষ উপলক্ষে মন্দিরের ড্রাম ও ঘণ্টা বাজায়।

ইতিমধ্যে চান-চুই-তী কয়েকটি মোমবাতি নিয়ে মূর্তির সম্মুখে জ্বালিয়ে দিলেন। এই বাতিগুলি মন্দিরেই থাকে, চীনে তৈরি, গায়ে রঙীন ছবি আঁকা। মন্দিরের ভিতরের বাঁ পাশের দেয়ালে কতকগুলো তাক আছে। সেখানে চীনাভাষায় লেখা কাঠের অনেকগুলো স্মৃতিফলক খাড়া ক'রে রাখা হয়েছে। বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পর মন্দিরে যদি কোনো অনুষ্ঠান হয় তবে তাঁর নাম-সম্বলিত এই স্মৃতি-ফলক এখানে রাখার নিয়ম আছে। একে বলে "চিন চুঃ।"

অতঃপর আমরা টেরিটি বাজার স্ট্রীটের আর একটি মন্দিরে গেলাম। এটির নাম "কোয়ান-ইম-কো-বিও"। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত—প্রবেশদ্বারে লেখা আছে। এই মন্দিরটি আকারে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী হলেও এর মধ্যেও চীনা শিল্পের বিচিত্র সংগ্রহ আছে। সজ্জা সবই প্রায় ধাতুনির্মিত। মন্দিরে বাইরের লোকের প্রবেশ বা ফোটো নেওয়ার সম্পর্কে কোথায়ও কোনো বাধা-নিষেধ নেই বলেই মনে হল, অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দক্ষিণা দিতে হয়েছিল।

এইখান থেকে বেরিয়ে খাঁটি চীনা পল্লীতে এসে দাঁড়ালাম। চীনা দাঁতের ডাক্তার, ওষুধের দোকান, চীনামাটির জিনিসের দোকান। চীনা কাঠের মিস্ত্রী কাঠের কাজে নিযুক্ত আছে কোনো কোনো ঘরে। চীনা ওষুধের দোকানে গিয়ে উঠলাম। দোকানে মেয়ে পুরুষ সবাই কাজ করে। সিঁড়ির উপর রোদে মাছ শুকানো হচ্ছিল। ভেষজালয়ে শুকনো মাছও বিক্রি হয়। ছবি নেওয়ার সময় মাছগুলো তাকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কতকগুলো দোকানে চীনা-মাটির পুতুল বুদ্ধমূর্তি চায়ের পাত্র পেয়ালা ইত্যাদি আছে। কিন্তু দাম যা শুনলাম তাতে চমকে উঠতে হয়। এই চীনা পল্লীতে কোনো কোনো চীনাবাসী সুপারি হলুদ চীনাবাদাম প্রভৃতি ব্লীচ করার কাজ করে। গুদামের মধ্যে এক শ দেড় শ দু'শো বস্তা সুপারি বা বাদাম রেখে সেখানে গন্ধক জ্বালানো হয়। গন্ধকের ধোঁয়ায় (সালফার ডাইঅক্সাইড) ঐ সব জিনিসের রং পরিষ্কার ক'রে দেয়, তাতে বেশি দামে বিক্রি করার সুবিধা হয়, কারণ দেখতে ভাল হয়। একশ বস্তা সুপারি ব্লীচ করতে সের দশেক গন্ধক লাগে।

চীনারা কলকাতা শহরের অন্তত তিন শ বছরের বাসিন্দা। ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সময় মুর্গীহাটা এলাকা ইংরেজ, ফরাসী, গ্রীক, আরমেনিয়ান, পোর্টুগীজ প্রভৃতির প্রধান ঘাটি ছিল। ক্লাইভ স্ট্রীট, এজরা স্ট্রীট, ক্যানিং স্ট্রীট প্রভৃতির মাঝখানে ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীটটি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে শুধু 'চীনাবাজার' নয়, সেটি 'ওল্ড চীনাবাজার'। সে যুগের ব্যবসায়ী-চীনাদের মধ্যে চীনজীবনের খারাপ দিকটাও জাহাজ বোঝাই হয়ে অবশ্য এদেশে এসেছিল, এবং হয় তো এখনও একটা স্তরে তার অস্তিত্ব আছে। জুয়াখেলা, নেশা করা, দাঙ্গা করা ইত্যাদি। অনেক গল্প শোনা যায় এ বিষয়ে। বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনেছি কোনো কোনো বাঙালীও নাকি চীনাভাষা আয়ত্ত ক'রে নিম্নস্তরের চীনা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করেছে।

কিন্তু আমি আমার এই চীনভ্রমণ শেষ করেছি মাত্র তিন দিনে। এই তিন দিনে এদের ভাল দিকটাই দেখার চেষ্টা করেছি একান্তভাবে। চিত্রশিল্পে, দারুশিল্পে, চামড়ার কাজে, ডায়িং-এর কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে চীনাদের স্বভাবগত যে নৈপুণ্য আছে এদেশে তার পরিচয় যথেষ্ট মিলবে। এরা আমাদেরই মতো প্রাচীন জাতি এবং বহুকাল আমাদের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও আমরা ওদের চিনি না, সহজে চেনবার উপায়ও হয় তো কিছু নেই। আমি আজ অনাহূত-ভাবে হঠাৎ চীনের দুরতিক্রম্য প্রাচীরটি পার হয়ে এসে চীন আবহাওয়ার এমন একটি স্বাদ পেলাম যা আমার মনে আমরণ আনন্দ জাগাবে। আকস্মিকভাবে ল-চং-গীদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতেই ওঁদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগল এবং ওঁদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হল। ল-খে-হং, চান-চুই-তী এবং ল-চং-গীর অক্লান্ত সাহায্য এবং সবিনয় ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমি এঁদের ভিতর দিয়ে চীনা জীবনের মধুর দিকটির যে একটুখানি স্বাদ পেয়েছি তা আমার কাছে অবশ্যই অমূল্য। (১৯৫১)
